১৫৩/৫

গরীবের মেয়ে

— অনুরূপা দেবী
১৩৫৩

# গরীবের মেয়ে

## প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের সকাল, বেলা নয়টা বাজে, আফিসের কেরাণী, দ্বারবান্, ঝাড়ুদার এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদল যথানিয়মিত সময়কে পাছে ধরিতে না পারে সে জন্য পশ্চিমের দুরন্ত শীতকে উপেক্ষা করিয়া কেহ এক থাবলা তেল গায়ে চাবড়াইতেছে, কেহ বা শীতার্ত্ততায় জামাজোড়া শুদ্ধ মাথা ঝুলাইয়া কাকস্নান করিতেছিল,—উদ্দেশ্য টেরী কাটা।

আর একজাতীয় জীবকেও এই আফিস ইস্কুলের অধিবাসীদিগের মতই শীতবর্ষানির্ব্বিশেষে অ-স্নাত—অ-ভুক্ত বাহির হইতে হয়, তাদের দুরবস্থা আরও বেশী, সে বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ! স্কুলের গাড়ীর ভয়ে তাদের এতই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় যে, পুরা হপ্তাটা স্নান ত হয়ই না, আহারটাও অর্দ্ধেক দিন না হওয়ারই সামিল। বাসনমাজা-ঝিয়ের কামাই মাসের মধ্যে পনের দিন, খোকাখুকীদের না ধরিলে, বিছানাটা না তুলিলে, নেকড়াগুলা না কাচিলে, বাবা বা দাদার তেলটুকু, গামছা-খানা, ধুতিখানি ঠিক করিয়া না রাখিলে দ্বিভুজা-মাতা চতুর্ভুজা হইয়াও আধসিদ্ধ ডালভাতটাও জোগান দিতে পারিয়া উঠেন না। বাসন মাজিয়া ঘর নিকাইয়া, ছাই তুলিয়া, ছেলেকে দুধ দিয়া মেয়ের কাছে

সাহায্য না পাইলে, সুতিকারোগ জীর্ণা মা কেমন করিয়া সাড়ে আটটার ভিতর ভাত যোগান? সারা সহর ঘুরিয়া মেয়ে সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া মেয়ে-স্কুলের গাড়ী সাড়ে সাতটা হইতে নয়টার মধ্যেই সর্ব্বত্র আসিয়া পৌঁছে।

পৌষমাস, যেমন প্রবল শীত তেমনই প্রচণ্ড বর্ষা। একদিকে মেঘ ও অপর দিকে কোয়াশার স্থূল অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া দিনের আলো প্রকাশ প্রায় অসম্ভব হইয়াছে, বেলা সাড়ে আটটা বাজিলেও মনে হইতেছিল, সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। একে ত শীতের ভোরে পাখীরা সহজে সাড়া দেয় না, তার উপর বৃষ্টির দৌলতে কাক, পক্ষীরা যেন দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া আছে, কিন্তু মনুষ্য জগতে এ নিয়ম খাটে না, তাদের ত কাহারও ভরা কলসীতে ঠোঁট ডুবাইয়া, বাড়াভাতে মুখ ডুবড়াইয়া বেড়াইলে চলিবে না, বাত, বর্ষা, আতপ এবং হিমকে পরাস্ত করিয়াই তাদের পেটের চেষ্টা দেখিতে হইবে। আরামের এবং বিরামের অদৃষ্ট লইয়া তাদের জন্ম হয় না, তবে সুকৃতিবলে যাহারা অপরের বাড়াভাত খাইবার বুদ্ধি লইয়া জন্মিয়াছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

এলবার্ট বালিকা-বিদ্যালয়ের ওম্‌নিবস্‌খানা দুইটি বৃহদায়তন "সেকেণ্ডহ্যাণ্ড" ঘোড়ার দ্বারা বাহিত হইয়া সহরের প্রান্তভাগে পড়ো-বাড়ী, খোলার ঘর, কাল-কাসন্দা, ঘেঁটু ও বাঁশবাগানের মধ্যস্থ একখানা জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকা-বিদ্যালয়ের 'দাইঠাকুরাণী আধ চ'লন্ত গাড়ী হইতে ত্রস্তে নামিয়া উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—"নীল্লীবউয়া! হো নীল্লীবউয়া! গাড়ী আয়া।"

বাড়ীর ভিতর হইতে একটি উদ্বেগ-বিপন্ন কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইল, "দেখলে মা! আমি ত বল্‌ছি আজ আমার খাওয়া হ'য়ে উঠবে না।

"ও মা! মোটে যে গোণা তুটি গরাস ভাত মুখে দিইছিলি রে! খনি উঠছিস্? আজ না হয় না-ই বা গেলি।" সম্বোধিতা মায়ের কণ্ঠ ইতে এই ব্যাকুল প্রতিবাদটুকু নেপথ্যেই শোনা গেল।

মেয়ে এ যুক্তির সমর্থন করিল না; সে অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া ঠল, অর্দ্ধেক দিনই ত এই রকম! ফাইন দিতে হবে যে! সে পয়সাও দেবে না তুমি।"

দাই হরমতিয়া অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার ডাকিয়া উঠিল,—"নীল্লী-ইয়া! জল্‌দি আইয়ে বউয়া,—মাইজি লোগ কেত্তা বোলতি, কাহে তা দেরি করতেহেঁ বউয়া?"

"না মা! না মা! থাক গে—এ দাই! তুরন্ত আতেহেঁ—"

তু তিন মিনিট পরেই একটি বছর বারো তেরোর মেয়ে আধময়লা লের সাড়ী ও ছিটের জামা পরা, হাতে গাছকতক কাঁচের চুড়ি, মাথার চুলের পিছনে আধখোলা প্রকাণ্ড খোঁপা, একগাদা মলাটখসা াতন বই-পত্র বহিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"হা, নীল্লীবউয়া! আপ কেত্তা দেরি কিয়া!"—মন্তব্য করিয়া দাই লিটারী ধরণে পা ফেলিয়া গাড়ীর দরজা খুলিতে অগ্রসর হইল। াটি পাদানীতে পা দিবার পূর্ব্বেই তার সহাধ্যায়িনীমণ্ডলী হইতে একটা শালিত কলরব উঠিয়া পড়িল—

"বাব্বা! নীলিমা! তোমার যে আর সাজা-গোজার শেষ হয় না! ক্ষণ ধ'রে কি হচ্ছিল শুনি?"

'রোজই ত' তোমার দরজায় আমাদের তিন ঘণ্টা সময় লাগে, রা তবু তোমার কত আগে বেরিয়েছি,—তোমারই বা এত দেরি র?"

ও মা! তবু চুলটা ত চারদিন থেকে ওই রকমই আছে দেখছি!

মাগো ! তুই কি কুড়ে, ভাই ! আমি দেখ চান করিনি তবু চুলে 'বে
ক'রে ফিতে বেঁধে নিইচি। তুই যেন কি !"

নীলিমা আসন গ্রহণ করিয়া অপরাধীভাবে সকলের সব প্রশ্নে
জবাব দিল, "মার শরীরটা মোটে ভাল নেই, বৃষ্টি-বাদলায় রান্না হ
দেরী হয়, তবু আমি ঠিক গোণা দুটি গরাস ভাত মুখে দিয়েই
প'ড়েছি।"

মায়ের পরিম্লান মুখখানা মনে পড়ায় তার কণ্ঠ ভেদ করিয়া এ
মৃদুশ্বাস উঠিয়া আসিল। এই কৈফিয়তে তার বান্ধবীরা সপ্তরথীর
তীব্র বিদ্রূপের তীক্ষ্ণস্বরে তাহাকে পুনরাক্রমণ করিল।

অণুকা বলিল, "ও মা ! বাদ্‌লা-বৃষ্টি কি তোদেরই বাড়ীতে হয়
না কি ?"

সুষমা ঠোঁট টিপিয়া মন্তব্য করিল, "তা' ভাই, নীলির মা যদি কালি
পোলাও চড়িয়ে থাকেন ত সে কি ক'রে হবে বল্ ? আমরা তো
খিচুড়ী আর ভাজা খেয়ে এসেছি।"

মনোরমা একটা দু কাঠির গলাবন্ধ, সবুজ ও লাল পশম দিয়া গা
প্রচণ্ড ঝাঁকানীকে উপেক্ষা করিয়া মনোযোগের সহিত বুনিতেছিল,
এই সময়টুকুর জন্যও লাল সবুজ পশমের সেলাইটুকু বন্ধ থাকিলে, কি জ
কি অনর্থই বা ঘটিয়া যাইবে—সে সেই একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করিয়া সুষ
দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, "বলি সুষী ! তুই বুঝি আর সহর খু
পোলাও রাঁধবার লোক পেলিনি। তাই নীলির মায়ের ঘাড়েই
ফেল্লি ? হ্যাঁ ভাই নীলি ! আজ তোদের কি রান্না হয়েছিল রে ?"

এই প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ভিতরকার রহস্য এ সমাজে নিতান্তই অ-প্র
ছিল বলিয়া এ কথায় সকল মেয়েরই ঠোঁটের পাশে হাসির আভাস খেলি
গেল, কোন মেয়ে সামলাইতে না পারিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়াও ফেলি

নীলিমার কর্ণমূল পর্য্যন্ত এই বিদ্রূপ প্রশ্নে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে নিজের লজ্জা-বিপন্নতা সযত্নে রোধচেষ্টা করিতে করিতে শান্ত ঔদাস্যে উত্তর করিল, "আজকের দিনে কি আর হবে।"

অণুকা প্রশ্ন করিল, "আজ তোর মা নিশ্চয়ই তোকে জলখাবারের পয়সা দিয়েছেন? আমি ভাই, আজ চাট্টি চানাচুর, বা সাড়ে বত্রিশভাজা, কচুরি আর রসগোল্লা কিন্‌বো, মনু তুই কি কিন্‌বি?—নীলি, তুই?".

মনোরমা বোনা বন্ধ করিয়া জবাব দিল, "আমি আজ ঝালবড়া আর গোলাপী রেউড়ির কথা ভেবে রেখেছি, ওছাড়া যা' হয় হবে। নীলি নিশ্চয়ই ও সব ছাই ছাই খাবার কিন্‌বে না, সে আজকের দিনে লেডিকেনী, রাবড়ী আর মতিচুর কিন্‌তে দেবে—না ভাই, নীলিমা? কেমন তোর 'মেনু' তৈরি ক'রে দিলুম বল?"

নীলিমার নাম নীলিমা হইলেও সুষমা বা মনোরমার অপেক্ষা রং তার অনেক ফর্সা, তার সেই শুভ্র মুখ এই ব্যঙ্গোক্তিতে অনেকখানি লাল দেখাইলেও মুখে সে শুধু একটুখানি হাসিয়া বলিল, "মেনু তো খুব ভালই হয়েছে, কিন্তু খাবার আজও আমি কিন্‌বো না, বাজারের খাবার আমার মোটে সয় না।"

"হ্যাঁ—তা'—বটে!"—এমন সুরে মনোরমা কথাটা বলিল যে, বাকী মেয়েরা তাদের চাপিবার চেষ্টা সত্ত্বেও হাসি চাপিতে পারিল না; কেবল নীলিমাই তাদের হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াও হাসিতে ত পারিলই না, উপরন্তু সমস্ত মুখটা তার অপমানের লজ্জায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল।

এর মধ্যে স্কুল-যান গমগম শব্দে সহর কাঁপাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী থামিতে না থামিতে ভিতরের মেয়েরা হুড়াহুড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আজও তাহারা 'লেট' হইয়াছে। স্কুলের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে এবং দূর হইতেই দেখিতে পাওয়া গেল, সুলোচনাদির

মুখের চেহারাখানাও প্রসন্ন নয়।—দেখিয়া সকল মেয়েই একসঙ্গে ভ্রূকুট করিয়া ভয় বিপন্নমুখী নীলিমার মুখের দিকে এমনই ভাবে তাকাইল যে সব অপরাধই তার। এই সব কোপ-কটাক্ষে সে যদি ভস্ম হইয়া যায় ত হয় ভাল !

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেমেয়ের গালভরা নাম রাখিতে যদি পয়সা খরচ হইত, তা হইলে নীলিমার পিতা অনুকূলচন্দ্র কখনই স্ত্রী স্বর্ণলতার উপর তাদের নামকরণের ভার দিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে কর্তৃপক্ষের অনবধানতা বশতঃ এই একটা ব্যাপারের উপর কর ধার্য্য এখনও হয় নাই বলিয়া অনুকূলচন্দ্রের পত্নী তাঁর বিবাহিত জীবনে এই একটা বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন।

শুভেন্দু ছেলেটির বুদ্ধিবৃত্তি মন্দ ছিল না, পড়াশুনা করাইলে সে 'মানুষ' হইতেও পারিত। কিন্তু শুভেন্দুর পিতার নাকি ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বিশেষ প্রখর, তাই তিনি মরাহাজা একমাত্র পুত্রকে বিদ্যালাভের পক্ষে অসমর্থ জানিতে পারিয়া সে চেষ্টা করেন নাই ! ছেলেরা আজকাল ইংরাজী শিখিয়া ধৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে—বিশেষতঃ পিতার প্রতি আর যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, এই জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রতি শুভেন্দুর পিতার প্রচণ্ড বিরাগ ছিল। ইংরাজী বিদ্যা বয়কট করিয়াও অপর বিদ্যালাভ করা যায় তা' তেমন কুতর্ক তুলিবে কে ? বিদ্যা তার পাঠশালা, বাঙ্গালা স্কুল প্রভৃতি হইতে আর উর্দ্ধে উঠিতে পাইল না।

অনুকূলের বাল্যবন্ধু ভুবনমোহন একটা মকদ্দমায় আসিয়া একবেলার জন্য বন্ধুগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে ডাল ভাত সজিনাখাড়া চচ্চড়ি, মৌরলা মাছের অম্বলের পরিবর্ত্তে বন্ধু-কন্যা নীলিমার হাতে এক জোড়া সোনার ইয়ারিং গুঁজিয়া দিলেন এবং বন্ধুপুত্র শুভেন্দুকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ নিজের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বন্ধুর হাতে ছেলে দিলে খরচের ভাবনা নাই, সে কথা অনুকূল জানিতেন, শুভেন্দুর উপর যেটুকু খরচ পড়ে, সেটুকুও বাঁচিবে তা'ও জানেন, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অনুকূল ইংরাজীশিক্ষিত উত্তরাধিকারীর কথা মনে করিতেই শিহরিয়া উঠিলেন। ইংরাজী শিখিলে সে কি এই ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস করিবে, বাপের মত আটহাতি ধুতী পরিবে, চানাভিজা গুড় দিয়া জল খাইবে? তখন হয় ত ডসনের জুতায়, আদ্দির পাঞ্জাবীতে, মাংসের কাটলেটে তাঁর বুকের রক্ত টাকা কয়টা দুদিনে ফুঁকিয়া দিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। এই দুশ্চিন্তা মনে উঠিতেই অকাট্য যুক্তি দেখাইলেন, "মরাহাজা একটা ছেলে; ওর মা ওকে ছেড়ে থাক্‌তে রাজী হবে কি!"

ভুবনমোহন নীলিমার দ্বারা বন্ধুপত্নীর মতামত জানিতে চাহিলে অনুকূল নেপথ্যে অবস্থিতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেশ ক'রে ভেবে দেখ, গিন্নি! হঠাৎ একটা খামখেয়ালী কাজ ক'রে বসো না, ছেলে ছেড়ে দিয়ে যে প্যান প্যান করে কাঁদতে বসবে, সিটি যেন হয় না দেখ? তোমার আবার বুকের ব্যামো।"

নীলিমার মুখ দিয়া স্বর্ণলতা জানাইলেন, ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না।

হিতকামী সুহৃদ্‌ সুদীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে বিদায় লইলেন।

স্বর্ণলতার যদিও নিজ সন্তানের সম্বন্ধে এতবড় অবিচার করিতে বুক ফাটিয়া গেল, চোখের জলে গোপনে বুক ভাসিল, তথাপি স্বামীর আদেশের

বিরুদ্ধে একটি কথা তাঁর ঠোঁট দিয়া বাহির হইল না, ভদ্রঘরের মেয়ে স্বর্ণলতা সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে যে জ্ঞানহারা হইয়া তাকে কাছে টানিয়া অশেষ দুর্দ্দশার মধ্যে রাখিলেন তা' নয়। আসল কথা—অনুকূলচন্দ্রের স্ত্রী যদিও বয়স ও পদমর্য্যাদায় গৃহিণী জননী এবং এমন কি, প্রথম সন্তানগুলি বাঁচিয়া থাকিলে শ্বশ্রূমাতার পদবীতেও উন্নীত হইতে পারিতেন, তথাপি আজও তিনি সেই নবোঢ়া বালিকার মত দুর্দ্দান্ত স্বামীর কাছে সঙ্কুচিতা হইয়া আছেন। এক একজন মানুষ যারা অত্যাচারিত হইবার জন্যই জগতে আসে, স্বামী পুত্র ত আছেই, প্রতিবেশীরাও তাদের অবিচার করে এবং তারাও তাহা মানিয়া লয়। এমন কি অবিচার বলিয়াও মনে করে না। অত্যাচার সহিয়া সহিয়া ঐ জিনিষটাই যেন সংসারের কাছে এদের পাওনা হইয়া যায়। দশ বছরে বিবাহ হইয়া "বউ-কাঁটকী" শাশুড়ীর হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহিয়াছেন। বাপের বাড়ীর তত্ত্ব-তাবাসের ত্রুটি ঘটিলে গালি খাওয়ার অন্ত থাকিত না। একবার কি একটু প্রতিবাদ করিতে যাওয়ায় শাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূর মুখে জ্বলন্ত দিয়াশলাইএর কাঠি চাপিয়া ধরিয়া "বউ মানুষের চোপা" করার এমন শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন যে, বধূর মুখ সেই হইতে ছুঁচসুতা দিয়া শিলাই করিয়া দিলেও এর চেয়ে বেশী বন্ধ করিতে পারা সম্ভব হইত না! সেই যে বালিকা স্বর্ণলতা সকল অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহিতে আরম্ভ করিলেন, আজও প্রৌঢ়া গৃহিণী তেমনই ভাবে দেব মানবের সকল অত্যাচার "চিন্তারহিত" কি না বলা যায় না—তবে "বিলাপরহিত" ও অপ্রতীকারপূর্ব্বক সহ্য করিয়া চলিতেছেন। দৈববিপাকের বিরুদ্ধে দেবতাকেও তিনি কোন দিন দোষী করেন নাই এবং মানুষকেও না। এমন কি—নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করিতেও কোন দিন শুনা যায় নাই।

স্বর্ণলতার বিবাহ হয় বৈশাখ মাসে, শয্যাদানের সঙ্গে বাপ তাঁকে

লেপ দেন নাই; পৌষমাসের কনকনে শীতে শাশুড়ী তাঁকে একখানি পুরাতন কাঁথা দিয়া বলিলেন, "কিপটে বাপ মিন্‌ষে লেপ দিলে না, তাঁর মেয়ের জন্যে ঘরের পয়সা ভেঙ্গে লেপ তৈরী কর্‌বো নাকি?" তা' এখনও সেই ব্যবস্থা চলিতেছে! শাশুড়ী প্রতিনিধিত্বে যে ছেলে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁর হাতে মাতৃরক্তের অবমাননা ঘটে নাই।

অব্যবহারে সকল জিনিষেই যেমন মরিচা ধরে, এ মেয়েটির সমস্ত মনোবৃত্তির বোধ করি সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, চিত্তবৃত্তির একটা অংশ কিন্তু সজাগ ছিল—সেটা ভয়।

বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও স্বর্ণলতাকে অনুকূলচন্দ্রের দিদি মনে হইত। গায়ের রং এক সময় উজ্জ্বল ছিল, আজও তার আভাস পাওয়া যায়, দীর্ঘ দেহ ঈষৎ নত হইয়াছে, ললাটের চর্ম্ম রেখায় ভরা, মাথার চুলের অর্দ্ধেক সাদা, গালের মাংস লোল হইয়া, গায়ের মাংস শীর্ণ হইয়া তাঁহাকে যেন একটি রসহীন আতপ-শুষ্ক ফলের মতই দেখাইত। কিন্তু তাঁর সচকিত ভীত দৃষ্টির মধ্যে, মৌন শান্ত অধরে এখনও যেন একটি অতৃপ্ত বালিকা-জীবনের সাড়া পাওয়া যায়! শুষ্ক বালুরাশির তলদেশে এখনও যেন অনেকখানি স্বচ্ছ শীতল সলিল লুকান আছে বলিয়া সন্দেহ জাগে, কিন্তু দর্শকের সে সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার পথ নাই—দ্বারে কড়া পাহারা।

যাহা হউক, এইরূপে "মাতা শত্রু" এবং "পিতা বৈরী" হইয়া বালকটির পড়াশুনার পথে যখন কণ্টকবৃক্ষ রোপন করিল, তখন কোথা হইতে আর এক অদৃশ্যশক্তি আর একটা অভাগা জীবের আশ্চর্য্যরূপ সহায়তা করিয়া বসিল! পাড়ার নরহরি ভট্টাচার্য্যের বয়স্থা কন্যা স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত বলিয়া অনেকে—বিশেষ অনুকূলচন্দ্রই সে বেচারাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, হঠাৎ দেখা গেল, এক মোটা মাহিনার মধ্যবয়সী রাজকর্ম্মচারী দ্বিতীয় পক্ষের জন্য

সেই বয়স্থা ও লেখাপড়া জানা মেয়েকে, বিনা পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবাহসভায় বরকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও হইয়াছিল, বরটি উত্তর দেন, মেয়েটির শিক্ষা আছে, ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাটা দিতে পারলে আমার সাংসারিক ভার লাঘব হবে।"

এই ঘটনায় অনুকূলচন্দ্রের চোখ ফুটিল। বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "কাল থেকে নীলিকে মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবার সব ঠিক ক'রে এলাম, এবার কিন্তু তোমার কাঁদুনী শুনচিনে, সেটি আর হচ্ছে না, আজ-কালের দিনে মেয়ে-ছেলের একটু নেকাপড়ার দরকার।"

স্বর্ণলতা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তিনি কি শুনিতে কি শুনিলেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে বাড়ীতে ছেলের বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ, সেই বাড়ীর মেয়ে চলিল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে ?

কিন্তু বিশ্বাস তাঁহাকে করিতেই হইল। পরদিন যখন মেয়ে স্কুলের গাড়ী আসিয়া তাঁদের দরজায় দাঁড়াইল এবং অনুকূল আস্তে ব্যস্তে আসিয়া মেয়েকে গাড়ীর সঙ্গে আগতা স্কুলের দাইয়ের হাতে সঁপিয়া দিলেন।

শুভেন্দু আসিয়া জলভরা চোখে মা'র গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "নীলিকে যে বড় স্কুলে পাঠান হলো ?"

স্বর্ণলতা এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "ওর ইচ্ছা হলো, বাবা !"

শুভেন্দু বলিল, "আমার বেলাই বা সে ইচ্ছাটা হলো না কেন ওঁর ?"

স্বর্ণলতা চকিতে চাহিয়া সভয়ে কহিয়া উঠিলেন, "চুপ কর—শুভু !"

শুভেন্দু একবার নিজের পিছনটায় চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া লইল, উপস্থিত আশঙ্কার কারণ না দেখিয়া দৃঢ় এবং রূঢ়কণ্ঠে পুনশ্চ বিদ্রোহ

ঘোষণা করিয়া কহিল—"কেন, ইস্কুলে পড়লে যদি খারাপ হয়ে যায়, তা' হলে নীলিই বা হবে না কেন? ও কি চাকরী ক'রে পয়সা এনে তোমাদের খাওয়াবে? ও যদি পড়তে পারে আমিই বা পারি না কেন? আমাকেও দিতে হবে ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে—দিতেই হবে।"

স্বর্ণলতা ছেঁড়া কাঁথার উপর পুরাতন কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতেছিলেন, সেলাই ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং সস্নেহে ও সভয়ে ছেলের একটা হাত ধরিয়া তাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে মৃদু ও ভীতকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "ইংরেজী পড়া উনি পছন্দ করেন না তাই জন্যেই ত তোমায় ইংরেজী ইস্কুলে দেন নি, নীলি ত ইংরেজী পড়্‌চে না—এ নিয়ে গোলমাল করো না—লক্ষ্মী গোপাল আমার!"

শুভেন্দু গা ঝাড়া দিয়া মায়ের হাত ঠেলিয়া ফেলিল, উদ্ধত তীক্ষ্নকণ্ঠে কহিল, "হুঁ—গোল করবে না বই কি! 'লক্ষ্মী গোপাল' বৈ কি! আমি কিসের লক্ষ্মী গোপাল? সে ত তোমাদের ঐ ধীঙ্গী আহ্লাদী নীলি!—বাঃ রে মজা! মুখপুড়ী মেয়ে, সক্কালবেলা এক পেট গিলে গাড়ী চড়ে ইস্কুল যাবেন—আর আমি বাড়ীতে সব্বার পাত কুড়িয়ে খাব—গরুর খড় কাটবো—নের্দি কুড়ুবো—বা রে মজা! বাঃ! বাঃ!"

ক্ষীণ ও শুষ্ককণ্ঠে মা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ছেলেদের ইস্কুলে অনেক খারাপ ছেলে আছে কি না—সেই জন্যই দিতে পারেন না, সে বার বিপিনের সঙ্গে কি রকম মারামারি করেছিলে মনে নেই?—তাই তো ছাড়িয়ে নিতে হ'লো—"

শুভেন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল—"মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—তোমাদের ও-সব চালাকি আমি খুব বুঝি! দেশ শুদ্ধ ছেলে ইস্কুলে যাচ্ছে আর আমি গেলেই নাকি বয়ে যাব?—আচ্ছা, দেখ তা হ'লে আমি

বাড়ী থেকে বয়ে যেতে পারি কি না!—এবার থেকে মন্দ ছেলে বেছে তাদের সঙ্গেই বেড়াবো, দেখছো ত ইস্কুল ছেড়ে সারাদিনই ঘুড়ি ওড়াই আর লাট্টু খেলি?—এখন থেকে কেবলই ঘুড়ি ওড়াবো, লাট্টু খেলবো, কপাটী খেলবো, সাঁতার দোব, এই সব দিনরাত করবো, তোমাদের গরুর খড় কুচুতে বল্লে শুনছি তাই, কলা—”

জীর্ণ বহির্দ্বারে মনুষ্য প্রবেশজনিত যে শব্দটা শুনা গেল, তাহাতেই এই বালক-বীরের বীররসে বাধা পড়িয়াছিল, ছেঁড়া চটির যে চিরশ্রুত বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইয়া ছিল উহাতেই সকল বীরত্বে জলাঞ্জলি দিয়া সে বিপন্নমুখে ছুটিয়া পলাইল।

স্বর্ণলতার ভারাক্রান্ত অন্তর ভেদ করিয়া সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস উত্থিত হইল, এতক্ষণ ছেলের সাক্ষাতে ঐটুকু স্বাধীনতাও তিনি গ্রহণ করিতে ভরসা করেন নাই!

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কুলের ছুটীর পর মেয়েরা হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীর কাছে জড় হইয়াছে এবং আগে উঠিবার চেষ্টায় সোরগোল লাগাইয়াছে, বারান্দার উপর হইতে বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ডাকিলেন, “নীলিমা!—শুনে যাও।”

আহ্বান পাইয়া নীলিমার মুখ শুখাইয়া গেল, সুলোচনাদি’ কি জন্য ডাকিতেছেন, সে তার অজ্ঞাত নয়, প্রথমবারও নহে, ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইল।

সুলোচনা বসু এই উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, সংযত ও রাশভারী মানুষ। পদমর্য্যাদার উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন, "তোমার বাবাকে চিঠি দিয়েছিলে?"

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, দিয়াছে।

"কিছু বল্লেন?"

নীলিমার কপালে ঘাম দেখা দিল, তিনি যাহা বলিয়াছেন, সে কথা বলিবার সাধ্য তার নাই, মিথ্যা বানাইবার কৌশলও ভাল জানেনা, বিপন্ন ও বিমর্ষভাবে পায়ের আঙ্গুল দিয়া নীরবে মাটী খুঁটিতে লাগিল।

তিনি যে 'কি বলিলেন'—এ প্রশ্নের উত্তর এর চেয়ে বেশী সরল ভাষায় পাওয়া সম্ভব ছিল না, সুলোচনা বসুও তাহা বুঝিতেন। বিরক্ত হইলেও বাহিরে এই বিপন্ন জীবটিকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না, শুধু স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বলিলেন, "প্রায় তিন বৎসর তুমি এখানে ভর্ত্তি হ'য়েছ, এ পর্য্যন্ত তোমার মাহিনার একটি পয়সাও পাওয়া যায় নি, পাছে তোমায় ছাড়িয়ে নে'ন সেই জন্য তাঁকে ব্যস্ত করিনি—সে ত তুমি জানো, কিন্তু এখন আর কারুকে 'ফ্রি' রাখা সম্ভব হচ্ছে না। গবর্ণমেণ্ট 'এড্' অর্দ্ধেক হ'য়ে গিয়েছে, নানা রকমে খরচ বেড়েছে, সকল ক্লাসের মেয়েদেরই বাকি আদায়ের নোটিশ দেওয়া হয়েছে অন্ততঃ এ বৎসরের। তোমার বাবাকে সব কথাই লেখা হয়েছিল, এই চিঠিটা আজ দাওগে, পনের দিনের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক পাওনা দিয়ে দিন, না হয় ত'—অন্যের পক্ষে দৃষ্টান্তটা ত ভাল হচ্ছে না! তোমার নজীর সব্বাই দিতে আরম্ভ করেছে।"

নীলিমার দুটি চোখে জল ভরিয়া উঠিয়াছিল, পাছে সে জল ঝরিয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজেকে সম্বরণ করিতে করিতে কোন মতে একটু-

খানি ঘাড় কাত করিয়া জানাইল, বুঝিয়াছে এবং হাত পাতিয়া চিঠিটা লইল।

নীলিমার সঙ্গিনীগণ খামখানার কি লেখা আছে, দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া কহিল, "দেখি, দেখি, আজ আবার কার নামের চিঠি এলো? 'অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এস্কোয়ার'। অ ভাই! রোজ রোজ সুলোচনাদি' তোর বাবাকে কি সব এত লেখেন ভাই? কই আমাদের বাবাদের ত লেখেন না!"

মনোরমার সেই দুই কাঠির বোনাটা এখন খানিকটা লম্বা হইয়াছে, গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে বোনা হাতে লইয়া প্রথম প্রশ্নকারিণীকে লক্ষ্য করিয়া একটা বাণ ছুঁড়িল—"মালতী! তুই যেন কি! তোর বাবা গবর্ণমেণ্টের উকীল, মাসে দু'হাজার টাকা রোজগার করেন, তোর স্কুলের মাইনে কি বাদ পড়ে দিতে যে, তোর বাবার কাছে সুলোচনাদি'র তাগাদার চিঠি যাবে?"

প্রতিমা অমনি টানা সুরে ঘাড় দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, "ও মাঃ! তাই নাকি! সেইজন্যেই সুলোচনাদি' বারান্দা থেকে যক্ষুনি 'নীলিমা' ব'লে ডাকলেন, নীলির মুখটি শুকিয়ে এতটুকুখানি হয়ে গিছ্‌লো! তুমি নিশ্চয় তখনই বুঝতে পেরেছিলে, না নীলিমা?"

নীলিমা নীরবে একটা ঢোক গিলিল।

মনোরমা ছোটবোন প্রতিমার দিকে তীব্রদৃষ্টি হানিয়া ক্ষুরবাণের মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "পিমা, কি যে বলে! ও নাকি আর তাই বুঝতে পারেনি? এই ত আর প্রথমবার ওর হাত দিয়ে ওর বাবার কাছে তাগিদের চিঠি পাঠান হয়নি যে, ওর বুঝতে বাধবে। ও ত, ও, আমিও ত যেই সুলোচনাদি' ওকে ডেকে বলেচেন, 'নীলিমা শুনে যাও'—তক্ষুণি বুঝতে পেরেচি।"

অণুকা বলিল, "আমিও ভাই !"

সাবিত্রী মেয়েটী সকলের পিছনে বসিয়াছিল, সে সেখান হইতে মুখ বাড়াইয়া করকাপাত তুল্য খন্‌খনে কঠিন স্বরে নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া উঠিল, "তা নীলিমা ! তোমার বাবাকে তুমি স্কুলের মাইনেটা দিয়ে দিতে বল্‌তে পার না ? সত্যিই ত বার মাস ত্রিশ দিন ওরা কি তোমায় ফ্রি'তেই পড়াবেন না কি ? কি অন্যায় তোমাদের।"

শুনিয়া দুই একজন মেয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল, কিন্তু মনোরমা মেয়েটি নাকি কাহারও অসৈরণ সহিতে পারে না, সে সোজাসুজি বলিয়া বসিল—"সত্যি নাকি, সাবি ! অন্যায় না কি ? তা হ'লে তোমার দাদামশাই সেই অন্যায়টা কি করে করেন শুনি ! সেদিন সুলোচনাদি'র সঙ্গে রামদীন চাপরাসীর কথা হচ্ছিল, তোমারও ত সাত আট মাসের মাইনে আদায় করতে বেচারী ঘোল খেয়ে যাচ্ছে, তুমিই বা এমন অন্যায় সইচো কি করে ?"

তখন দলপতিকে ফিরিতে দেখিয়া ছাত্রী সমিতির মধ্যেরও হাওয়া বদলাইয়া গেল, সুষমা তখনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর ও বেচারী তার বাবাকে কেমন করেই বা টাকার তাগিদ দেবে ভাই ?"

সাবিত্রী মেয়েটি মেয়েদের স্কুলের মধ্যে নাকি কলহ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী—তবে এ বিষয়ে প্রথম পুরস্কারলাভ এ পর্য্যন্ত যে করিতে পারে নাই, তার কারণ, ওই বিষয়ে স্কুলে কোন প্রাইজের ব্যবস্থা ছিল না, থাকিলে মনোরমার পরিবর্ত্তে বোধ করি সেই পাইত, হয়ত তাদের 'ব্র্যাকেটে' পাশ করাও অসম্ভব ছিল না, হাঁক-ডাক কম থাকিলেই যে নৈপুণ্যের অভাব বুঝায়, তাহা নহে, বরং টিপিয়া টিপিয়া চোখা চোখা শরক্ষেপ করিতে জানাতেই সমধিক সমর পটুত্ব বুঝায়। মনোরমার মন্তব্য শুনিয়া বড় বড় ড্যাবডেবে দুই চোখ গোল করিয়া সাবিত্রী যেন বাঘের

মত গর্জ্জিয়া শত্রু পক্ষের উপর হুমকি দিয়া উঠিল, "বলি মোনা! তোর যে বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে! আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের মাইনের টাকা ইস্কুলকে দেয় বা না দেয়, তোর তাতে কি লা? তুই তাই ট্যাঁক ট্যাঁক ক'রে বলবি ক্যান্ লা?. ফের যদি আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আস্‌বি তা হ'লে—"

"কি? মারবি না কি? সুষমা! লীলা! অণুকা! সব্বাই সাক্ষী থাকলি, এর যদি না আমি প্রতীকার করি তা হ'লে—"

"কি প্রতীকার কর্‌বি লা? জেলে দিবি না ফাঁসি কাঠে লটকাবি?"

এইরূপ সলজ্জ আস্ফালনে পথের দুই সারি লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে করিতে নেপথ্যচারিণীগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখিনী হইলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যদিও সময়টা অনুকূলচন্দ্রের বাড়ী থাকিবার সময় নয়, তথাপি কি ঘটিতে কি ঘটে, তাই বাড়ী ঢুকিয়া নীলিমা সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া, কতকটা আশ্বস্তচিত্তে ডাকিল, "মা!"

"এস মা, এস!"—বলিতে বলিতে ক্ষীণাঙ্গী ক্লান্তমূর্ত্তি জননী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে বসান যাঁতায় আটা পিষিতেছিলেন।

"এস মা, এস!—মুখটি শুকিয়ে গেছে রে! সারাদিনটাই যে

উপোসে গেল! মুখ হাত ধুয়ে রান্নাঘরে আয়, চারটি ভাত ফুটিয়ে রেখেছি, একটু দুধ-চিনি দিয়ে খা'।"

নীলিমার পেটে যে উগ্র জ্বালা ছিল, তাহাতে তার অপমানাহত ক্রুদ্ধ মন এই শুভ সংবাদে জুড়াইয়া জল হইতে পারিত; কিন্তু ক্রমাগত বিদ্রূপ সহিয়া সহিয়া আজ তার পূর্ণ উপবাসী শরীর মন বড় বেশী তাতিয়া উঠিয়াছে; তাই সে মায়ের দেওয়া সুখবর আমলে না আনিয়া উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "যাও—আমি তোমার দুধ-ভাত খেতে চাইনে; আমার স্কুলের মাইনেটা তোমরা দিয়ে দেবে কি না, বলো।"

স্বর্ণলতার ভরাচিত্ত গুটাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। মেয়ের মনে কিসের আগুন লাগিয়াছে, বুঝিয়া অপরাধী ভাবে মাথা নত করিলেন, এই যে প্রশ্ন তাঁকে করা হইল, এর জবাব তো তাঁর জানা কিন্তু সে কথাটা ঠোঁট দিয়া বাহির হইল না।

নীলিমা চিঠিখানা দেখাইয়া অভিমানপূর্ণ বেদনা-ছলছল চোখে মা'র পানে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "সুলোচনাদি' আমায় রোজ রোজ বকছেন, রাগ করছেন, আজ বলেছেন, এবার যদি মাইনে না পান, তা হ'লে স্কুল থেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দেবেন। কেন তোমরা আমার মাইনে দিয়ে দিচ্ছো না বল তো? শুধু শুধু আমায় সব্বাইকার কাছে সব বিষয়ে খোঁটা খেতে হয়—তুমি বাবাকে কেন ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলো না?"

স্বর্ণলতা বিষণ্ণ মুখ তুলিলেন—"বলেছিলুম রে! উনি বলেন, অনেক টাকা হয়ে গেছে—অত টাকা তাঁর নেই, কেমন ক'রে দেবেন? এতদিন যেমন ওঁরা দয়া ক'রে পড়িয়ে এসেছেন, এখনও যদি তোর মুখ চেয়ে—"

নীলিমা মায়ের এই মৃদু সঙ্কুচিত করুণ কথা কয়টিতে তীব্র-জ্বলনে জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে বাধা দিল—"চাইনে আমি অমন দয়া

ভিক্ষা কর্‌তে! যদি স্কুলের মাইনে দিতে পারবে না, তবে কেন তোমরা আমায় সব্বাইকার কাছে ছোট কর্‌বার জন্যে স্কুলে দিয়েছিলে?”—বলিতে বলিতে অঝরঝরে কাঁদিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।—মা অবাক্ মুখে চাহিয়া রহিলেন।

স্বর্ণলতা বিমর্ষমুখে রান্নার পিঁড়িতে বসিয়া একখানি মেটে পাত্রে চারিটি মোটা চালের ভাত বাড়িতেছিলেন, শুভেন্দু 'মা' বলিয়া ঘরে ঢুকিল।

“হুঁ! তাই তো বলি, মুখপুড়ী মেয়ে কি খেয়ে খেয়ে অত মোটাচ্ছে, আর আমিই বা তাই খেয়ে দিনকের দিন শুকুচ্ছি কেন? এর ভেতরে মস্ত বড় একটা রহস্য আছে দেখছি! তাই না? —দাও দিকিন্, ওই ভাতক'টা দুধ দিয়ে আজ আমিই না হয় খেয়ে যাই! —বাঃ বাঃ, আবার একটা কাঁচকলা পাকাও জমিয়ে রাখা হয়েছে, মেয়ের জন্যে। ওঃ দিব্যি হবে, দিয়ে ফেল আজকের এই অপাত্রটাকে, পেট আমার ক্ষিদেয় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে! এখুনি যাব জগা মতেদের সঙ্গে ফুটবলম্যাচ খেলতে।”

শুভেন্দু ধপ্ করিয়া নীলিমার জন্য পাতা পিঁড়িখানায় বসিয়া পড়িয়া আগ্রহ-ত্বরিত হস্তে ভাত শুদ্ধ পাত্রটা কোলের কাছে টানিয়া আনিল। দুগ্ধ নামে আখ্যাত এতটুকু নীলবর্ণের জল বিশেষকে ভাতের উপর ঢালিয়া আঠাগন্ধ কদলীযোগে তাহা পরম পরিতোষে মাখিতে লাগিল।

“কই! চিনি কোথায়? ওইটুকু নুণের মতন চিনি দিয়ে কখন অতগুলো ভাত খাওয়া যায়? নিজের আদুরে মেয়ের জন্যে চুরি ক'রে রাখা হলো বুঝি? দাও দাও বার ক'রো, না দিলে কিন্তু ভাল হবে না তা বলছি, হ্যাঁ!”

স্বর্ণলতা চিনির কৌটা পাতের উপর উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া দিয়া

দুঃখিত স্বরে কহিলেন, "আর ত ঘরে নেই, বাবা! ওই দিয়েই খেয়ে নাও, লক্ষ্মীটি!"

'ও সব খোসামুদে কথার ধার ধারিনে!—নেই কি?—আলবৎ আছে, তোমার স্কুলে-পড়া গাড়ীচড়া মেয়ে কি না ওইটুকু চিনির টাকনা দিয়ে এই ভাতের কাঁড়িটি খেতে পারতো? দাও বলছি শীগগির, না হ'লে এই রইলো তোমার ছাইপিণ্ডি, আহ্লাদী মেয়ে খেতে পেলেন না ব'লে রেগে গেছ ত? সেই কথা খুলে বল্লেই হতো—তা' থাক, তোমার বিদুষী মেয়েই থাক্। পচা নর্দ্দমায় ফেলে লোকসান করবার দরকার নেই।"

তড়বড় করিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে শুভেন্দু সত্য সত্যই মাখাভাত পাত্তর শুদ্ধ ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেল এবং মায়ের বুকফাটা কাতর করুণ আহ্বান কানে না তুলিয়াই গুম গুম শব্দে পা ফেলিয়া দালান পার হইয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

নীলিমা নিজের দুঃখ অভিমানে অভিভূত হইয়া মায়ের সঙ্গে যেটুকু কুব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল মা'র কাছ হইতে সরিয়া আসিয়াই তার জন্য গভীর অনুতপ্ত হইয়াছে। মা যে তার কত অসহায়, সে কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও স্বামীকে তিনি যে কতদূর ভয় করিয়া চলেন সে কথা তার অজ্ঞাত ছিল না। পিতা না দিলে মা কেমন করিয়া তাঁকে দিয়া দেওয়াইবেন? এ কথা মনে হইতেই মনে হইল, মা'র মনে সে আজ অনর্থক কত কষ্ট দিয়াছে! মা তাকে আদর করিয়া খাইতে দিতে চাহিলেন, আর সে 'খাইতে চাহে না' বলিয়া তাঁর সে যত্নের অবমাননা করিয়া চলিয়া আসিল। অপরাধীর মত সঙ্কোচে মরিয়া গিয়া সে নিঃশব্দে নীচে নামিল, কিন্তু রান্নাঘরের কাছে আসিতেই তার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, শুভেন্দু সোৎসাহে ভাত মাখিতে মাখিতে উৎফুল্ল কণ্ঠে

বলিতেছে—"কই চিনি কোথায়?—অতটুকু নুণের মত চিনি দিয়ে কখন অতগুলো ভাত খাওয়া যায়?"

তেমনই করিয়া পা টিপিয়া নীলিমা উপরে উঠিয়া আসিল।

সে জানিত তার মা নিজের ভাগের চাল দু'টি দু'টি জমা করেন এবং মুটাখানেক জমিলেই এক দিন বিকালের পাঁপর পোড়া বা ভুট্টাভাজার বদলে রাঁধিয়া দেন, সেই ক'টি ভাত দুইজনের আধ পেটাও হয় না।

উপরে আসিয়া নিত্যকার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু মা'র সেই বিষণ্ণ নিরুপায় মুখচ্ছবি তার মনটাকে বেশ সহজ হইতে দিল না। তার উপর সারাদিনের উপবাসে শরীরও যথেষ্ট দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল। বৃষ্টির জন্য কাপড়-চোপড় ঘরে-বারান্দায় করিয়া টাঙ্গান ছিল, সে সব খুলিয়া আলনায় রাখিয়া ভিজা কয়েকটা লইয়া ছাদে উঠিল, সাবিত্রী পাহাড়ের সিঁড়ির মত উঁচু উঁচু সিঁড়ির ধাপ উঠিতে পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কয়েকদিনের পরে মধ্যাহ্ন হইতে বৃষ্টি থামিয়াছে, আকাশের সর্ব্বত্র যদিও নির্ম্মেঘ হইতে পারে নাই, তথাপি যে সব খণ্ডমেঘ ত্রস্তগতিতে ইচ্ছাসুখে সঞ্চরণ করিতেছে তারা ভীতিপ্রদ নহে, মেঘের বিরাট প্রাচীর টুটিয়া যাওয়াতে বারিধৌত প্রসন্ন জগতের বক্ষে নামিয়া আসিয়া প্রফুল্ল সূর্য্যকর যেন স্মিতহাস্যে সকলকেই অভিনন্দন জানাইতেছিল, দরিদ্রের কুটিরে ধনীর অট্টালিকায় সর্ব্বত্রই চির-অতিথির আগমনী সমারোহের সহিত চলিতেছিল।

নীলিমা কাপড় কয়টা ছাতের প্রাচীরে মেলিয়া দিয়া অল্প দূরের একটা বাড়ীর ছাদের দিকে চাহিল। সে বাড়ীটা অণুকাদের। ছাদের উপর অণুকারা তিন ভাই বোনে কমলালেবু খাইতে খাইতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তাদের মা ডালায় ভরিয়া আঙ্গুর, আপেল ও লেবু

সরবরাহ করিতেছেন, বুকের কাছে একটা নিঃশ্বাস আচমকা জমিয়া উঠিতেই সে চমকিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। তার ক্ষুৎপিপাসাতুর বুভুক্ষু দেহ মন কি অন্যের সুখে ঈর্ষ্যা করিতেও আরম্ভ করিল নাকি?—ছি ছি, না না—এ কথা প্রাণপণে মনে করিতে করিতেও কিন্তু বিবেকের নিষেধ না মানিয়াই তার অতৃপ্ত চিত্ত অকস্মাৎ মনে করিয়া বসিল—সেও যদি অণুকারই আর একটি বোন হইয়া জন্মিত!—কত তপস্যা করিলে মানুষ গরীবের ঘরে জন্মায় না?

সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখ মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল—কি শান্ত, কি করুণ সে মুখ! নীলিমা কি নিষ্ঠুর!—ও-ই মাকে কিনা সে প্রত্যাখ্যান করিয়া মনে করিতেছে সে যদি অন্য মায়ের মেয়ে হইত ত বেশ হইত! কেমন করিয়া এমন কথা মনে করিল? সে যদি না তার মায়ের মেয়ে হইত, মায়ের কি হইত?—মা'র মুখ চাহিতে তো কেহই থাকিত না! এ কথা ভাবিতে গিয়া মনে পড়িল সেই বা মায়ের মুখ কতটুকু চায়? এই ত মায়ের আদর করিয়া খাইতে ডাকার প্রত্যুত্তরে তাঁকে কড়া কথা শুনাইয়া আসিয়াছে! মা'র প্রাণে কতখানি ব্যথা বাজিবে, সে কি ভাবিয়াছিল? যদি ওই মা অণুকার মায়ের মত মুখের সামনে আঙ্গুর-আপেলের ডালা ধরিতে পারিতেন, সে কি সে সব প্রত্যাখ্যান করিয়া মা'র প্রাণে আঘাত দিতে পারিত? লোভ!—হায় রে লোভ! মায়ের স্নেহটা নয়, সন্তান তাঁর ভালবাসার অপেক্ষা উত্তম অশন-বসনেরই আকাঙ্ক্ষা করে? নিজের প্রতি ঘৃণা বোধ হইল।

"কি গো বিবি সাহেব! হাওয়া খাওয়া শেষ হলো না?"

দাদার সম্ভাষণে একান্ত অপ্রতিভ হইয়া নীলিমা মুখ ফিরাইল—"তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হ'য়ে গেল দাদা?"

শুভেন্দু শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল, "ওগো, না গো, না—ভয় নেই,

তোমার অন্নের হন্তারক হইনি, যাও, সব ঠিক আছে, কৃপা করে একটু মুখে তুলে দিয়ে এস গে'।"

কথার ভাবে আসল খবর জানিতে পারিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া নীলিমা বলিয়া উঠিল, "তুমি খেলে না কেন, দাদা? যাও—তুমি খেয়ে এস, আমার ক্ষিধে নেই, বড্ড মাথা ধরেছে কিনা—আমি তো খাবো না।"

শুভেন্দু বলিল, "আহা—মাথা ধরেছে! ম'রে যাইরে! প'ড়ে প'ড়ে বোধ হয়! এসো—বিছানা পেতে দিই গে' গা মেলে শোবে এসো। মাথায় গোলাপ জলের পটি বেঁধে দেবো?—হাওয়া করবো নাকি?"

এই বিদ্রূপের খোঁচা খাইয়া অভিমানে চোখের কোল ভর্ত্তি হইয়া উঠিলেও নতমুখে তাহা সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিয়া নীলিমা মিনতি করুণ স্বরে কহিল, "কিছু করতে হবে না, লক্ষ্মীটি! তোমার পায়ে পড়ি—তুমি খেয়ে এস।"

"হুঁ! আমি খেলে কি হবে? বরং তুমি খাও গে যেয়ে, মাথার মগজে একটু ঘি হবে—আ মলো! মুখপুড়ী মেয়ে আবার ভ্যাঁ ক'রে কেঁদেই ফেললেন। কাঁদলি তো বড় বয়েই গেল! তোর সখ হয়েছে তুই কেঁদে মরগে যা, আমার তাতে কলা! হুঁ, বুঝেছি—ও কি আমায় খাওয়াবার জন্যে কাঁদছিস্! মনে করেছিস্, ওই রকম প্যান প্যান করলে আমি রেগে মেগে চলে যাব, আর মজাসে খুব খানিক গুড়-চিনি মেখে গব গবিয়ে ভাতগুলো গিলবি।—ঐ রে! কিপ্‌টে বুড়োটা ঐ গলির মোড় ফিরলো বাড়ীর দিকেই ত আস্‌ছে না? তাইতো—পালাই।"

শুভেন্দু তিন লাফে সিঁড়ি নামিয়া খিড়কীর দ্বারের দিকে ছুট দিল। আর পথের উপর বাপকে দেখিতে পাইয়া একসঙ্গে দুইটা বিপদের সম্ভাবনায় নীলিমাকে ভয়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বাড়ী ঢুকিয়াই

পিতা একবার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া সারাদিনের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া লন, বিশেষতঃ রান্নাঘরে না গেলে মন তাঁর স্থির হয় না। যদি মায়ে মেয়ে ও ছেলের মিলিয়া তাঁর সকল সম্পত্তি লুটিয়া লুকাইয়া খাইয়া ফেলে! এই উদ্দেশ্যে এক এক দিন অকস্মাৎ অসময়ে চলিয়া আসিতে হয়। আজ যখন ঐ দুধমাখা ভাত ও রন্ধনকারিণীকে দেখিতে পাইবেন, তখনকার দৃশ্য মনে করিতে তার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ছুটীর দিনে বাড়ী থাকিলে সে দেখিয়াছে মায়ের ভাত খুবই কম থাকে। যদিও অনুযোগ করিলে অ-ক্ষুধার দোহাই পাড়েন, তবু নীলিমার সন্দেহ হয়, মধ্যে মধ্যে তাদের যে ভাত রুটি রাঁধিয়া খাওয়ান, তারই জন্য ঐ অ-ক্ষুধা। এবার হয় ত অপব্যয়ের চাউল বাঁচাইতে পিতা তাঁর জন্য অর্দ্ধাশনেরই ব্যবস্থা করিবেন।

উদ্বেগে অধীর হইয়া রান্না ঘরে ছুটিয়া গেল।

"বাবা আস্ছেন, কি হবে, মা?"

স্বর্ণলতার নিজের মুখ এ সংবাদে শুকাইয়া গেলেও চিরাভ্যস্ত ধৈর্য্যের সহিত সস্নেহ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি খেয়ে নাও, নীলা!—আমি যাচ্ছি।" এই বলিয়া পতি সম্ভাষণার্থে অগ্রসর হইয়া গেলেন, কিন্তু স্বর্ণলতার আজ কার মুখ দেখিয়া রাত্রি পোহাইয়াছিল, বলা যায় না—এমন অপ্রত্যাশিত কাণ্ডও ঘটে!

"গিন্নি!—বলি কোথায় গো!" গৃহিণী স্বর্ণলতা কম্পিত-পদে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভয় হইতেছিল—নীলিমা হয় ত মাখা ভাত কয়টা খাইয়া উঠিতে পারিবে না—শুভেন্দুর কথা মনে হইয়া বুক চিরিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠিল ও পড়িল। কোলের ভাত ফেলিয়া ছেলেটা চলিয়া গেল! সহসা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া শুনিলেন স্বামী তাঁর সহিত আজ রসিকতাও করিতেছেন নাকি?

"ও গিন্নি! নেমন্তন্ন খেতে যাবার জন্য যে বড্ড জোর তাগিদ এসেছে। বলি, যাবে নাকি? তা হ'লে চটপট তল্পিতল্পা বেঁধে নাও।"

নূতন সৃষ্টি দেখিয়া স্বর্ণ অবাক হইয়া স্বামীর দন্ত-বিকশিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এরকম কথা তো জীবনে শুনেন নাই যে উত্তর দিবেন।

অনুকূলচন্দ্র একটা নোটের তাড়া দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! একেই বলে মেয়ে-বুদ্ধি! মাইরি বল্‌ছি, রঙ্গ করছিনি। ভুবন রায়কে মনে আছে, সেই যে একবার ক'বছর আগে গোঁড়াকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—সে-ই মেয়ের বিয়ের যাবার জন্যে চিঠি দিয়েছে, আর টাকা পাঠিয়েছে গাড়ী ভাড়ার—শোন কথা! সব্বাইকার সেকেণ্ড ক্লাসেরই তো ভাড়া—কত টাকাই না জানি ওরা খরচ করে!"

'উড়নচণ্ডে' লোকগুলার অপব্যয়শক্তির কথা স্মরণে আসিতেই 'মিতব্যয়ী' অনুকূলের যেমনই মনে পড়িল সেই অপব্যয়িত টাকার কিছু উড়িয়া তাঁর লোহার সিন্দুকের 'দোরগোড়ায়' আসিয়া পড়িয়াছে, অমনি গলার সুরটাও ফিরিয়া গেল :—

"ভালই করেছে—অনেক হয়েছে, খরচ কর্‌বে না। আমাদের মতন ত আর পাতরচাপা কপাল ক'রে আসেনি! তা দেখ, গিন্নি! তোমরা আর এই দুরন্ত শীতে কোথায়ই বা যাবে? আমিও এখন যেতে পারবো না। ক্ষেত-খামারটুকু করেছি, রবি-গুলো নষ্ট হবে। মধু মিস্ত্রীর সুদটা উসুল করা দরকার। নৈলে তামাদি হয়ে যাবে।—আয় নেই একটি পয়সা, কিন্তু 'ঝাঠা'টুকু ত ষোল আনা পোহাতে হচ্ছে। তা' দেখ, আমি বলি কি, ঐ গোঁড়া ছোঁড়াটাকেই না হয় পাঠিয়ে দিই, গাড়ী

ভাড়ার টাকাটাও বাঁচবে, আর ঝঞ্ঝাটও হবে না। তা' গোঁড়ার এই বয়সে অত নবাবী ত আর ভাল নয়, তাকে একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটিয়ে দিলেই চলে যাবে।—কি বল?"

স্বর্ণলতা ঈষৎ ব্যগ্র হাসি হাসিয়া সাগ্রহে একপাশে ঘাড় নাড়িলেন, অর্থাৎ জানাইলেন, "তাই হোক—পরক্ষণে এই অবসরে মরিয়া হইয়া কোন মতে বলিয়া ফেলিলেন—"ওই টাকা থেকে তা হ'লে নীলার ইস্কুলের মাইনেটা চুকিয়ে দিলে হয় না? ওরা রোজ রোজ বড্ড তাগিদ দিচ্ছে, বল্‌ছে—"

অনুকূলের 'দন্তরুচি' 'কৌমুদি' ছড়াইয়া বিকসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এবার তাহা আনন্দে নহে, ইস্পাত শানে ঘষিলে যে রকম শব্দটা জন্মায়, ঠিক সেই ধ্বনির অনুকরণে কহিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌ছে, শুনি?"

স্বর্ণলতার দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড 'ধ্বক্‌ধ্বক্‌' করিয়া উঠিতে পড়িতে লাগিল, কোন মতে ধরা গলা সাফ করিয়া মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কালকের মধ্যে মাহিনে না পেলে ওকে নাকি স্কুল থেকে ওরা ছাড়িয়ে দেবে।"

অনুকূল দাঁতে দাঁতে আবারও একটা বিকট ঘর্ষণশব্দ করিয়া বলিলেন, "ছাড়িয়ে দেবে? বটে! হুঁ! আচ্ছা—দেবে কেন, আমি নিজেই আমার মেয়েকে ওদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবো? শুধু তাই নয়; সকল মেয়েই যাতে ওদের ঐ হতভাগা স্কুলটাকে বয়কট করে, ছুঁচো বেটীদের দেশছাড়া করে দেয়, তার জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করবো, অমন পাজি ইস্কুলে মেয়ে দিইছি তাই কত না, আবার মাইনে দেবে, না, কচু কর্‌বে!"

পাছে নজর লাগে—এই ভয়ে টাকাগুলি সন্তর্পণে কোঁচার কাপড়ে ঢাকা দিয়া ফেলিলেন, চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিতে গিয়া কি মনে হইল, ফিরিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "আর তুই মাগীও ত বড় কম সয়তানী

নস্! যেই এই ক'টা টাকা চোখের উপর দেখ্‌তে পেয়েছ, অম্‌নি ওঁর বিবি-নাইটিঙ্গেল মেয়ের জন্যে চোখ পড়ে গ্যাছে! আরে বাপু! টাকাকটি বাঁচিয়ে যদি রাখ্‌তে পারি, মধু মিস্ত্রীকে সাড়ে তের আনা সুদে কর্জ্জ দিই, তবেই না যেন তেন করে তোমাদের বার মাসের কুঁড়ো পাথরটী যোগান দেবো। —বলে কি না, 'মেয়ের ইস্কুলের মাইনে দাও!' মেয়ের উপর যদি টাকা খরচই কর্‌বো, তা হ'লে ইস্কুলে দিলুম কি কর্ত্তে শুনি? একটী পাই পয়সা ওর ওপোর আমি বার কর্‌বনা। এটী জেনে রেখে দাও! ওকে নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে।"

টাকাগুলি রাখিয়া আসিয়া কর্ত্তা তখনও স্বর্ণলতাকে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু প্রসন্নস্বরে (বোধ করি সদ্য টাকা গোণার শব্দটা কানে ও প্রাণে বাজিয়া রহিয়াছিল বলিয়াই) বলিলেন, "ওর জন্যে ভেবো না, ও আমি ঠিক ক'রে নেবো। নীলির পড়া আমি ছাড়াবো না, পড়াতে ওকে হবে, তবে ও ছায়ের ইস্কুলে কিছু ভাল শেখায় না, প্রাইজ তো নেই বল্লেই হয়; আমি ওকে মিস্ রেক্সের মিসন ইস্কুলে কালই ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আস্‌বো। তারা মাইনে নেয় না, উল্টে শাড়ী, জামা, বই, শ্লেট, সমস্তই প্রাইজে দেয়। আবার কেমন সুন্দর বড় বড় 'ডল' দেয়, সেগুলো আধা কড়িতে দোকানে বেচে এলেও তার একটা দাম আছে। গোড়াটা তা হলে কালই রওনা হয়ে যাক্। ছেলেপিলেগুলোই হয়েছে মানুষের এক জ্বালা! তুই মাগী যদি বাঁজা হতিস্ তো চুকে যেত।"

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভুবন বাবুর পৈতৃক বাটী তাঁর নিজের পছন্দে তৈরি কলিকাতার বাড়ীর মত ঐশ্বর্য্য সমাবেশিত না হইলেও পুরাতন 'এজমালি' সম্পত্তিকে তিনি কালের হস্তে নিষ্পিষ্ট হইতে দেন নাই। এ বিষয়ে অনেক নামজাদা কৃষ্ণ-বিষ্ণুদের পৈতৃক গৃহ হইতে তাঁর পৈতৃক-গৃহকে সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে।

সেকালের ধরণের চকমিলানো সুবৃহৎ অট্টালিকার সদরদরজা পার হইয়া সুপ্রশস্ত অঙ্গন, ইহার সম্মুখ দিকে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, পুরাতন হর্ম্ম্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ আট-পলে জোড়া থাম, থামের মাথায় বিচিত্র পশুপক্ষী, খিলানসমূহে নানাবিধ লতাপাতা ও জালির কাজ। অঙ্গনের একধারে বৈঠকখানা ঘরের সারি, সম্মুখে দৌড়দার দালান, ঘরগুলিতে সেকালের প্রথা মত নীচু চৌকির উপর সতরঞ্চে জাজিমপাতা।

এ বাড়ী এখন বিয়ে-বাড়ী। ভুবন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা তরুলতার বিবাহ উপলক্ষে তাঁরা তাঁদের পল্লীভবনে আসিয়াছেন। যদিও এখনকার প্রথামত গ্রামের বাটীতে না আসিয়া তাঁর সুখৈশ্বর্য্যমণ্ডিত কলিকাতার আবাসে বিবাহ দেওয়াই সঙ্গত ছিল, তথাপি অনেক বিষয়ে আধুনিক হইলেও ভুবন বাবুর কতকগুলি সেকেলে মতামত ছিল; তার মধ্যে একটি পল্লীপ্রীতি। সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিলেও প্রতি বৎসর পূজাবকাশে তিনি সমপদস্থদিগের ন্যায় সিমলা, দার্জ্জিলিং, মধুপুর যাত্রা না করিয়া পৈতৃক ভবনে আগমন করিতেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসব

হয়, তাহাতে এযুগেও 'দিয়তাং ভুজ্যতাং'-এরও অভাব ঘটে না। সেই গ্রামপ্রীতিই কলিকাতা নিবাসী ধনী ভুবন বাবুর কন্যার বিবাহ পল্লীগ্রামে ঘটাইয়া, তাঁর ধনী ও শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবের মন ক্ষুণ্ন করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাঁরা ত এখানে আসিতে পারিবে না।

ভুবন বাবুর এত সুখৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও সংসার তাঁর শ্মশানতুল্য, গৃহ-লক্ষ্মীশূন্য নিরানন্দ গৃহস্থালী মরুভূমির মতই সুখলেশশূন্য। পূর্ণযৌবনে এত বড় আঘাত খাইয়া তাঁর জীবন স্রোতাহত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসামান্য ধৈর্য্যগুণে নিজেকে তিনি ছন্নছাড়া হইতে দেন নাই। বাহিরের প্রেয়সীকে অন্তরের মানসী প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্কট-সঙ্কুল যৌবনকাল একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত কিরণ আজই না হয় অবসানের পথে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণে এই ধনী ব্যক্তিটির এই ইচ্ছাকৃত ত্যাগের মূল কোথায় খুঁজিয়া পাইত না। বিশেষতঃ তাঁর অকাল, কাল-কবলিতা পত্নী চারুশশীকে দেখিতে খুবই সাদাসিধা ও প্রকৃতিও তাঁর সাধারণই ছিল। কলিকাতার বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের অভিভাবিকারূপে বালবিধবা ভগিনী বাস করিতেন, তাঁহারও বয়স চল্লিশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নাম তাঁর সরোজিনী, সরোজ পাঁচজনের অনুরোধে ভাইকে বিবাহ করিবার কথা একবারমাত্র বলিতে গিয়াছিল, যে উত্তর সে পাইয়াছিল, তার পর আর কেহ দাদাকে বিবাহের কথা বলিতে বলিলে সভয়ে উত্তর দিত, "বাপ্ রে! আবার!"

সরোজিনীর দাদা বলিয়াছিলেন, "আমিও তা হলে তোকে বিয়ে করতে বলবো, মনে মনে তোর এই মতলব আছে না?"

সরোজ রাগ করিয়া বলে, "তুমি কি যে বল! ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?"

দাদা বলেন, "মুখে নেই থাক্, মনে তো আছে? আমাকেই বা তুই কোন্ হিসাবে বল্লি?"

সরোজ বলে, "আমাতে আর তোমাতে?"

ভুবন বলিলেন, "কেন্, তুই আমার চাইতে বয়সে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় নাকি? তাই তোর সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না?"

সরোজ মুখ লাল করিয়া জবাব দেয়, "যাও! তাই কি বলিছি? তুমি যে বেটাছেলে!—বেটাছেলেরা ত দু'বার ছেড়ে চারবার বিয়েও করে, তুমিই বা আর একবার না কর্‌বে কেন?"

তদুত্তরে ভুবন বাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিয়াছিলেন, "কোন কোন বিধবা শুনি লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ খায়, তুইও কি খাস নাকি?" ও বাড়ীর লেডী ডাক্তার তিনবার বিয়ে করেছে, তুইও কেন একবার কর্ না?

সরোজিনী বিপন্নভাবে বলিয়া উঠে, "থাম তুমি! এই ঘাট মান্‌ছি আর যদি কখন তোমায় বিয়ে কর্‌তে বলি—"

কিন্তু তার দাদা থামিলেন না, তেমনই সহাস্য মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমি তিন ছেলে মেয়ের বাপ হ'য়ে যদি বিয়ে কর্‌তে পারি, তোর তো একটিও ছেলে মেয়ে হয়নি, তোর তো মোটেই দোষ নেই! আজকালকার মেয়ে-পুরুষের ভেদবুদ্ধিটা উঠে যাচ্ছে, তবে তুই-ই বা কেন চিরকাল একাদশী করে মর্‌বি, বলিস তো—"

সরোজিনী উঠিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে—"ঘাট মানলুম তবু হলো না!" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

সেই পর্য্যন্ত বাহির হইতে যাই হোক ঘরে তাঁহাকে উপদ্রুত হইতে হয় নাই। নির্ব্বিবাদে কন্‌ট্রাক্টরীর কাজ কর্ম্ম দেখিয়া স্বদেশী বিদেশী দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ডুবিয়া থাকিয়া ভুবন বাবুর দিন খুব দুঃখেও কাটে

নাই। ছেলে-মেয়েদের তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, বিশেষতঃ ছেলেটি যাহাতে উচ্চাদর্শ লইয়া, মানুষের মত মানুষ হয়, বলিতে গেলে ইহাই তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা ছিল এবং ইহারই জন্য তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাও করিতেছিলেন।—মেয়ে দুটির নাম তরুলতা ও বিনতা —ছেলের নাম সুশীল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার সংসারে সরোজিনী গৃহ-কর্ত্রী হইলেও দেশের সংসারের কর্ত্তৃত্ব যাঁহার উপর ন্যস্ত, তিনি ভুবন বাবুর জ্যেঠাইমা। বয়স সত্তরের উপর, মাথার চুলে কালোর আঁক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখনও আখের টিকলী চিবাইয়া খাইতে পারেন। প্রতিদিন দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে এই বৃদ্ধ-বয়সেও তাঁর আলস্য নাই। সংসারে দেবতা ব্রাহ্মণ গৃহ-পালিত পশু প্রতিপাল্যব্যক্তিবর্গ সকলের তত্ত্বাবধান তিনিই করিয়া থাকেন। ঘরের কর্ত্তৃত্ব করিয়াই তাঁর তৃপ্তি নাই, পড়সী বাড়ীর কোন্ শিশুটির পেটের প্লীহা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাহার বুকে-পিঠে 'কড়া'র জন্য রাংচিত্রার আঠার 'দাগ' দিতে হইবে, কার ঘুংড়ি জ্বরের টোট্‌কা চাই, কোন্ অল্পবয়সী দরিদ্র বিধবার জীবিকা-নির্ব্বাহ হয় না, তার জন্য তাকে দিয়া পৈতা তুলাইয়া কিনিয়া লওয়া, চরকা কাটাইয়া সেই সূতা চাকরের হাতে জোলার বাড়ী বেচিয়া দেওয়া এই সমস্ত পরের 'বেগার' খাটিয়া বেড়াইতেও তাঁর আলস্য ছিল না। খাইয়া দাইয়া নভেল পড়ো তাস-পাশা বা দিবানিদ্রায় গা ঢালিয়া সময়ের অভাব বোধ করা তাঁর সেকালে-হাড়ে সহিত না। শাশুড়ী-

বধূর মনের অমিল চলিতেছে, রায়-গৃহিণীর কানে উঠিলেই তিনি সেই বাড়ী ছোটেন, উভয় পক্ষকে মিষ্টবাক্যে কখনও সস্নেহ তিরস্কারে নানা উদাহরণ প্রদর্শনে ঠাণ্ডা করিয়া আসেন। শাশুড়ীকে বলেন "সে কি বউ মা! তোমার গোপালের বউ, তোমার কত আদরের ধন, তাকে নিয়ে যদি সুখী হ'তে না পেলে, তা হ'লে তোমার সংসারই বা কি অরণ্যই বা কি? না না বউ, এওকি একটা কথা হলো? এই বেলা সাম্‌লে নাও, দশে না শোনে। লোকে ত ওই সব গৃহ-ছিদ্রই চায়! সাম্‌নে এসে 'আহা' বলে আত্মি জানাবে, আড়ালে গিয়ে হাস্‌বে। তুমি মা! একটু সয়ে যাও—আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।" বধূর কাছে গিয়া বলেন, "ওলো নাতবৌ! 'মায়ে ঝিয়ে' ঝগড়া কেন লো? বলি, 'একটি পান কি ফোঁফ্‌ড়া—পেয়েছিলি নাকি? নে ভাই শাশুড়ীকে গড় ক'রে পায়ের ধূলো নে'। সর্ব্বরক্ষে!—শাশুড়ীর মুখের উপর চোপা করে! নিজের গর্ভধারিণী আর স্বোয়ামীর গর্ভধারিণীতে কি 'ফরক' আছে লো নেকি! দশ দিন ঘর কর্‌ না, দেখ্‌বি, সে-মাকে ছেড়ে আস্‌তে যেমন প্রাণ কাঁদে, একে ছেড়ে যেতেও তেম্‌নি হবে।"

গ্রামশুদ্ধ ছোট বড়, ইতর এবং ভদ্র সকলেই এই প্রশস্তহৃদয়া গৃহিণীর বশীভূত।

ভুবনবাবু এবার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বাড়ী আসিয়াছেন, তাহাতে আবার বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীর লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, আর 'ভুবন বাবুর জ্যেঠাইমা'র ত বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। রান্নাবাড়ীর উঠানে আটচালা বাঁধান, জোয়াল কাটান, ভিয়ানঘর সাফ করান, নিত্য-যজ্ঞের জন্য ধামা ধামা ডালের বড়ী তৈয়ারী করান ইত্যাদি শত কার্য্যে তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও চরকির মত পাক খাইয়া খাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া যাহাকে তাহাকে বলিতেছিলেন, "আজ যদি আমার বড় বউমা বেঁচে থাকৃত !"

যথাকালে কলিকাতা হইতে সকলে আসিয়া পৌঁছিলে রায়-গৃহিণী সকল কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন—"এস বাবা এস—আয় মা, সরোজ ! অমন রোগাটি হয়ে গেছিস্ কেন গো মা ? সুশীল ! ভাল আছ ত ভাই ? কি গো আমার তরুরাণি !—তরুণি ! বলি এতদিনে তোমার 'তরুণে'র সন্ধান মিললো ? খুব আহ্লাদ হচ্ছে, না ?"

তরুলতা ঠাকুরমার স্বাগতসম্ভাষে হেঁট হইয়া তাঁকে প্রণাম করিতে করিতে পায়ের উপর মৃদু রকমের চিম্‌টি কাটিয়া লজ্জায় রাঙ্গিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "যাও—তোমার আহ্লাদ হচ্ছে কি না ?"

ঠাকুরমা তার দাড়ি ধরিয়া চুমা লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার আহ্লাদ ত একশোবারই হচ্ছে লো ! তা ব'লে তুই কি আর বাদ পড়ছিস্ বোন্ ? তা' তরুর আমার তরুণটি কেমন হচ্ছে লা বিন্‌তা ?"

বিনতা গহনার বাক্সটা সেজ কাকীমা'র জিম্মায় সঁপিয়া দিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "এতক্ষণ পরে বিন্‌তাকে মনে পড়লো মেয়ের ! বল্‌বো না ত।"

ঠাকুরমা চঞ্চলা ছোট নাত্‌নীকে গায়ের উপর টানিয়া লইয়া মুখে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন, "ওলো ছুটু ! তোরই ত আদরের দিন নিকট হয়ে এলো লো ! দিদি পথ ছেড়ে দিচ্ছে ছ'মাসের মধ্যেই তোর আদর বেশী করে করা যাবে কি বলিস ? বল্ তো, বোন ! তরুর আমার বরটি কেমন হচ্ছে ?"

বিনতা হাসিমুখে হাত পাতিয়া বলিল, "কি দেবে দাও, তবে ত বল্‌বো ? শুধু শুধু বল্‌তে যাব কেন ?"

ঠাকুরমা তার ভরাগালে একটা আঙ্গুলের ঠোনা দিয়া বলিলেন, "ও মা! দুষ্ট মেয়ের রকম দেখ! ওলো! দোব—দোব, শীগ্‌গির একটি রাঙ্গা বর এনে দোব, দুটো দিন সবুর কর।"

বিনতা এদিক্ ওদিক্ কোন গুরুজন নাই দেখিয়া ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "রাঙ্গাবরটিই কিন্তু আমার চাই, দিদির মতন যেন কালো বর এনে জুটিও না, এখন থেকেই বলে রাখছি, মনে রেখ!"

ঠাকুরমা ঈষৎ বিস্মিতা হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন দিদির বর কি কালো? তোরা না দেখেছিস্?"

বিনতা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "দেখেছিই ত, তিনি যে নিজে কনে দেখে পছন্দ ক'রে বিয়ে কর্‌ছেন, কালো বউ কর্‌বেন না প্রতিজ্ঞা!"

ঠাকুরমা বলিলেন, "বড্ড কি কালো? তরুর ত অপছন্দ হয়নি? হ্যাঁ তরুদিদি। বরকে মনে ধরেছে ত?"

"যাও আমি দেখিনি!" বলিয়া লজ্জায় ঘাড় বাঁকাইয়া তরু মুখ ফিরাইল, বিনতা তার হইয়া জবাব দিল, "আহা, তোমার তরুদিদির যা পছন্দর ছিরি গো, ও পিসিমাকে বল্লে কি জানো? বল্লে, বাবার যখন পছন্দ হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই ভাল। কি মজার কথা রে! আমি তা ব'লে ওসব শুন্‌ছিনে, স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, আমার কিন্তু ওরকম গয়লার গাই নিয়ে চল্‌বে না, তা' হলে বিয়েই কর্‌বো না?"

ঠাকুরমা তরুর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ও আমার ছোটকাল থেকেই বড় ধীর, বড় বুদ্ধিমতী। তা দিদির যদি কালো বর মনে ধরে' ত তোরই বা ধর্‌বে না কেন শুনি? তুই কি দিদির চাইতে বেশী সুন্দরী?"

কিন্তু মুখরা বিনতাকে আঁটিয়া উঠিবার উপায় নাই। সে-ও তৎক্ষণাৎ এ যুক্তি খণ্ডন করিল, "সুন্দরী নই বলেই তো সুন্দর চাই গো! কেন,

দিদির বর নিজে দেখ্‌তে ভাল নয় বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সুন্দর মেয়ে না হ'লে বিয়ে কর্‌বে না। ওঁরা নিজেরা দেখতে খারাপ হ'য়ে সুন্দর বউ চান, আমরা কালো বলে বুঝি সুন্দর বরের সাধ যায় না?"

বিনতাদেরই সমবয়সী তার মেজ কাকার একটি মেয়েও কালো বরে পড়িয়াছিল; সে তৎক্ষণাৎ বিনতার কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছিস্, বিনা! আমরাই বা ছাড়বো কেন? কেন আমরা কি মানুষ নই? ওঁরা সবাই চান রূপসী কনে, তার জন্য আমাদের দেখে মুখ সিঁটকে ফিরে যান। আমরাও যদি সেই পণ ধরি, তখন কেমন মজাটি হয়? কালো বরগুলি তখন কোথা থেকে রূপসী বিয়ে ক'রে ঘরে আনেন দেখি!"

ঠাকুরমা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "মেয়েদের বুড় ক'রে রাখার এই সব ফল হচ্ছে, আর কি! এর পরে দেখছি, পছন্দ কর্‌তে কর্‌তে বিয়ে করাই হয়ে উঠ্‌বে না। আমাদের দেশের তিনভাগ লোকই কালো, তার উপর জাত জন্ম কুল শীল বাছাও আছে, তবে সমস্ত একাকার ক'রে ফেল্‌লে দু'পাঁচটা মনের মত মিল্‌তে পারে, কিন্তু একাকার করেও তো বাপু খৃষ্টান বা ব্রাহ্মমেয়েদের বিয়ের অভাব বেড়েছে বই কমতে দেখছি না। হিন্দু-সমাজে কালো, কুৎসিত কেউ কখন ছিল না আর রূপের জন্যে কেউ বর বা কনেকে ত্যাগ করেছে, তাও তো শুনিনি। বরং মহা মহা রূপসীকেও গুণের অভাবে স্বামিত্যক্তা হ'তেই দেখেছি!"

বিনতা তখন ঠাকুরমা'কে সান্ত্বনা দিয়া এই কথা বলিল, "অত বড় দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে হবে না গো! সকল কালেই তোমার 'তরুদিদির' মতন ভাল মেয়ে জন্মে এক রকম সামঞ্জস্য করে চালিয়ে নেবে। আমার মতন পাষণ্ডীরাই তো আর শুধু জন্মাবে না।"

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই গ্রামের অনতিদূরে একটী নদী, অবস্থা এখন ততটা ভাল নয়, মধ্যে মধ্যে চর দেখা দিয়াছে, নদীগর্ভ ক্রমে ক্রমে মজিয়া আসিতেছে। কোম্পানী বাহাদুরের রেলপথবিস্তৃতির গুণে এমন অবস্থাপ্রাপ্তি অনেক নদীরই ভাগ্যে ঘটিতেছে, তথাপি নদীতীরবর্ত্তী সুসমৃদ্ধ গ্রামের শোভা যে কোন সৌধ, অট্টালিকাবিমণ্ডিতা নগরীর তুলনায় শতগুণেই শ্রেষ্ঠ। শুভ্র জলধারার পরপারে শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল তরুরাজি, পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যেন চিত্রাঙ্কিতবৎ শোভা পাইতেছে। ক্বচিৎ তাহাদের বুক চিরিয়া একটি বহু প্রাচীন প্রশস্ত চাতাল ও শিবমন্দির সমন্বিত বাঁধাঘাট নামিয়া আসিয়াছে। এ পারের মেটেঘাটের উপরেই একটা প্রকাণ্ডাকার বটবৃক্ষের তলদেশ সানবাঁধান। গ্রামের সেটি ষষ্ঠীতলা। অদূরে জমীদার বাবুদের দ্বারা সদ্যঃসংস্কৃত বহুপুরাতন শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির ও ভোগ-ঘর, ইহারই এক পাশে পূজারীর থাকিবার দুইখানি খড়োচালা। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ মাসেই এখানে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে। সমস্ত বৈশাখ মাস নদীতীরে মেলা হয়, শিবের মাথায় জল ঢালিতে চারিদিকের গ্রাম ও পল্লী হইতে দলে দলে লোক আইসে। চম্পক-চামেলীর ও কচি বিল্বপত্রের ভারে শ্মশানেশ্বরের বিশাল মূর্ত্তিটিও তখন চাপা পড়িয়া যায়। এক্ষণে কেবলমাত্র দুই চারিটি শুষ্ক বিল্বপত্র ও কয়েকটি কুন্দ ও ক্ষুদ্রজাতীয় গাঁদা লিঙ্গমূর্ত্তির পিনাটের উপর পড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে শ্মশান-যাত্রীরাই শুধু এক একটা প্রণাম করিয়া যায়।

শুভেন্দু বিবাহবাড়ীতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বাড়ীর সহিত তার

-সম্বন্ধটা তখনও ঘনিষ্ঠ হয় নাই, কিন্তু সমবয়সী অথবা অধিকাংশ বয়ঃকনিষ্ঠ বালক, এমন কি দুই চারিটি বালিকাকেও দলভুক্ত করিয়া সে সারাগ্রাম গ্রামান্তর তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছিল। তার সুন্দর চেহারায় এবং নানারূপ উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে বোধ করি সম্মোহনের ক্ষমতা ছিল ; দুই দণ্ডের পরিচিত মাত্রেই দলপতির পদে প্রতিষ্ঠা দিয়া তার বশ্যতা স্বীকার করিতেছিল। ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকের তাড়না উপেক্ষা করিয়া সেই আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হওয়া রোধ করিতে পারে নাই। এদের দ্বারা নির্ব্বিরোধে শুভেন্দু অনেক অকর্ম্মের, সাহায্য পাইতেছিল, সাজা পান ও আচার চুরিতে ইহারাই তার প্রধান সহায়।

এই দলের মধ্যে ভুবন বাবুর ছেলে সুশীলকেই শুভেন্দু বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। সুশীল শুভেন্দুর চাইতে বয়সে বৎসর কতকের ছোট এবং স্কুলের পড়ায় ভাল ছেলে বলিয়া প্রশংসিত কিন্তু হইলে কি হয়, শুভেন্দুর শুভাগমনে নিজেকে তাহার নেহাৎ ছেলেমানুষ ও নিতান্তই নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হইল। কলিকাতায় সে এক প্রকার বন্দিদশায় কাল কাটায়। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠা হইতে রাত্রিতে বিছানায় প্রবেশ করা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনই তার একই নিয়মসূত্রে গ্রথিত হইয়া, একখানা রুটিনের লেখার মত চলিয়া যায়। ইহার এতটুকু নিয়ম কখন উল্টায় না। সকালে মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া, মাষ্টারের কাছে পড়িতে বসা, পাঠশেষে চাকরের হাতে তেল মাখিয়া সাবান ঘষিয়া পরিপাটী স্নান ও অত্যন্ত সাবধানতা-পূর্ণ ভাবে অর্থাৎ তেল, ঝাল, টক ও সস্তা দামের তরিতরকারী—মৎস্য—ফল বর্জ্জন করিয়া রোগীর পথ্যানুমোদিত ভাবে সাবধানী গুরুজনের দৃষ্টির তলে আহার সমাধা এবং গাড়ী চাপিয়া মাষ্টারের সঙ্গে স্কুলে গমন। বাকী দিনটার ইতিহাসও এই পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত নেহাৎ বেখাপ্পা নয়। খেলার যেটুকু অবসর সে পায়, সেও এক আনন্দ-উৎসাহবিহীন প্রাণহীন

খেলা। বাড়ীর ক্ষুদ্র 'লনে' মাষ্টার মশাই, বাবা এবং বাবার বন্ধু এক আধজনের সঙ্গেই, আর সব বিষয়েরই মত সে খেলাও সাবধানতার গণ্ডী ঘেরা। ভুবন বাবুর একটী ভাই ফুটবল খেলিতে যাইয়া আঘাত প্রাপ্ত হয় ও তাহাতেই মারা যায়, তাই ফুটবল খেলা তার পক্ষে নিষিদ্ধ। বন্ধুরা বাড়ী আসিলেও সে তাদের বাড়ী যাইতে পায় না। তাই বন্ধুত্বও গাঢ় হইতে পায় না।

কলিকাতাবাসী সুশীল অন্যবার বাড়ী আসিয়াও তোলাজলে স্নান করে কিন্তু এবার শুভেন্দু আসায় তার রুটিনবদ্ধ জীবনের সমস্তটাই প্রায় ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। একে সমারোহের বিবাহ বাড়ী সকলেই কর্ম্মকাজে ব্যতিব্যস্ত, তার উপর সুশীলের দিদি যে তার প্রধান তত্বাবধারিকা সেই আজ বিয়ের কনে, নানা অনুষ্ঠানক্রিয়া কর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, এই অবসরে শুভেন্দুর তত্বাবধানে অনভ্যস্ত সুশীল ক্রমেই বাড়ীর পুষ্করিণী এবং ক্রমশঃ তার টিটকারী ও সর্দ্দারীতে নদীস্নানে ও বাড়ীর এবং বাহির হইতে নিমন্ত্রিত বালকদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া নিজের অকর্ম্মণ্য আদুরে গোপাল ইত্যাদি বিদ্রূপ বিশেষণ-ইতে মুক্ত হইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

সাঁতার দিতে শুভেন্দুর জুড়ি কমই। কোন্ বিদ্যাটারই বা তার অভাব! সুশীলের খুড়তুতো ভাই সলিলকুমারের সহিত "বাজী" লাগাইয়া সে মাঝনদী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিল, সুশীল ভরসা করিয়া জলে নামে নাই অমনি শুভেন্দুর মতলব ফাঁসিয়া গেল, হার স্বীকার করিয়া সে ফিরিল। চারিদিকের হুর্‌রে ধ্বনির মধ্যে দৃকপাত-শূন্যভাবে সুশীলের কাছে আসিলে ম্রিয়মাণ সুশীল বলিল, "তুমি ত অনেক এগিয়েছিলে, হার স্বীকার ক'রে নিলে কেন? ও কক্ষণো অতদূর যেতে পার্‌তো না,

শুভেন্দু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জবাব দিল, "তুমি জলে না নেমে সংএর মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তুমি ছেলেটা 'গুড-ফর-নথিং'।"

এই ইংরাজী গালিটুকু সে নিজের সম্বন্ধে স্কুলজীবনে শুনিয়াছিল, অবশ্য বিশ্বাস করে নাই, আজ এক হাত হইল।

সুশীলের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, সে স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, বাড়ীতে তো কথাই নাই, এমন ভাষা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে সে শুনে নাই, মনে মনে রাগিয়া মুখখানা হাঁড়ি করিয়া জলে নামিল এবং গভীর জলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া গেল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ঘাটশুদ্ধ ছেলের দল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, অনেকেই সুশীল ডুব দিল কি ডুবিল, স্থির করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাহবা, সুশীল!"

প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে শুভেন্দুর বিলম্ব ঘটে নাই, সেও তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া জলে পড়িয়াছিল এবং খানিক পরে অনেকখানি জল খাইয়া অর্দ্ধ-অবসন্ন সুশীলের শিথিল দেহ সাপটাইয়া ধরিয়া কোনমতে তাহাকে উদ্ধার করিল। ভয়াকুল সঙ্গীর দল ভরসা পাইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল, "বাড়ীতে খবর দেওয়া দরকার।" কেহ বা প্রস্তাব করিল, "একখানা ডুলি আনাতে হবে।" সলিল শুষ্ক মুখে কহিল, "কিন্তু জ্যেঠামশায় কি ভয়ানক যে চটে যাবেন!"

দুই এক জন বালক বার্ত্তাবহের কার্য্যে উদ্যত হইতেই শুভেন্দু বলিল, "খবরদার! একটি কথাও যেন কারু মুখ থেকে বার হ'তে না পায়—সুশীল!—এই সুশীল! তোর কি ডুলি চ'ড়ে বাড়ী যাবার সাধ হচ্ছে না কি'রে? দিদির বরের মতন?"

ইতিমধ্যে সুশীল সামলাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এক পেট জল খাইয়া

তার শরীরের মধ্যে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করিতেছে, ডুলি চড়িয়া বাড়ী যাইতে তার যে বিশেষ আপত্তি তা নয়; কিন্তু এই অবমাননাজনক পরিহাসে সবেগে মাথা নাড়িয়া দিল, "না, হেঁটেই যাবো।"

শুভেন্দু বলিল, "তা হ'লে তোমরা বাড়ী ফের, আমি একটু পরে ওকে নিয়ে যাচ্ছি। এই নিত্য! একটা কাজ কর্‌ দেখি, ওই মন্দির-বাড়ীর পুকুরের কাছ থেকে এতটা নুণ নিয়ে আয়, সেইটে জলে গুলে খাইয়ে দিলে বমি হবে। তা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

নিত্য আদেশপালনে ছুটিল, সলিলের ভাই অনিল বলিয়া উঠিল, "শুভেন্দুর যে ডাক্তারীও পড়া আছে দেখ্‌ছি!"

গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া শুভেন্দু সেই ফুলান বুকে তাল ঠুকিয়া কহিল, "থাক্‌বে না! আমি যে 'লাষ্টো ক্লোশের আউট' হওয়া ছেলে, তার খবর রাখো? কোন্‌ বিদ্যেটাই বা আমার কম?"

এই গর্ব্বোক্তির মধ্যে অর্থ কিছু না-ই থাকুক, কথাটা শুনিয়া সকলেই খুব একচোট হাসিল এবং নুণ খাইয়া সুশীলের পেটের জল বাহির হইয়া গেল, সুশীলকে কতকটা সুস্থ দেখিয়া শুভেন্দুর পরামর্শে সকলে বাড়ী ফিরিল। সুশীলের জলমগ্ন হওয়ার খবরটা বেমালুমভাবে চাপিয়া যাওয়া হইবে বলিয়াই স্থির হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন তরুর গায়ে হলুদ, খুব জমকাল তত্ত্ব আসিয়াছে, ছেলেমেয়ের দল ভিড় করিয়া সেই সব দেখিতেছে ও বিস্ময় প্রশংসায় শতমুখ হইতেছে।

সুশীলের অথচ এ সব বিষয়ে মন লাগিতেছিল না, মাতৃহীন সুশীল পিতার বড় আদরের, ভুবন বাবুর বিশ্বাস, ছেলেমেয়েরা শাসনে বিগড়াইয়া যায়, তাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন, তবে বিশেষরূপেই লক্ষ্য রাখিতেন তাদের নৈতিক চরিত্রের দিকে। মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যাচরণ করা যাতে না ঘটিতে পারে সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁর সেই

প্রচেষ্টা ছিল, বিশ্বাস ইহাতেই শিশু চিরনিরাপদ্ হইতে পারে। এই শিক্ষাই একমাত্র পুত্রকে আশৈশব দিতে চেষ্টা করিতেছেন, সুশীলও এই অনুসারে পিতার সহিত কখনও কোন বিষয়ে লুকাচুরি করিতে শেখে নাই, এ পর্য্যন্ত তার প্রয়োজনও কখনও ঘটে নাই। জীবন তার এমনই ঘড়ীর কাঁটার মত নিয়ম-তান্ত্রিকতায় গঠিত যে, তাহা হইতে এতটুকুও এদিক্ ওদিক্ সরিবার প্রয়োজন হয় না। আজ জীবনে এই প্রথম শুভেন্দুর পরামর্শের কুহকে সুশীল পিতার নিকট কথা গোপন করিল এবং তাহাই তার বিবেককে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল।

শুভেন্দুর মতে ইহাকে মিথ্যা বলা সুশীলের ভীরু স্বভাবের দুর্ব্বল কল্পনা, সুশীলের পিতা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তিনি তাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতেছেন না তবে ইহা মিথ্যাচরণ কিসে হইল?—কিসে কি হয় শুভেন্দুর সে কথা বুঝিতে পারা অবশ্য সম্ভব নয়, সুশীলের সমস্ত সত্ত্বা এই গোপনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকিলেও শুভেন্দুর সবল ব্যক্তিত্বের কাছে তার মানসিক দৌর্ব্বল্য তাকে বাধা দিল, মনে না মানিলেও উপহাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে বাহিরে আজ সে মৌন রহিয়া সর্ব্ব প্রথম আত্মপ্রতারণার সূত্রপাত করিল, কিন্তু চিরদিনের শিক্ষাকে সহজে এড়াইয়া যাওয়া যায় না তাই মন তার এমন সুখের দিনেও একান্ত তিক্ত ও সুখহীন হইয়া রহিল। এ অস্বাস্থ্যকর অনুভূতিও সুশীলের জীবনে এই প্রথম।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথাকালে উরুর বিবাহ সাড়ম্বরে সমাধা হইয়া গেল, কিন্তু রোসনাই-এর আলো দিয়াও বরের কালো রূপ ঢাকা পড়িল না। বর দেখিয়া ঘরে, পরে অনেকেই মুখ বাঁকাইলেন, কেহ কেহ বাঁকাচোখে মন্তব্য করিলেন—"মেয়ে সেয়ানা আছে লো! জানে মনে, বড়লোক বিয়ে করলে হীরের পাশবালিসও পায়ে দিয়ে শুতে পারে—নাই বা রইলো বরের অঙ্গে রূপ, রূপোর ত আর অভাব নেই!"

শুনিয়া একজন স্বামি-সোহাগিনী রূপসী ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব করিলেন, "যা' বলিস্ আর যাই কোস্ বোন্! আমি বাবু হ'ক কথা বল্‌বো! রূপো যতই সিন্দুকে ঠাসা থাক, কি মেয়ে কি পুরুষ অঙ্গে যদি একটু রূপই না রইল ত সকলি 'বেরথা'! ওই যে কুল-আঁটির মতন মুক্তর মালা গলায় দুল্‌ছে, ও যদি বট্‌ঠাকুরের ছেলে সুশীল—কি ওঁর বন্ধুর ছেলে শুভেন্দুর গলায় ওঠে ত দেখতিস ওর জেল্লা? এঁর গলায় যেন সেই 'কার' গলায় মতির মালা!"

মহিলাকুল অনেকেই এই অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন উপমাটি স্মরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে উপহাসের হাসি হাসিয়া উঠিলেন এবং সে হাসি থামিতে যথেষ্ট সময় লাগিল। এমন সময় কর্ম্মব্যস্ত বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা সেইখান দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে আনন্দ-স্মিতমুখে বলিয়া গেলেন, "ওলো, তোরা আমার ভুবনের জামাই দেখ্‌লি? তা' বেটাছেলে, শ্যামবর্ণ রং বটে, মুখছিরি-টুকুন্ দিব্যি!

জ্যেঠাইমা'র মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই নাক সিঁটকাইলেন। তাঁর পিছন ফিরিতে যেটুকু দেরি, তার পর তাঁদের তীব্রভাষায় ঝাঁজে ভুবন বাবুর নব জামাতার 'মুখছিরিটুকু'র সমস্ত শ্রীই ঝলসিয়া গেল। ভুবন বাবুর ভ্রাতৃবধূ বলিলেন, "ও বলতে হয়, তাই বলা, যখন ঘরের জামাই হচ্ছেন, তখন ওকথা না ব'লে আর কি বলা যাবে? তবে সত্যি কথা বলতে হলে বাবু বলতে হয় যে, মুখে 'ছিরি'টিরি কোন ঝঙ্কাটই তো দেখতে পেলাম না!"

আর এক জা বলিলেন, "সে কি লো, সেজদি! দেখতে পেলিনি কি বল? অমন খাঁদা নাক, অমন কোটরে ঢাকা চক্ষু আর অমন 'টঁ্যাক-তোলা গড়ের মাঠের মতন' প্রকাণ্ড কপাল, মুখে আর নেই কি?"

আর এক জন বলিলেন, "ওলো, ব্যাখ্যানা করছিস্ কি? বড় কপাল যে ভাগ্যবন্ত পুরুষের লক্ষণ, দেখছিস্ না, তাই অমন কপালে-পুরুষ, পাঁচটা না ছ'টা পাশ দিয়েছে, আবার বড় চাকরীও পেয়েছে এই বয়েসে।"

"তার উপর অমন রূপেগুণে বৌ।"

মেয়ের খুড়ী একটুখানি টেপা হাসি হাসিয়া মন্তব্য করিলেন, "তা হোক, ভাই, সে ত অনেকেরই হয়—তা ব'লে মুখের অর্দ্ধেকখানি কপাল কিন্তু ভগবান্ সব্বার জন্যে তৈরি করেন না!"

বাসরঘরে সুরসিকা ঠান্‌দি বরের পাশে বসিয়া সুর করিয়া গানের ছন্দে সখেদে গাহিলেন—"হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!"

বর যতীন্দ্রকে দেখিতে সত্যসত্যই ভাল নহে, তা সংসারশুদ্ধ সকলকেই যে সুরূপ হইতে হইবে, এমনও ত কোন কথা নাই, কেহ রূপে মন্দ, কেহ গুণে মন্দ, আবার কেহ কেহ রূপেগুণে সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কোথাও ঠিক উল্টাও ঘটে। যতীন্দ্রনাথের রূপ

দেখিয়া তাকে বিচার করিতে বসিলে আরম্ভেই ফেল করিতে হয়, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, বিদ্যা এবং বিনয়বাধ্যতা এ সকল গুণ নাকি কখন চামড়ার উপর নির্ভর করে না, সেই হেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট বড় ডিগ্রিধারী সুচরিত্র ছেলেটি এক দিকে কঠোর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উচ্চপদ এবং সুবিজ্ঞ ভুবনমোহনের নিকট সাধারণ-দুর্ল্লভ কন্যারত্ন লাভ করিয়া বসিল।* ভাগ্যবিধাতা তার ভিতর বাহির ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিতে কোথাও কার্পণ্য দেখাইলেন না। কনে দেখা এবং বিশেষতঃ শুভদৃষ্টির সময় তরুণী তরুর সলজ্জ স্মিতমুখখানি পলকের মধ্যে দেখিয়া যতীন্দ্রের তরুণ চিত্ত আশার পুলকে নাচিয়া উঠিয়াছিল, তরুর মুখে অসন্তোষের ছায়াটীও নাই! কুরূপ যতীন্দ্রের প্রতি তার মনে বিরুদ্ধভাবের উদয় হইলে অমন মন্দমধুর হাসির ছটায় ঐ প্রবাল-রক্ত ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত হইতে পারিত কি? মনের মধ্যে সেই সস্মিত সলজ্জ দৃষ্টিটুকুও জ্বলজ্বল করিতেছিল, তাই ঠান্‌দির অনুযোগের উত্তরে সহাস্যমুখে জবাব দিতে পারিল—

"যে বিধি করেছে চাঁদে রাহুর আহার,
কমলে কণ্টক হায় বিধান তাহার।"

# নবম পরিচ্ছেদ

আম কাঁঠাল নারিকেল ইত্যাদি বাছা বাছা ফলের গাছে ভরা এই বাগানখানা বিপ্রদাস চৌধুরীর।

ঐ বাগানের উপর ছেলের দল চিরদিনই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু ভয়ে কেহ সে জমিতে পা দেয় না। শুভেন্দুর কাছে সেই কথাটা ফাঁস হইতেই সে, টিট্‌কারী দিয়া উঠিল, "আরে ছ্যাঃ! আমি হ'লে এদ্দিনে হুঁ!"

সলিল মাথা দুলাইয়া বলিল, "মুখে বলা খুব সহজ—এ বড় বিষম ঠাঁই —একটা আনারস উপড়ে যেদো তাঁতি জেল খেটে মরেছিল। চারটে কাঁচা আম পেড়ে হরে ধাড়ার ছেলে নেপা মেপে সাত হাত নাক খত্ দিয়ে কোনরকমে ছাড়ান পায়, যাও না একবার পেয়ারা পাড়তে, দেখি।"

শুভেন্দু জানিত, সুশীলের মনকে জাগাইয়া তুলিতে এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নাই! হইলও তাহাই। শুনিয়া সুশীল সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কি কাজ শুনি?"

শুভেন্দু যেন কতই অনিচ্ছুকভাবে থামিয়া থামিয়া জবাব দিল, "সে তোমার শুনে কি হবে? তুমি তো তুমি, তোমাদের মধ্যে কেউই সে কাজে হাত দিতে ভরসাই করবে না। সলিলদের বিশ্বাস, তা' করা নাকি অসম্ভব—আমি তাদের দেখিয়ে দিতে চাই যে, যা তোমাদের সবার পক্ষে অসম্ভব, তা' একা আমার পক্ষে অতি সহজ।" সুশীল তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, ঔৎসুক্য ভরে বলিয়া উঠিল—"আমিও যাব।"

শুভেন্দু কহিল, "তুমি ?"

সুশীল গম্ভীর ও দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, "হুঁ"—এবং লম্বা পা ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল, তখন শুভেন্দু হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া তাকে ধরিয়া বলিল, "আরে সোজাই চল্লে যে, আমাদের পথটা যে একেবারেই বাঁকা।"

ফলের বাগান এখন প্রায় ফলশূন্য, তাই বাগানের রক্ষণব্যবস্থা কিছু শিথিল, কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে ঘাট বাঁধান পুষ্করিণী—উহাতে অনেক মাছ, পাছে সেই মাছ ধরিয়া লয়, সে জন্য যে বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত আছে, শুভেন্দু সে খবরটা পায় নাই, জনশূন্যবোধে দুজনে কুল পেয়ারা খাইয়া সঙ্গীদের দেখাইবার জন্য অপর্য্যাপ্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন গাছ হইতে নামিয়াছে অমনি সেই প্রায়ান্ধকারে কাহার বজ্রমুষ্টি পিঠের উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন হইতে দড়ি দিয়া দুখানা হাতই বাঁধিল। সুশীলের অবস্থাও তার চেয়ে ভাল ছিল না।

ঘাটের রাণায় মাচা বাঁধিয়া বিপ্রদাস বাবু একটা বড় কালবোস মাছকে গাঁথিয়া ফেলিবার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, মনটা বেজার হইয়া গিয়াছে, ফাৎনায় টান পড়িল, ভারি ঠেকিল, তুলিয়া দেখেন, মস্ত একটা কোলা ব্যাং—আবার একটা কাঁকড়া আসিয়া সুতা কাটিয়া চার খাইয়া গেল।

এমন সময় বাগানের মালী ও দরওয়ান দুই কিশোর চোরকে বাঁধিয়া লইয়া উপস্থিত হইল, সেলাম বাজাইয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! এই দোনো চোট্টা মিল কর, কলমবালা আমরুত তোড়তাড় লিয়া, অউর পাটনাবালা বইরভি বহুত চোরায়কে লে'যাতা থা।"

জলের মধ্যে বড় মাছের পাখনা-নাড়ার মৃদু কম্পন অনুভব করিয়া

সেদিক হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই ধর্ম্মাবতার বিচার শেষ করিলেন, "থানা মে লে'যাও।"

রায় শুনিয়া শুভেন্দু সকোপে দাঁত দিয়া নিজের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু সুশীল কোনমতেই আর সামলাইতে পারিল না, তার মুখ সাদা হইয়া গেল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং কণ্ঠ ভেদ করিয়া আর্ত্তরবধ্বনিত হইয়া পড়িল। শব্দটা বিপ্রদাসের কানে গেলেও তাঁর প্রাণে গেল না, যথা-পূর্ব্ব হুইলের চাকার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। কর্কশ-কণ্ঠে বাজপেয়ী হাঁকার দিয়া উঠিল, "আরে চলবে চল"—বলার সঙ্গে ছেলে দুইটির হাতে বাঁধা দড়ীতে হেঁচকা টানও সে দিল, ভদ্রলোকের ছেলে বুঝিয়াও ছাড়ান দিল না। সুশীল নড়িল না। প্রাণপণ শক্তিতে মাটি চাপিয়া দাঁড়াইল, শুভেন্দুর অবস্থা দেখিবার অবসর তার ছিল না, নিজের কথাই এখন সমস্ত পৃথিবীর আকারের চাইতেও বড় হইয়া উঠিয়াছে। "বাবা জানলে কি করবেন?—বাবা জানলে কি হবে!" এর চেয়ে বড় কোন কথা তার ছিল না।

শুভেন্দু মৃদুস্বরে দরওয়ানজীর অনেক স্তবস্তুতিই করিতেছিল, কিন্তু সে সমস্ত ভস্মে ঘৃতার্পণের ন্যায় একান্ত ব্যর্থ করিয়া চৌরোদ্ধরণিকের দল পরমোৎসাহে লব্ধ শীকার লইয়া 'কুইক মার্চ্চ' করিয়া চলিয়াছে, এমন সময় সেই প্রায়ান্ধকার বন বীথির মধ্য হইতে ক্ষুদ্র দীপ শিখার ন্যায় ক্ষুদ্রাবয়ব বালিকা ত্রস্তপদে বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "বাজপেয়ীজি! হামকো একটো পাখী ধরতো দিজিয়ে, এ কাঁহা চল্‌তা হ্যায়, জেরা শুনিয়ে তো খাড়া হোকে।"

বাজপেয়ী ঈষৎ বিপন্নভাবে খাড়া হইয়া বলিল, "দেখিয়েনা খোকিজী! দোঠো চোট্টা আপকা কলমকা পেড়সে বহের চোরাতে রহা,

ময় মহারাজকা হুকুম তামিল করনে থানে পর দুষমন্ লোগকো লে'চলতে থেঁ, আভি কেইসে পাখী ধরুঙ্গা ?"

'খোঁকী' দ্রুতপদে উহাদের সম্মুখে আসিয়াই বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। সন্দিগ্ধ মৃদুস্বরে বাজপেয়ীকে বলিল, "ঝুটা বাত নেহি কহ্না ! ই তো বাবু লোক হ্যায়—চোট্টা কাঁহা ?"

বাজপেয়ী হস্তবদ্ধ আনতবদন ছেলে দুইটির প্রতি টিটকারী দিয়া রসিকতা করিল, "আরে খোঁকিজি ! আপতো লেড়কী-আদমি থি আপকা মালুম নেহি হ্যায়, আজকাল বাবু লোক সব চোট্টা ঔর ডাকু বনে গ্যয়ে। চল্ বাবু ! থানেপর চল্—এইসা বহোত বাবুলোক আজকাল থানেপর যাতে উতে থেঁ।"

মেয়েটি সহসা বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া তীব্র গম্ভীর আদেশের স্বরে উচ্চারণ করিল, "হিঁয়া খাড়া রহনা, মায় পিতাজীকো পাশ চল্‌তেহেঁ।"

এই বলিয়া যেমন অকস্মাৎ কানন ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল, তেমনই করিয়াই আবার নিমেষ-মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। অপরাধীদ্বয় যদি নিজ নিজ দুঃখভারে অবসন্ন হইয়া না পড়িত, অথবা বয়স আর একটু বেশী হইত কাননবিহারিণী কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ হওয়াও বিচিত্র ছিল না।

*　　*　　*　　*　　*

"বাজপেয়ি !"

"খোদাবন্দ।"

"চোর লোগকো দো দো বেত লাগাকর্ ছোড় দেনা।"

"জো হুকুম মহারাজ !"

হুকুম শুনিয়া শুভেন্দুর চোখ জ্বলিয়া উঠিলেও সুশীলের অবসন্নতায় প্রায়-বিচেতনদেহে জীবনীশক্তি পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। দুই বেত! দুই বেত কেন, থানায় যাওয়ার পরিবর্ত্তে সে যে সহস্রবারও বেত্রাহত হইতে প্রস্তুত আছে।

থানায় গেলে পিতা জানিতে পারিবেন, আর জানিলে? সুশীল ভাবিতে পারে না তার পর কি হইবে! সুশীলকে তিনি হয়ত কিছুই বলিবেন না—কিন্তু তাঁর বুক যে ছিঁড়িয়া পড়িবে সে কথা সুশীল ছেলে-মানুষ হইলেও খুব ভাল করিয়াই জানে। সে যথাসম্ভব দৃঢ় চিত্তে দণ্ড লইতে প্রস্তুত হইল।

"বাজপেয়েজি! বহোতি আস্তেসে বেত লাগানা, ভাইয়া! ম্যয় আপকো একঠো রুপেয়া দেঙ্গে।"

অত্যন্ত মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ এই করুণাপ্লাবিত শব্দকয়টি অপরাধিদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। সুশীল ইহাতে বারেক সকৃতজ্ঞনেত্রে সেই ক্ষুদ্র করুণাময়ীর করুণা-কাতর স্নিগ্ধমুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল।

"বাপ্‌রে বাপ!" বেত্রাহত সুশীল লাফাইয়া উঠিল। দ্বিতীয়বার বেত উঠাইতেই কাতরস্বরে আর্ত্তধ্বনি করিয়া পতনোন্মুখ হইতেছিল, সম্মুখবর্ত্তিনী মেয়েটি তাকে দুই হাত বাড়াইয়া আগুলিয়া ধরিল, জলভরাচোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "খবরদার্!"

বাজপেয়ীর হাতের বেত যেমন ছিল, রহিল।

শুভেন্দুকে অটল দাঁড়াইয়া বেত খাইতে দেখিয়া, বিশেষ এই অপরি-চিতার পূর্ব্বপ্রলোভনবাক্য স্মরণ করিয়া সুশীল মনে করিয়াছিল, বেত খাওয়া জিনিষটা সন্দেশ খাওয়ার চেয়ে খুব বেশী তফাৎ নয়; কিন্তু নিজের পিঠে উহারই একটি ঘা পড়িতেই সমস্ত ধারণাটাই উল্টাইয়া

গেল! উঃ, বাজপেয়ীর হাতের আস্তে মারা বেতেরই এই জ্বালা—না জানি, পূরাদমে কতখানি বেদম হইতে হইত।—যে সুশীল কখনও একটা চড় খায় নাই, তার পক্ষে এ যে অসহ্য।

"বাজপেয়ি! জলদি পানি লাও, দোঠো বয়েরকে ওয়াস্তে তোম ভালা আদমীকো জান্ লে' লেঙ্গে?"

বাজপেয়ীর এই ক্ষুদ্র মনিব-কন্যাটির এ প্রকার প্রভুত্ব সহ্য করা অভ্যাস আছে, ইহাকে নানা কারণে অসন্তুষ্ট করিতেও ইচ্ছুক নয়, সেইজন্য শুভেন্দু ও সুশীলকে একটু হাতে রাখিয়াই বেত লাগাইয়াছিল, ইহাতেও যদি ননীর পুতুল চোরকে মূর্চ্ছা যাইতে হয়, তা হইলে সে আর কি করিবে? ঘুযের টাকাটা নষ্ট হইল দেখিয়া উহাদের পরে ক্রুদ্ধ হইল, আপশোষ হইতে লাগিল বেত দিয়া উহাদের পিঠের চামড়ার খানিকটা উঠাইয়া আনিতে পারিলে তবু হাতের সুখটাও হইত। আর বাবু-চোরদেরও তার কথা চিরকাল স্মরণ থাকিত। বিরক্তস্বরে প্রতিবাদ করিল, "ভালা-আদমী কভি চৌরী কর্‌নে নেহি আতেহেঁ দিদি সাব!—ডাকুলোগ মর্ নেহি গ্যঁয়ে, উঠকে খাড়া হো গিয়া দেখিয়ে!—ব্যস্! দোনোকো বাহার নিকালকর দোসরী কাম্‌পর চল্‌তে থেঁ।"

মেয়েটি কিছু না বলিয়া তার অভ্যস্ত চঞ্চল ত্রস্তপদে আর একদিকে চলিয়া গেল, এবং ফটকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া শুভেন্দু ও সুশীল দেখিল, এক ঘটী জল লইয়া সে ছুটিয়া আসিতেছে।

"খাবার জিনিষ কিচ্ছু নেই—শুধু একটু জল এনেছি, নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পেয়েছে!"

শুভেন্দু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু সুশীল বারেক নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতায় তার করুণাবিগলিত মুখের পানে চাহিয়া প্রায় পূরা ঘটীর জলটাই পান করিয়া ফেলিল।

# দশম পরিচ্ছেদ

অনুকূলচন্দ্রের যে কথা সেই কাজ। পরের দিন এলবার্ট বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই সেণ্টপিটার্স-মিশন স্কুলের বলদ-যোজিত সাম্পান আসিয়া নীলিমাকে লইয়া গেল। এদিকে এলবার্ট স্কুলের গাড়ী আনিয়া স্কুলের দাই যখন অভ্যাসমত ডাকাডাকি করিতেছিল, "নীলি-বউয়া! হো—নীলি-বউয়া! আইয়ে জল্‌দী আইয়ে!"

তখন নীলিমার পিতা আসিয়া হরিদ্র-প্রভ দন্তপংক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন অশিষ্ট জীব-বিশেষের ন্যায় উহাকে দংশনোদ্যত ভাবে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"এই কুত্তাকো মাফিক্ কাহে চিল্লাচিল্লি করতেহো, নিকালো, নিকালো ;—নিকাল যাও।"

প্রত্যক্ষ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দাই-বেচারী তটস্থ হইয়া পড়িল, মাথার কাপড়টা একটু সংযত করিয়া লইয়া স্বর নামাইয়া বলিল, "বউয়াকো বোলাতে হেঁ, বাবুজি! জেরা মেহেরবাণী কর্‌কর্ বোলা দিজিয়ে বাবু!—দের' হোগিয়া।"

অনুকূল খিঁচান মুখকে অধিকতর খিঁচাইয়া পঞ্চমের স্বরকে সপ্তমে চড়াইয়া কহিয়া উঠিলেন, 'বউয়াকো বোলা দিজিয়ে!' নেই নেই, বউয়া ওর কব্‌হি হুঁয়া পড়তে নেহি যায়েগি। তোম্‌হরা বিবি-সাহেব লোগকো বোল দেনা কি ঐসা খারাব ইস্কুলমে খারাব জানানা লোগকা পাশ হামারা লেড়কীকো হাম নেহি ভেজেঙ্গি। হুঁয়া পড়ান ঠিক নেহি হোতা হ্যায়, গুরুমা লোগকো দেখ্‌কর্ বহোত বেচালভি শিখ গইয়ে, হুন্ লোগকো নকরী ছোড়ানেকে ওয়াস্তে হাম গবর্ণমিণ্টমে দরখাস

ভি দেতে হেঁ। যব দোস্‌রা মাইজী লোক আবেঙ্গে, তব ফিন্ হামারা লেড়কী হুঁয়া পড়নে যাবেঙ্গী—”

শকটারোহিণী বালিকাবৃন্দ উৎসুক-আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উৎকর্ণা হইয়া এই সকল বাক্য-সুধা পান করিতে করিতে পরস্পরের মুখ চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে অকস্মাৎ চলার ঝাঁকানী বাঁচাইয়া যে যাহার নিজস্থানে আসন লইয়া বসিল। সর্ব্বপ্রথম মনোরমা তার দু'কাঠির বোনা হাতে লইয়া সুষমার দিকে চাহিয়া হাসিল, “বুঝলি সুষি! নীলির বাবার নামে সেই যে চিঠি সুলোচনাদি' পাঠিয়েছিলেন না?—তার জন্যেই নীলি বেচারীর আপার প্রাইমারীটা দেওয়া ঘটলো না।—সে হয় ত এবার পাশ করে স্কলারশিপটাও পেতে পারতো।”

সুষমার পূর্ব্বেই প্রতিমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “আর সুলোচনাদি' মনোরমাদি'দের চাকরী শুদ্ধ না খায়! বল্লেন যে, ‘গবর্ণমিণ্টমে দরখাস দেতেহেঁ—দেখ বেচারারা বুঝি বিপদে পড়লেনই বা!”

মনোরমা ঠোঁট বাঁকাইয়া অবজ্ঞাসূচকস্বরে উত্তর করিল, “হুঃ, নীলির বাবা তো ভা—রী একজন মাতব্বর লোক কি না, তাই উন্নি ‘দরখাস’ দিয়ে সুলোচনাদি'দের চাকরী ছাড়াবেন, আহ্লাদ পড়ে গেছে আর কি! বড়জোর একদিন ইন্‌স্পেকট্রেস এসে ওঁদের একটা কৈফিয়ৎ না হয় তলবই করবেন।”

প্রতিমা মন্তব্য করিল, “তবু তো সে একটা অপমান! আর সুলোচনাদি' ভাই যে রকম তেজালো মানুষ—”

মনো ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—“কিসের অপমান! তা হ'লেই ত আসল কথাটাও ফাঁস হবে, যিনি ‘দরখাস’ দিচ্ছেন, তাঁর কাছে যে স্কুলের এতটী টাকা পাওনা—অপমানটা হবে কার? সুলোচনাদি' কাঁচা মেয়ে নন, সব চিঠিরই তিনি নকল রাখেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের

প্রাণ যায়, তাঁর ত নয়, লোকসান হলো নীলি-বেচারারই !—আর একটা মাসও ছিল না—মোটে এই চব্বিশটা না পচিশটা দিন বাদ—পরীক্ষাটা দিলে ও নিশ্চয়ই স্কলারশিপ পেয়ে যেত।"

অন্বকা কহিল, "তখন ত ও নিজেই ভাই, ওর মাইনের টাকা দিয়ে দিতে পারতো। আহা! সুলোচনাদি' এত তাড়াতাড়ি না ক'রে যদি একটু দেরী করতেন, তা হ'লে হয় ত ওর পরীক্ষাটা দেওয়া হ'ত।"

সাবিত্রী এতক্ষণের পর 'ট্যাঁক্' করিয়া উঠিল—"সুলোচনাদি' ত আর 'জান' নন, কেমন ক'রে জানবেন বল যে, পাওনা টাকা দিতে বল্লেই নীলির বাবা মেয়ে আটকাবে—এমন ছোটলোক ত এর আগে দেখেন নি তিনি।"

সাবিত্রীর মুখের ভয়ে সব মেয়েই মনে মনে উহাকে সমীহ করিত, শুধু করিত না মনোরমা, সে তখনই উহার মন্তব্যের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গেই টিপ্পনী কাটিল—"এমন ছোটলোক যে আর কক্ষণোই দেখেননি, তাও অবশ্য হলফ করে বলতে পারিনে, তবে নীলির বাবার তবু একটা আক্কেলও আছে যে, মাইনে যখন দেবেই না, তখন মেয়েও পড়াবে না ; কিন্তু কারু কারু আবার দেখি সেটুকুনও নেই !"

সুষমা অমনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ভাই, নীলির বাবা সুলোচনাদি'দের সম্বন্ধে কি রকম অপমানের কথাগুলো সব বলেছেন বলতো !—আমার তখন কিন্তু এমন ভয়ানক রাগ ধরছিল, আমি ওদের কিন্তু সব ব'লে দেব।"

প্রতিমা বলিল, "আমিও।"

সাবিত্রী কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া মনোরমার দিকে ভ্রূকুটি কুটিল মুখ তুলিল, সরোষে কহিল. "খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে লাগতে

আসবি না? কেন, আমি তোর খাই না পরি যে, যখন তখন তুই আমাকেই চিপটেন কাটতে আসিস্?”

গাড়ী আসিয়া বিদ্যালয়ের উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আজিকার এই সকল অভিনব কাহিনী সর্ব্বপ্রথম স্থলোচনাদি’র কর্ণগোচর করণার্থ আগে নামিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, কিন্তু তার ঠেলাঠেলিতে একটী সিক্সথ্ ক্লাসের ছোট্ট মেয়ে গাড়ীর পা-দান হইতে কাঁকর বিছান পথের উপর সজোরে পড়িয়া নাকমুখ ছেঁচিয়া কান্না জুড়িয়া দেওয়াতে স্থসমাচার প্রচারিকাদের প্রথম উৎসাহের মুখে তখনকার মত পাথর চাপা পড়িল।

স্কুলের প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল; সকল মেয়েই নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করিয়াছে, কেবল দুঃসাহসিকা মনোরমা স্থলোচনাদি’র সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্কুলের দাই এত্‌বারিয়ার সাক্ষ্যর মধ্যে কোথায় কি ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে, তারই হিসাব রাখিতেছিল, এত্‌বারিয়ার খানিকটা বলা হইয়া গেলে সে হঠাৎ ফোঁস করিয়া উঠিল—“হ্যাঁ, হাঁই, ‘গবর্ণমিণ্টমে দরখাস দেতেহেঁ’—ওই কথাটা বড় যে বাদ দিয়ে যাচ্ছিস্? আচ্ছা মজার লোক ত তুই দেখি!—শুনুন স্থলোচনাদি’! নীলির বাবা আরও যে কত কথাই বল্লেন, তা আর আপনাকে কি বলবো! আপনাকে দেখে নাকি মেয়েরা সব বেচাল শিখছে, আপনাদের বদলে অন্য টিচার এলে তখন ওঁর মেয়ে নাকি পড়তে আসবে—আর সে ঢের ঢের কথা।”

ইনফ্যাণ্ট ক্লাসের মেয়েদের শ্লেটের উপর পেনসিল দিয়া যুক্তাক্ষর লিখিতে বসাইয়া ফোর্থ টিচার ব্রহ্মবালা দে কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া পায়ে পায়ে আসিয়া মনোরমার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল; মনোরমাকে এবার ‘কমা’ দিতে দেখিয়াই অসহিষ্ণুভাবে সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—“আরও কি কথা বল্লে রে মনো?”

মনোরমা সমুৎসাহিত হইয়া—ঢের কথা বলিবার জন্য উহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সুলোচনা গম্ভীরমুখে মিস্ দে'র দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"That is impertinence ! বালু !—মনো !—যাও তোমার নিজের জায়গায় গিয়ে বসগে।"

খট্ খট্ করিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গিয়া রেজিষ্টার বাহির করিয়া তার পাতা উল্টাইয়া খসখস করিয়া নীলিমার নামটা কাটিয়া দিলেন, পাশের ঘরের মেয়েরা খোলা বইএর পাতার পাশ দিয়া আড়চোখে উক্ত কার্য্য দর্শনান্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলাবলি করিল, "ওরে, নীলি আজ থেকে নামকাটা সেপাই হয়ে গেলরে !"

ইতোমধ্যে মনোরমা আসিয়া স্বস্থান গ্রহণ করিয়াছিল। থার্ড টিচার প্রেমকুসুম দাস কয়েকটি মেয়েকে একটা নূতন আঁক দেখাইয়া দিতে-ছিলেন, ইঙ্গিতে মনোরমাকে কাছে ডাকিলেন। মনো আসিলে স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কই, সে চিকনটা কেনা হয়ে এসেছে ?"

...না ঘাড় দুলাইয়া জবাব করিল, "উঁহুঁ, সে আজকে মোটে কেন হবে, কাল আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন।"

"ইউ আর এ নটী গার্ল ! রোজই ত কাল কাল বলো, কবে তোমার কাল হবে শুনি ?"

মিস্ দাসের এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "ওর কাল' হ'তে এখনও অনেককাল লাগবে—প্রেম-কুসুমদি' ! দেখছেন না কি মোটা।"

মনোরমা ভ্রূভঙ্গি করিয়া রুখিয়া উঠিল, "তোর মতন ত আর সব্বাই পাক্‌তাড়ানী—কাকতাড়ানী তা' ব'লে হ'তে পারে না। না সত্যি প্রেমকুসুমদি' ! কাল ঠিক এসে যাবে দেখবেন, মাকে আমিও ক'দিন তাড়া দিচ্ছি, তা মা কি বলেন জানেন ?"

"কি ?" বলিয়া প্রেমকুসুম একটি মেয়ের আনা কষা অঙ্ক দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

"মা এমন দুষ্টু !—না, আমি সে কথা বলবো না—সে আপনি শুনলে রাগ করবেন—মা বলে, মা বলে, তোর প্রেমকুসুমদি'র ত আর বিয়ে বন্ধ থাচ্ছে না—এত তাড়াতাড়ি কিসের ? দোবইখন' আনিয়ে।"—এই কথাটি বলিয়া মনোরমা মুখ নামাইয়া ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়ের ঠোঁটেই একটু একটু হাসি দেখা দিল।

প্রেমকুসুম হাতের পেনসিলটা দিয়া মনোরমাকে ছুঁড়িয়া মারিলেন—তার পর ভাঙ্গা পেনসিলটা কুড়াইয়া দিতে হুকুম দিয়া ধমক দিলেন, "কি—সব ডেঁপো হয়ে যে উঠ্‌ছেন, দাঁড়াও না, মিস্ বোসকে তোমাদের সব বিদ্যের কথা শুনিয়ে দিচ্ছি !—এই অলকা ! তোর কানে ও কিসের দুল রে ? সিরোপাল ? সুন্দর ত ! কতয় কেনা ? কোথা থেকে আনানো হলো ? দাম জানিস্ ?—ওঃ—মোটে কুড়ি টাকা ! এক্সেলেণ্ট ! এই মেয়ে ! মাকে বলে আমায় একজোড়া আনিয়ে দে' না ?

অলকারা দুই বোন—অলকা ও অনুকা দুজনেই একসঙ্গে সমুৎসুক-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আজই বাড়ী গিয়ে মাকে বলবো'খন, মা নিশ্চয় কালই কলকাতায় দাদাকে লিখে দেবে পাঠাতে।"

তখন অপর ক্লাস হইতেও একটি দুইটি বড়মেয়ে উৎসাহচঞ্চললোভাতুর-কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলিল—"ও ভাই অলি ! আমিও মাকে ব'লে টাকা দেবো ভাই ! আমাকেও একজোড়া দুল আনিয়ে দিতে হবে কিন্তু !"

যে মেয়ের অঙ্কের তিন ভাগ ভুল হইয়াছিল, তাহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক শ্লেটখানা ফিরাইয়া দিয়া প্রেমকুসুম ঐ মেয়ের উদ্দেশ্যে কহিলেন, "তোকে আবার এখনি কানের দুল কিনে দিয়ে কি হবে রে মেয়ে ? আবার ত দুদিন পরেই বিয়ের সময় দিতে হবে।"

মেয়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ, তা বই কি! আর আপনার? আপনার বুঝি পরতে দোষ হয় না? আপনারও তো—"

"কি? বিয়ের সময় হবে? কে' দেবে? দেবার যদি কেউ থাকতো তো কি এইখানে এই সব গোরু চরাতে আসি রে? এই সুধা! কতক্ষণ লাগে একটা ভাগ রাখতে? ভারি চালাকি হচ্ছে!"

"এই যে হয়ে গেছে—প্রেমকুসুমদি'!"

"আচ্ছা প্রেমকুসুমদি'!—না বাপু, বলবো না—আপনি হয় ত রাগ করবেন!"

"যা, যা, বলিস্‌নি, ডেঁপোর শেষ হয়েছে এই মেয়েগুলো, একদিন মিস্ বোসের কাছে না—এই, সব শীগ্‌গির ভাল ক'রে বোস্, মিস্ বোস আসছেন। সুপ্রভা! চার সতেরং কত হয়? তবে যে এখানে চৌষট্টি লিখেছ বড়?"

* * * *

নীলিমা যতক্ষণ সেই ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে আমোদিত বন্ধ গাড়ীর ভিতরে ছিল, সমানেই সে রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ চোখ মুছিয়াছে। তার নিতান্ত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পোশকটের মধ্যে কোন বাঙ্গালীর মেয়ে উপস্থিত ছিল না, তাই তার এই অনাহূত অশ্রুজলের বেগ সাম্‌লাইয়া রাখার অদম্য চেষ্টা সত্ত্বেও যে ছিটাফোঁটাটা বাধা না মানিয়া বহির্মুখী হইতেছিল, তার জন্য কৈফিয়তের দায়ে পড়িতে হয় নাই। সারা পথই তার এমন করিয়া কাটিয়াছে, বিশেষতঃ যখন এলবার্ট স্কুলের গাড়ীখানা পাশ দিয়া গম্‌গম্ শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেল, গাড়ীর মধ্য হইতে প্রতিদিনকার মতই মেয়েদের কল্‌কল্ করিয়া কথার শব্দ, হাসির স্রোতঃ বায়ুতরঙ্গে

মিশিয়া নীলিমার কানে ভাসিয়া আসিল, মনোরমার তীক্ষ্ণ হাস্যের সহিত অন্যকার ঝঙ্কারী-কলহাস্য একত্র মিশ্রিত হইয়া নীলিমার বুকের বাঁধাপর্দ্দায় ঘা দিয়া কতকগুলা পুরাতন সুর বাজাইয়া তুলিল, কত সুদূর দিনের স্মৃতির ভাণ্ডার একসঙ্গে উলটিয়া পড়িল। আর যেন নিজেকে সামলান গেল না।—পাছে উহারা দেখিতে পায়, এই ভয়ে গাড়ীখানা দেখিয়াই সে সম্মুখের টানা ঝিলমিলি করটা নামাইয়া দিয়াছিল, আবার ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইলেও অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা আজিকার সম্পূর্ণ অপরিচিতা সঙ্গিনীদের দেখাইতে হয়, নীলিমা বিপন্ন ভাবে অবশেষে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আজ ওই অতবড় গাড়ীখানার—অতগুলি মেয়ের মধ্যে শুধু তারই এতটুকু যায়গা খালি হইয়া গিয়াছে! না জানি তার কথা উহারা কত কি-ই বলাবলি করিতেছে? হয় ত তাকে আনিতে আজও গাড়ীখানা তাদের বাড়ী গিয়াছিল? কে না জানি কি বলিয়া ফেরত দিল? এ সময় তার বাবা বাড়ী থাকেন না। কিন্তু আজ তো নীলিমা তাঁকে বাড়ীতেই দেখিয়া আসিয়াছে! বাবা না জানি দাইকে কি কথাই বলিলেন? ওরা যে মেয়েরা অত কল্‌কল্ করিয়া কত কথা বলাবলি করিতেছিল, অত হাসাহাসি করিতেছিল, সে হয়ত তার, আর তার বাবার কথাই—

লজ্জায় নীলিমার চোখের জল শুকাইয়া গেল, এতক্ষণ স্কুলে পৌঁছিয়া দাই—তার সঙ্গে মেয়েরা যোগ দিয়া তাদের কথা কি ভাবেই না বলাবলি করিতেছে? বাকি টাকা ফাঁকি দিয়া নীলিমা স্কুল ছাড়িল শুনিয়া সুলোচনাদি' কত বড় ঘৃণার সঙ্গেই তাকে বিচার করিবেন। আর ত দেখাও হইবে না যে, তাকে সে বুঝাইয়া দিবে, এ কার্য্য সে নিজের ইচ্ছায় করে নাই, কিন্তু সুলোচনাদি'র গম্ভীর মুখ দেখিলেই যে ভয় করে, তাঁর সঙ্গে কি সহজভাবে কথা কহা যায় যে, সে তাঁকে সুবিধা পাইলেও বুঝাইবে,

সে দোষী নয় ? না, না, সে কখনই হইবে না—দোষী হইয়াই উহাদের নিকট তাকে চির বিদায় লইতে হইল !—আবার চোখের জলে বুক ভাসিতে লাগিল। তার পারিপার্শ্বিকগণ তার এই মেঘ-বৃষ্টির ক্ষণিক খেলা অবাঙ্মুখে নিরীক্ষণ করিতে থাকিয়া অর্থবোধ করিতে পারিল না, দুই এক জন পরস্পরকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিয়াছিল, "ই-বাঙ্গালীন্ কাহাঁসে-আয়া ?—ই-রোতা কাহে হ্যায় ?" কিন্তু উভয় প্রশ্নেরই "কা' জানে।" এই উত্তর মাত্র পাওয়া গেল। অগত্যা তারা তাদের মধ্যে আকস্মিক সমাগতা এই অদ্ভুত জীবটি সম্বন্ধে অযথা কৌতূহল বিসর্জ্জন দিয়া সম-উর্দ্ধস্বরে যিশু ভজনে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া চলিল :—

'—হে মেরা যেশু ! হে মেরা প্রভু ?
আইসিও মেরা লগ্‌গে—ছোড়িও না কভু।"

স্কুলের ঘর-বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অবসন্ন মন ঈষৎ সুস্থ হইলেও দেশী ও বিলাতী মেম এবং অবশিষ্ট বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর বেহারী হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নীলিমার শরীর মন সঙ্কোচে গুটাইয়া আসিল। এদের মধ্যেই তাকে সারাদিন যাপন করিতে হইবে ?···পড়া লইতে ও দিতে হইবে ? কোথায় মিস্ দে', প্রেমকুসুমদি', —এমন কি, সুলোচনাদি'র সেই গম্ভীর কঠিন মুখখানাও আজ তার মনের মধ্যে মধুক্ষরণ করিল। অপ্রিয়ভাষিণী সাবিত্রী মনোরমাকে স্বর্গবাসিনী দেবকন্যার দল মনে হইতে লাগিল। কি পুণ্য করিলে এরা তারা হইয়া যাইতে পারিত ?

সঙ্গের দাই কি বলিল, চিঠি দিল, শুনিয়া ও পাঠ করিয়া একজন মেম আসিয়া হতবুদ্ধি নীলিমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, একটি অপূর্ব্ব-দর্শন সুসজ্জিত কক্ষে আর এক জন স্থূলাঙ্গী রক্তাননা মেম প্রকাণ্ড একটা চৌকিতে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন, নীলিমার সমভিব্যাহারিণী

মেমটি তাঁকে ইংরাজীতে কি সব বলিতে তিনি একটা খাতা বাহির করিয়া নীলিমার দিকে পিঙ্গলাক্ষ ফিরাইয়া সম্বোধন করিলেন, "হে আমার প্রিয় বালিকা! তোমারই নাম কি নীলিমা চাকারভারটী?"

নীলিমা ঘাড় বাঁকাইয়া জবাব দিলে পুনঃ প্রশ্ন হইল—"তুমি এক্ষণে কত দিনের বৃদ্ধ হইয়াছ?"

নীলিমা এ প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নীরব থাকিলে মেম ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, "ও হায় হায় বেচারা বালিকা! তুমি যদি তোমার নিজের মাতৃ-জিহ্বাকে (ইওর মাদার টং) ভুল কর, তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইব।"

এইরূপে নীলিমাকে মিসন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া তাহাকে 'বেঙ্গলী ক্লাশে' পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই মিসনের সঙ্গে যে অনাথাশ্রম (অরফ্যানেজ) ছিল, তাহাতে দুই জন বোর্ডার এবং স্থানীয় দুই এক জন নিতান্ত দরিদ্রাবস্থ বাঙ্গালীর মেয়েকে লইয়া মিসেস্ গুঁই টিচারের অধীনে এক 'বেঙ্গলী ক্লাশ' খোলা হইয়াছিল, নীলিমা তাহারই অন্যতমা ছাত্রী হইয়া দল একটু পুষ্ট করিল।

সে যখন ক্লাশে ঢুকিল, তখন ক্লাশ আরম্ভ হইয়াছে, মেয়েরা ভূমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চোখ মুদিয়া প্রার্থনা করিতেছিল, কেবল মিসেস্ গুঁই মধ্যে মধ্যে মিটিমিটি চাহিয়া দেখিতেছিলেন মেয়েরা কেহ চোখ খুলিতেছে কিনা। নীলিমাও উহাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল এবং সকলের মুখে শুনিয়া শুনিয়া যতটা পারিল, আবৃত্তি করিল :—

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ! তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক,—তোমার ইচ্ছা আইসুক,—আমাদের দিবসের আহার এই দিবসে আমাদিগকে দাও এবং আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরা নিজ অপরাধ সকল ক্ষমা করিয়া থাকি,—আমেন।"

প্রার্থনা শেষ হইতে মেয়েরা সমস্বরে হুহু করিয়া গান ধরিল। নীলিমা অজ্ঞতাবশতঃ হাঁ করিয়া তাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মিসেস গুঁই তাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "চেষ্টা করতে পারতে—"

নীলিমা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল ;—

"বল না ভারত ঘুমাবে কত, পড়িয়া পাপের ঘোরে।
দেখ না চাহিয়ে নয়ন মেলিয়ে, ত্রাণ-ভানু ওই অ-দূরে,
হরি রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু যাও ভুলে,
নোড়া-নুড়ি ফেল সাগরের জলে,
যদি পার চাহ ভবার্ণবকূলে, সার কর তবে যিশুরে।"

গান শেষে পড়ার পালা,—মিসেস গুঁই নিজের বাঙ্গালা বাইবেল খুলিয়া আরম্ভ করিলেন—"ঈশ্বর বলেন শেষ যুগে এইরূপ হইবে,—আমি সংসারের উপর আমার আত্মার বর্ষণ করিব।"

সঙ্গে সঙ্গে সকল মেয়েই নিজ নিজ বাইবেলের পাতা আঙ্গুলে থুথু মাখিতে মাখিতে খুলিয়া ফেলিল ও সেইরূপ সমস্বরে আরম্ভ করিল :—

"আর তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগণ প্রবচন বলিবে।

"আর তোমাদের যুবকরা দর্শন দেখিবে।

"আর তোমাদের প্রাচীনরা স্বপ্ন দেখিবে।

"হাঁ, আর সেই যুগে আমার দাসদের উপরে আর আমার দাসীদের উপরে আমার আত্মার বর্ষণ করিব ও তাহারা প্রবচন বলিবে।"

ছুটীর পূর্ব্বে পুনশ্চ প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া ছুটি হইল। এবারকার

গানটি না গাহিয়া পাছে নীলিমার আত্মার অনন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে, সেই ভয়ে উহা নীলিমাকে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল ;—

"দয়াল যিশুর পায়ে প্রাণ সঁপে দে' যমের ভয় তুই করিস নে,
ন্যাংটাকালী নোংরা শিবের পূজো করা ছেড়ে দে।"

ছুটী হইয়া গেলে মেয়েরা কপালে হাত ঠেকাইয়া "গুরুমা ! নমস্কার !" বলিয়া বিদায় লইতেছিল ; মিসেস গুঁই তাদের ফিরিয়া ডাকিলেন।

নীলিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই মেয়েটা আজ কোথা থেকে এলো ?—এই !—তোর নাম কি রে ?"

নীলিমা বিজড়িত স্বরে উত্তর করিল—"শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্ত্তী।"

"হাঁ হাঁ, হিঁদুরা অর্থ না বুঝেই নাম রেখে বসে তা' জানা আছে ! তোর এমন ফরসা রং নাম রাখলো নীলিমা !—আমি হিঁদুবাড়ীতে এক জন ঘোর কালো রংয়ের মেয়ের বিদ্যুৎলতা নাম রাখতে শুনেছি। নীলিমা ! আচ্ছা, আমি তোকে নেলী ব'লে ডাকবো—এই নেলি ! তোরা পুতুলপূজো করিস ?"

নীলিমাকে নতমুখ ও নীরব দেখিয়া বলিলেন, "খবরদার ! আর কক্ষনও ও কাজ করিস্‌নে ! নরকের কথা শুনেছিস ? সেখানে দিনরাত্তির আগুনে পোড়ায়,—পুতুলপূজো করলে তার অনন্ত নরক হয়, আর— নরকের সে যে কি যন্ত্রণা, সে সব আমি কাল তোকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেব খন' ; আজ সময় নেই। মনে কর, মৃত্যুর পর আর অনন্তকাল ধ'রে সেই রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে ? অথচ যিশুকে যদি ভজনা করিস্, শেষ বিচারের দিন যিশু তোকে কোলে ক'রে নেবেন, স্বর্গে অনন্ত সুখের অধিকারী হবি, পুতুলপূজো ছেড়ে যিশুকে মান্‌বি ত ?"

অনন্ত নরকের ভয়েই হউক, আর মিসেস গুঁইএর বিরাট বপু ও তীক্ষ্ণ রসনার ভয়েই হউক, নীলিমা মাথা হেলাইয়া জানাইল মানিবে, কিন্তু

এই কথাটা স্বীকার করিবার সময় তার চুলের গোড়া হইতে পায়ের আঙ্গুলের ডগা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, কিসের যেন একটা তাড়নায় সে মিসেস গুঁইকে "নমস্কার" না বলিয়াই দ্রুতপদে সেখান হইতে পলাইয়া আসিল।

অনন্ত—সুখের—প্রলোভনদাত্রী মিসেস গুঁইএর কদাকার মুখখানাকে হঠাৎ তার সেই নরকের দ্বারপালেরই বিকট মুখের মত ভীষণ বোধ হইল, সেই নরকেরই একটা প্রকাণ্ড হাঁ-করা কুমীরের মতই ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল, হঠাৎ মনে হইল সেই মুখটা যেন তাকে গ্রাস করিতে তাহার দিকে ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে!—সে যখন গাড়ীতে উঠিল, মন্থর-গতি গো-যান যখন পায়ে পায়ে চলিয়া মিসনবাড়ীর প্রশস্ত ময়দান ছাড়াইয়া রাস্তায় পড়িল, তখন সে একটা অবরুদ্ধ শ্বাসকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিল; ভরসা করিয়া যেন সেই অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বিলুপ্ত-চিহ্নবাড়ীটার দিকে চাহিতে সাহসী হইল কিন্তু তখনও শরীরের মধ্যে কম্পনের বেগটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই; তখনও কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, কেন, বা কি জন্য কিরূপ একটা অজ্ঞাত ভয়ের তাড়না সে খাইল, তাহা সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু তার জীবনে কিছু যেন একটা অভাবনীয় —একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের সূচনা আজ এইখানে দেখা দিয়াছে, বালিকা হইলেও ইহা তার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বুঝিতে পারিয়াই অমন করিয়া উঠিয়াছিল।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

তরুলতা শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া দেখিল, সুশীল যেন কেমন ধারা হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে বিনতা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "তুমি চ'লে গিয়ে দাদা নাকি বাড়ীর মধ্যে আসে? কারু সঙ্গে নাকি কথা কয়? ছেলে ত অন্ধকার মুখ ক'রে শুয়েই আছে!"

তরু এই সংবাদে শঙ্কিতা হইয়া উঠিল—"অসুখ করেনি ত? বাবা কি বলেন।"

বিনতা ফিতাবাঁধা বেণী দুলাইয়া জবাব দিল, "হ্যাঁ, বাবা কি কাউকে কিছু বলেন? ঠাকুমা ব্যস্ত হচ্ছিলেন, তাই বল্লেন, 'তরুর জন্যে বোধ করি মন খারাপ হয়েছে;—রেষ্ট নিক।'—ছেলে শুয়ে শুয়ে 'রেষ্ট' নিচ্ছেন,—একেবারে নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিচ্ছু!"

সেদিন যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে গিয়া অকস্মাৎ দুর্ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, সুশীলের সুভদ্র জীবনের সহিত তার এতই অনৈক্য যে, সেই কাণ্ডটাতে তাকে একেবারেই পাড়িয়া ফেলিত, যদি শুভেন্দু তার স্কন্ধে ভর করিয়া তাকে পরিচালিত না করিত। বিপ্রদাস বাবুর বাগানের বাহিরে আসিয়া শুভেন্দু বুঝিতে পারিল, সুশীল নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। তীক্ষ্নস্বরে ডাকিল, "সুশীল!"

সুশীল জবাব দিতে পারিল না, কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিল। শুভেন্দু কণ্ঠস্বরে তিরস্কার ভরিয়া কহিয়া উঠিল, "কাঁদ্ছো! তোমার বয়স চার না চোদ্দ?"

এ প্রশ্নেরও সুশীল উত্তর কহিল না বটে, কিন্তু এই অবমাননায় তার

অবসাদগ্রস্ত শিথিল শরীরে উত্তেজনার মাদকতা যে জাগিয়া উঠিতেছে তাহা শুভেন্দু বুঝিতে পারিয়াছিল, এই ছেলেটির চরিত্র-লেখা তার নিকট একান্তই সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে!

কিছুদূর নীরবে চলিয়া আসিবার পর শুভেন্দু আকস্মিক প্রশ্ন করিল, "বাড়ী যাচ্ছো ?"

সুশীল এই প্রশ্নে একটু হতবুদ্ধি হইয়া গেল, এই ভরা সন্ধ্যায় এবং এইমাত্র যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, তারও পর তার মত ছেলে বাড়ী না গিয়া কোথায় যাইতে পারে ? সবিস্ময়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

শুভেন্দু বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিল, "কুকুরের মতন চাবুক খেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে বাড়ী যাবে। পিঠের জ্বালা নিয়ে ভাত খেতে পারবে ? গলায় বাধবে না ? ঘুম আসবে ?"

সুশীল নীরব রহিল, কিন্তু অক্ষমতার কোপে তার সর্ব্বশরীরে যে টান ধরিয়াছে তাহা বুঝা গেল। শুভেন্দু ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি তোমার মতন ভাল ছেলে নই সুশীল! আমার ঐ অবিচারের চাবুকের জ্বালা বড়লোকের বাড়ীর পিঠে পায়েসে জুড়িয়ে যাবে না—আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই।"

শুভেন্দু চলিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিল, সুশীলও সঙ্গে আসিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া কোমলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি এলে ?"

"হ্যাঁ।" বলিয়া সুশীল হন হন করিয়া আগবাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল, মনে মনে হাসিয়া শুভেন্দু ডাকিল, "শোন!"

"কি!" বলিয়া সুশীল ঘাড় ফিরাইল।

"রায়দীঘির পশ্চিম পাড়ে সেই সাদা বাড়ীখানা ?"

"হ্যাঁ"—

"বাড়ীর উত্তরধারের প্রকাণ্ড গোয়ালবাড়ীটা লক্ষ্য ক'রেছ ?"

"হ্যাঁ।

"দিব্যি হবে!"

"কি ?"

"চৌদ্দ পনের বছরে এনট্রান্স পাশ দিলেই বিদ্বান্ হয় না, তুমি তার একটি দৃষ্টান্ত! চাবুকের জ্বালার শোধ সেই চালাখানা দিয়ে তোলবার সুবিধা হবে। এইটুকুও বোঝবার শক্তি নেই ?"

সুশীলের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, "আগুন দেবে ?—সে যে মহাপাপ!"

"আর দুটো পেয়ারা পাড়ার জন্যে ভদ্রলোকের ছেলেকে চাকর দিয়ে চাবুক খাওয়ানটা বুঝি মহাপুণ্যকার্য্য ?"

"কিন্তু আগুন দিলে—"

শুভেন্দু হাত দিয়া পিছন দেখাইয়া কহিল, "বাড়ী যাও"—বলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। লোহা যেমন করিয়া চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, সুশীল নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভুবন বাবু জানালা দিয়া গ্রামের দক্ষিণ-ভাগে একটা অগ্নি-পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। মনটা আহত হইল, বাহিরে আসিলেন, বারান্দায় পা দিয়া মনে হইল, কে যেন পাশের ঘরে ঢুকিয়া গেল। নীচে নামিয়া দুই তিন জন চাকর ও দ্বারবান্কে বিপন্নদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া অনেকক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরিয়া বারান্দায় ফের পা দিতেই আবার তেমনই ছায়ামূর্ত্তি সরিয়া গেল, এবং অস্ফুট একটা কান্নার শব্দ কানে পৌঁছিল, প্রথমে লক্ষ্য না করিয়াও কান্নার শব্দ যেন তাঁকে অনুসরণ করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকায়, বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া ভুবন বাবু সুশীলের ঘরের দ্বারের নিকট

আসিলেন, ঘর অন্ধকার, কিন্তু এবার স্পষ্টই বুঝা গেল কান্নার শব্দ এই ঘরের মধ্য হইতে স্পষ্ট হইতেছে।

ডাকিলেন, "সুশীল!"

কান্নার শব্দ বর্দ্ধিত হইল!

"সুশীল!"

ভুবন বাবু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, সুশীলের সাড়া নাই, যে ছায়ামূর্ত্তি দুইবার অপসৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা সুশীলেরই। আগুন জ্বলার ভীষণ দৃশ্যে বালক ভয় পাইয়াছে, বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া "সুশু!" বলিয়া ডাকিতেই ভয় পাওয়া শিশুর মত সুশীল ছুটিয়া আসিয়া তাঁর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদের মত উচ্চারণ করিল, "বাবা!"

"বাবা! আমি চাকরদের দেখতে পাঠিয়েছি—যদি কিছু করতে পারে।"

"বাবুজি!"

"কে' রে, রামপ্রসাদ? কি খবর?"

"আর খবর করতাবাবু? চৌধুরী বাবুর গোশালা একদম রাখ্‌সে রাখ্‌ হোয়ে গেছে, সেজন্যে দুঃখু নেই,—চৌধুরী সাহেব বড় দুষমন আদ্‌মী আছে, লেকিন একঠো বাচ্ছী ইস্‌কে সাথ মর্‌ গিয়েছে, সেহি এক বড়ি আপশোষকা বাত হ্যায়।"

একটা সকরুণ আর্ত্তধ্বনির সহিত সুশীল সংজ্ঞাহারা হইয়া পিতার বুকে ঢলিয়া পড়িল।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ গড়াইল না। সে দিনের সেই নিশীথ অগ্নি-কাণ্ডের গুপ্ত নায়করূপে যাহাকে অভিযুক্ত ও পুলিস-সোপর্দ্দ করা হইল, সে বিপ্রদাস চৌধুরীর পূর্ব্ব-ভৃত্য। দিনচারেক পূর্ব্বে বাবুর একটা রূপা বাঁধান ছড়ি চুরি যাওয়ায় ইহার প্রতি সন্দেহে ইহাকে প্রহার করা হয় এবং পরে সেই অপহৃত ছড়িটি আর এক জন ভৃত্যের নিকট হইতে পাওয়া যাওয়ায় নিরপরাধে প্রহৃত গোপাল দেবতা মানুষকে সাক্ষী রাখিয়া এই নৃশংস অবিচারের শোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করে। আদালতে প্রমাণ হইল, কয়দিন ধরিয়া তাহাকে চৌধুরীবাড়ীর আশেপাশে ঘুরিতে দেখা গিয়াছে। আগুন লাগাইবার সময় অবশ্য সাক্ষী রাখিয়া লাগায় নাই, তবে নিকটবর্ত্তী দোকানদার সাক্ষী দিল, এক ডিবা কেরোসিন ও একটা দিয়াশলাই সে দোকান হইতে কিনিয়াছিল।

গোপাল এ সব কথার কিছুই অস্বীকার করিল না, শুধু এই ভীষণ অপরাধটাকেই সে অস্বীকার করিল। বলিল, "রাগের মাথায় শোধ লইবার কথা বলিয়া আসিলেও বাবুর উপর শোধ লইবার উপায় তার নাই। আর শুধু সেই জন্যই দেশে না গিয়া বাবুর বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরিতেছিল।" কারণ জিজ্ঞাসায় অবনতমুখে উত্তর দিল, "বাবুর শরীরে দয়া ধর্ম্ম নেই; চাকরদের তিনি মানুষ মনে করেন না, 'শালা' 'ব্যাটা' ভিন্ন কোন দিন নাম ধ'রেও কারুকে ডাকেননি। তাঁর পোষা কুকুরদের আদরের নাম 'টেবি' 'লুলু'। কাশ্মীরী বেরালটাকে আদর ক'রে 'গারল্যাণ্ড ব'লে ডাকেন! লালমাছ, নীলমাছ, পাখী, পায়রা, হরিণ; খরগোসের পিছনেই তিনি লোক। বিলিতি কুকুরে রোজ দেড়

সের মাংস খায়, কিন্তু চাকরদের মোটা চালের ভাতের উপর শাক-চচ্চড়িরও অভাব ঘটে—অথচ সেই ভাতের গ্রাস কয়টা মুখে তুলিবার মধ্যেও ফাই-ফরমাসের জন্য ডাকপড়াপড়ি বন্ধ হয় না। যাক্, সে আমাদের বরাতের দোষ, আর জন্মে বাবুর কাছে ধার নিয়ে শোধ দিই নি, তার ধার শুধছি। উনি আর জন্মে কি পুণ্যকাজ ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এ জন্মে দশ জনের ওপোর হুকুমজারী করছেন। আমি শুধু একটী বার দিদিমণির মুখটী দেখে যাবার জন্যে ক'দিন ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম! অমন নিঠুর বাপের যে তেমন দেবতার মত মেয়ে কোথা হ'তে এলো, সেই আমরা ভেবে পাইনে।"

গোপালের এ সব ছেঁদো কথা আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে টিকিল না, যেহেতু গরীবের মত ছোটলোক সংসারে নাই—উহারা যখন বড়মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন নিশ্চিত জানা কথা তাহার ভিতর পনের আনা সাড়ে তিন পাই ঈর্ষা ও বিদ্বেষ মিশ্রিত থাকে। উহারা যদি মনিবের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, তবে দৃষ্টান্তটা ভাল হয় না। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় উহা ভৃত্য-জাতীয়ের শীতল শোণিতকে উষ্ণ করিয়া তুলে ও উহাদের স্পর্দ্ধা বাড়ায়। অতএব এ ক্ষেত্রে সবারই ঘর সামলান দরকার বলিয়া নিতান্ত নিরপেক্ষ বিচারক ব্যতীত প্রায়ই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। তবে এমনটাও ঘটিয়া থাকে যে, যদি কালেক্টার "সাহেব" বা তৎস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কোন কারণে সেই মনিবটির উপর বিরূপ থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে ভৃত্যটি দোষী হইলেও জয়লাভ করে। এক্ষেত্রে তেমন ধারাটা নাকি ঘটে নাই; এবং শিক্ষিত উকিলের বক্তৃতার বেশ বাঁধুনীও ছিল; সাক্ষীরা খুব পাকা এবং হয়ত বা হাকিমটিও একটু কাঁচা। গৃহদাহকারী গোপালের বিরুদ্ধে রায় বাহির হইল।

ভুবন বাবুর বাড়ীতেও খবরটা প্রচারিত হইল। এখনকার দুর্ব্বিনীত

ভৃত্যজাতীয় লোকেদের উপর প্রায় কেহই সন্তুষ্ট নহে, তারা কথায় কথায় মনিবের উপর চোখ রাঙ্গায় ; মাহিনা বাড়াইয়া না দিলে চাকরী ছাড়ে ; ভাল খাওয়া-পরার দাবী তুলে ; আবার অনেকেই গাঁজা, গুলী, সিগারেট, বিড়ি,—পশ্চিমারা তাড়ি সিদ্ধিতে চুর হইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেই ভালবাসে, মেজাজেরও ঠিক থাকে না। মনিব চাহেন সস্তায় সুচরিত্র ও বিনীত ভৃত্য—কালধর্ম্মে বিনীত ত নহেই—সচ্চরিত্রও নয়। মনিব-পুত্রের অনুকরণে নব্যয়ানায় চুলছাঁটা, সিগারেট টানা, পাতলা বিলাতি ধুতি সাট পরা এবং সিনেমা দেখার নেশাগ্রস্ত। বাবুরা যখন খাটো ধুতি হাতকাটা বেনিয়ান ও ঠনঠনের চটি পরিত, তখনকার ভৃত্যদেরও সেই খাটো ধুতিই দস্তর ছিল। 'ঘোড়া-রোগে' শিক্ষিতরা যদি মরিতে পারে, এরা বাঁচে কি করিয়া ?

গোপালের মত গোঁয়ার-গোবিন্দ ছোটলোকের কঠিন দণ্ডাদেশে—যাদের চাকর রাখিয়া ঘর করিতে হয়, তাহারা উৎফুল্ল হইল, "এ না হইলে সংসারে টিকিয়া থাকাই দায় ! মনিবের জিনিষ খোয়া গেলে একটু কি করিয়াছে,—অমনি জ্বালাও তার ঘর, পোড়াও তা'র গোরু,—কি ভাগ্য যে তারই মুখে আগুন দেয় নাই।"

শুভেন্দু খবরটা লইয়া নিতান্ত নিরপেক্ষভাবে সুশীলের ঘরে ঢুকিয়াছিল, সেখানে তরু ও বীণার উপস্থিতিতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া বীণাই ডাকিয়া বলিল, "আসুন না শুভু'দা !"

শুভেন্দুর সুশ্রী চেহারা। প্রচুর উদ্ভাবনী শক্তি ও সাহস তাহাকে সকলের কাছেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করিয়াছিল, বীণার আহ্বানে সে আসিয়া তাদের মধ্যে বসিয়া পড়িল,—সুশীল বলিল, "দিদি আমায় একটা গোলকধাম খেলার ছক তৈরী ক'রে দিয়েছে—খেলবে শুভেন্দু ?"

শুভেন্দু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তুমি এখনও গোলকধাম খেল নাকি ?"

শুভেন্দুর সেই হাসি ও সুরে সুশীলের কানের গোড়া লাল হইয়া উঠিল, বিনতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছেন, শুভু'দা! দাদা এখনও এম্‌নি সব ছেলে মানুষী জিনিষ ভালবাসে যে, সে দেখলে হাসি পায়! আমিও ওকে বলি যে, খেল্‌তে হয় ত তাস দিয়ে গ্রাবু খেল, না হয় ড্রাফ্‌ট খেল। তা' নয় ছেলে খেলবেন'ত সেই গোলামচোর, নৈলে গোলকধাম! আর দিদিরও ঠিক কি ওর মতন পছন্দ।"

সুশীল তরু নিজেদের বিকৃত রুচির লজ্জায় বিব্রত হইয়া বলিল, "তোমাদের যা ভাল লাগে, তাই খেল।"

খেলা আরম্ভ হইল। শুভেন্দুর কাছে এক পড়াশুনা ছাড়া কোন কার্য্যেই কাহারও জয়ের প্রত্যাশা নাই। বরাবরই তার স্থান সর্ব্বপ্রথমে, —কিন্তু এতবার জয়ী হইয়াও মন জয়ের আনন্দে আজ আনন্দিত হইতেছে না। সুশীলের নিরুদ্যম, ম্লান মুখের দিকে তীক্ষ্ণ নেত্রে সে চাহিতেছিল। তাস লইতে গিয়া তার হাত কাঁপিতেছে, উহাও তার অজ্ঞাত ছিল না। মনে মনে দারুণ বিরক্ত হইয়া "ভীরু" "অকর্ম্মণ্য" বলিয়া গালি পাড়িলেও কয় দিনে উহার শরীর-মনের অবস্থা দেখিয়া বোধ করি, মনে একটু অনুকম্পাও হইয়া থাকিবে—তাই মঙ্গল সংবাদ—নিশ্চিন্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিয়া ফেলিল, "গোপালের বিচার শেষ হয়ে গেল।"

সে বার বিন্তির খেলা চলিতেছে, কিন্তু আগ্রহাতিশয্যে সকল সাবধানতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিনতা ইস্কাবনের টেক্কা 'পাশ' দিয়া উগ্র কৌতূহলে প্রশ্ন করিল, "কি হোলো, শুভু'দা! ও রকম শয়তানদের ফাঁসী হলেও দোষ হয় না।"

সুশীলের হাত কাঁপিয়া তাসগুলা পড়িয়া গেল। শুভেন্দুর মুখের দিকে সে যখন অধীর দৃষ্টিপাত করিল, অস্বাভাবিক রাঙ্গামুখে, আশ্চর্য্য উজ্জ্বল-চোখ দুইটা যেন ইলেক্ট্রিক ল্যাম্পের মত জ্বলিতেছে। শুভেন্দু

তার আরক্ত মুখে তীব্রকটাক্ষ করিয়া বিনতার প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিল—“কি আর এমন হবে! চার বৎসর সপরিশ্রম জেল।”

সেই রাত্রের মত একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া সুশীল অচেতন হইয়া পড়িল!

মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভুবন বাবু আবার সেই চাপাকান্না শুনিতে পাইলেন। নিঃশব্দে সুশীলের বিছানার কাছে আসিতেই শুনিতে পাইলেন, সে অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, “কি হবে! কি করবো? গোপালকে যে জেলে যেতে হচ্ছে—কি করি? বাবাকে কি ক’রে বলি?”

ভুবন বাবুর বোধ হইল, যেন একগাছা চাবুকের বাড়ি তাঁর মুখের উপর কে সজোরে আঘাত করিল! তক্ষনি এই গুরু আঘাতের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইয়া সুগভীর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কথা কহিলেন, “সুশীল! গোপালের সঙ্গে কি তুমি ছিলে?”

সমস্ত ভয় লজ্জা একমুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইয়া গিয়া পরম আশ্বস্ত চিত্তে সুশীল তার বাপের কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, ধরা গলায় অথচ মুক্ত কণ্ঠে এক নিঃশ্বাসে সব কথাই বলিয়া অবশেষে বলিল, “গোপালকে বাঁচাতে পার্ব্বেন না বাবা?”

সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া পিতা ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, “বাঁচাতেই হবে!”

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চৌধুরী-পুকুরের তকতকে নীলজলে তখনও সূর্য্যকরের সোনার গুঁড়া ঝিলিক্ মারে নাই; অগ্নিকোণের কহ্লারবনে ঘোর রক্তবর্ণের কহ্লার ফুলগুলা সবেমাত্র পাপ্‌ড়ী খোলা সুরু করিয়াছে; তাদের নিশীথ-বিশ্রামের গায়ের চাদর কমলপত্রে বিস্তৃত, মানব হস্তস্পর্শে তাহা তখনও তীরদেশ হইতে অপসৃত হয় নাই, মৎস্যকুল তখনও বকের দৌরাত্ম্যে তীরসংলগ্ন খাদ্যান্বেষণ ত্যাগ করিয়া গভীর জলে আত্মরক্ষার জন্য পলায়নপর নহে—দীঘির কূলে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী, উপরে প্রকাণ্ড চত্বর, পশ্চাতে পুরাতন ছাঁদের অট্টালিকা—ইহাই বিপ্রদাস চৌধুরীর আবাসবাটী। বাড়ীর উত্তরে বিশাল একটা ভস্মস্তূপ গত দুর্ঘটনার সাক্ষ্যস্বরূপে পড়িয়া আছে। সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ভুবন রায়ের বুক লজ্জায় গুটাইয়া গেল।

বিপ্রদাস বাবু সচরাচর বাবুজাতীয়-জীবের ন্যায় এক প্রহর বেলায় শয্যাত্যাগ করেন। হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া কেশ বেশ সারিয়া বৈঠকখানায় আসিতে প্রায় অতটাই সময় লাগে। আজ অসময়ে ও অপ্রত্যাশিতভাবে সামান্য পরিচিত ভুবন রায়ের আগমন সংবাদে ও তাঁর প্রেরিত পত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের উল্লেখ থাকায় তাঁকে যথাসম্ভব শীঘ্র বাহিরে আসিতে হইল, বিপ্রদাস জানিতেন, এই লোকটি বিলক্ষণ ধনী, নিজে যারা পয়সার লোক পয়সাওয়ালা লোকেদেরই তারা পছন্দ করে।

সাক্ষাৎ যে এমনভাবে হইবে, বিপ্রদাসের তা' ধারণাও ছিল না। বুদ্ধিমান ভুবন বাবু দুই হাজার টাকার দুই কেতা নোট আগেই, খেসারত

ধরিয়া দিয়া সমূহ কাহিনীটা জানাইলেন, তাই শ্রোতার কানের ভিতর দিয়া শ্রুত কাহিনী মরমে পৌছিতে লাগিল এবং পাঁচশো টাকার বদলে দেড় হাজার টাকা উপরি লাভ হওয়ায়, ক্ষতিটাকে আর লোকসান মনে হইল না, বরং দুই পার্শ্বের স্বরচিত গুম্ফ মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম ঠোঁটের আগায় একটুখানি সন্তর্পিত মৃদু হাস্য ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি নোট দুইখানি পকেটে ফেলিতে ফেলিতে সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন, স্রেফ্ ছেলেমানুষী !

ভুবন বাবুর উচ্চ মস্তক আজ অবনত, উন্নত আদর্শ চূর্ণ কিন্তু পুত্রের অপরাধ স্বীকারোক্তিতে তাঁর সেই আহত পিতৃহৃদয়ের দুঃখ অনেকখানি প্রশমিত হইয়াছিল। এখনও উপায় আছে এই যথেষ্ট ; শীঘ্রই বিদায় লইয়া উঠিলেন। এখনই তাঁহাকে সদরে যাইতে হইবে। বিদায় কালে বিনীত মিষ্টবাক্যে কহিলেন, "বেশী আর কি বলবো—অপরাধীদের যতটুকু পারবেন ক্ষমা করবেন।"

বিপ্রদাস বাবু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "কিন্তু যারা প্রকৃত দোষী তারা তো ক্ষমা চেয়ে গেল না !"

ভুবন বাবু নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু কহিলেন, "তারাও আসবে",—কিন্তু মনে মনে এই দুর্ভাষী ও অহঙ্কৃত পুরুষের নিকট শুভেন্দুকে পাঠাইতে সংশয় বোধ করিতেছিলেন।

বাহিরে আসিয়া বিপ্রদাস তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, ভুবন বাবু দালানের পৈঠা নামিয়া উঠান দিয়া চলিতে চলিতে পিছন দিকে হইতে একটা সসঙ্কোচ আহ্বান শুনিতে পাইলেন—"শুনুন !"

মুখ ফিরাতেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়িল। একটি দশ বৎসরের বালিকা—কিন্তু সেই মেয়েটির গায়ের রংয়ের চম্পক গৌরাভা, উজ্জ্বল ও বিশাল দুটি চক্ষের সরল ও সকরুণ কটাক্ষ, তার ঈষৎ স্ফুরিত আরক্ত অধরপুটের মৃদুকম্পন, সর্ব্বাপেক্ষা গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডের উপরকার

গ্রন্থিচ্ছিন্ন মুক্তাহারের মত নবীন রৌদ্রকরোজ্জ্বল অশ্রুমালার সমাবেশ তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিল। ভুবন বাবু একান্ত বিস্ময়ের সহিত এই সহসা-উদ্ভুত করুণামূর্ত্তিটি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় অপরিচিতা বালিকা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কাপড়ের মধ্য হইতে বাম হাতখানি বাহির করিল, হাতে তার একটি মণিব্যাগ। ভুবন বাবুর দিকে উহা প্রসারিত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে গদ্‌গদস্বরে কহিয়া উঠিল, "এই টাকা দিয়ে আমার গোপালদা'কে ফিরিয়ে আনুন না, আমি তিন সতি ক'রে বলছি সে কক্ষণ আগুন দেয়নি, কক্ষণ আগুন দেয়নি, কক্ষণ আগুন দেয়নি, কিন্তু এ বাড়ীতে কেউ আমার কথা শুনছেনা যে!" বলিতে বলিতে সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল।

ভুবন বাবু টাকার থলিটি হাতে না লইয়াই মেয়েটির অশ্রুপ্লাবিত চাঁদপানা মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, "মা তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ, তোমার গোপালদা' সত্যিই আগুন দেয়নি দোষী দোষ স্বীকার করেছে—নির্দ্দোষ গোপাল মুক্তি পাবে, টাকা লাগবে না।"

মেয়েটির সুন্দর মুখখানি বর্ষা-আকাশের চাঁদের মতই বারেক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আবার তখনই কিছু ম্লান হইয়া গিয়া সে সকাতরে প্রশ্ন করিল, "তবে যে সবাই বলছে, তার চার বৎসর জেল হয়েছে? জেলখানা আমি মামাবাড়ী থেকে দেখেছি, সেখানে পাথর ভাঙ্গায়, ঘানি ঘোরাতে দেয়, এমনি বিশ্রী খাবার তাদের—গোপালদা' মরে যাবে!"—এই বলিয়া মেয়েটি আঁচলে মুখ চাপিয়া পুনশ্চ কাঁদিয়া ফেলিল।

ভুবন বাবুর ইচ্ছা হইল, করুণাময়ী মেয়েটিকে গায়ে মাথায় হাত দিয়া আদরের সহিত সান্ত্বনা দান করেন, কিন্তু সে কে, তাহা জানা নাই। গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন, "দণ্ড "তা'র 'হয়েছিল, মা। কিন্তু সেই

সংবাদ পেয়ে প্রকৃত-দোষীর মনে অনুতাপ জন্মে, সে দোষ স্বীকার করে, গোপাল শীঘ্রই খালাস পাবে।”

“তা হ’লে যে প্রকৃত-দোষী সেও তো এই রকমই সাজা পাবে? চার বছর জেলখাটা কি সোজা কষ্ট!”

ভুবন বাবুর অন্তরের মধ্যে ব্যথাভরা আহত-পিতৃত্ব যেন এই সহানুভূতিপূর্ণ করুণাধারায় টলটল করিয়া উঠিল। পুরুষের চক্ষে ও ক্ষুদ্র বালিকার ওই সভয় ইঙ্গিতে অশ্রুর আভাসই বা দেখা দেয়, এমনই শোচনীয় তাঁর অবস্থা হইল। তিনি ইহা দমনচেষ্টা না করিয়াই সবাষ্পস্বরে উত্তর করিলেন, “মা! ঈশ্বর তোমায় চিরসুখী করুন! কতবড় মহৎপ্রাণ নিয়ে তুমি এই স্বার্থ-মলিন সংসারে নেমে এসেছ, আশীর্ব্বাদ করি যেন এমনি অম্লান থেকেই তাঁর পায়ে ফিরে যেতে পার।”

দুদিনের কুসঙ্গে পড়িয়া তার প্রাণপণে গড়া সুশীল যে এত বড় একটা অন্যায়ের সহায়তা করিল, এ আঘাত বুকে যে বজ্র বলেই বিদ্ধ হইয়াছে।

মেয়েটি এতবড় প্রশংসায় দৃক্‌পাত না করিয়া পুনশ্চ কহিয়া উঠিল, “এই টাকা নিয়ে তার জন্যে কিছু করুন না—শুনেছি, মকদ্দমায় অনেক টাকা লাগে, আমার তো বেশী নেই, যা ছিল ঐ’তে আছে।”

“মা! আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই যাচ্ছি, ও টাকা তুমি রেখে দাও, অন্য কাজে লাগবে।”

বালিকা আস্তে আস্তে থলিটি আঁচলে বাঁধিল, তার মুখ বেশ প্রসন্ন বোধ হইল না, বোধ করি, ইঁহার সব কথা ভালরূপ বিশ্বাস হয় নাই। সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল, “আপনি তো উকিল? টাকা না পেলে তা’র জন্য আপনি শুধু শুধু চেষ্টা করবেন?”

অত্যন্ত বিষাদের ম্লান হাসি বর্ষাকাশের ভাঙ্গা মেঘপুঞ্জের মধ্যস্থ এক ঝলক সূর্য্যালোকের মতই ভুবন বাবুর বিমর্ষ মুখকে মুহূর্ত্তের জন্য প্লাবিত

করিল, তিনি গভীরতর একটা নিঃশ্বাস মোচনপূর্ব্বক সখেদে উত্তর করিলেন, "না মা! আমি সেই অপরাধীরই বাবা।"

"সুলেখা!"—নারীকণ্ঠে কেহ আহ্বান করিল।

"যাচ্ছি মা!" বলিয়া বিদ্যুদ্‌বরণী বিদ্যুতের মতই মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল।

ভুবন বাবু ক্ষণকাল নির্নিমেষে মেঘান্তরালে লুকাইয়া পড়া চাঁদের মত উজ্জ্বল মূর্ত্তিটির অন্তর্দ্ধান পথে বদ্ধ দৃষ্টি থাকিয়া একটা সুদীর্ঘ শ্বাস টানিয়া লইলেন। গভীর ব্যথাবিজড়িত গ্লানির মধ্য হইতে মনে মনে কহিলেন, "এক দিন আগে হ'লে ভাবতেম আমার মানসী প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু আজ আর সে কথা মনে করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু তবু—"

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গোপাল মুক্তি পাইল। প্রথমে এ সংবাদ সে বিশ্বাস করে নাই; পরে তার উপবাসক্লিষ্ট শরীর আনন্দে মূর্চ্ছা যাইবার মত টলিয়া পড়িতেছিল। বাঁধনখোলা হাত তুলিয়া দরবিগলিত অশ্রুজলের মধ্যে অস্ফুট ধ্বনিতে উচ্চারণ করিল—"তুমিই সত্যের!"

বাহিরে আসিয়া জনরবে শুনিল রায়বাড়ীর ভুবন রায় তার দিদি-মণির কান্নায় গলিয়া বিস্তর পয়সা ও মেহন্নত করিয়া তার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আরও শুনিল, সেই ভুবন রায় একজন রাজার মত লোক এবং সেই ধনাঢ্য ব্যক্তিটি না কি ভবিষ্যতে চৌধুরী-কন্যার শ্বশুর হইবেন। কথাটা গোপালের বিশ্বাসও হইল ভালও লাগিল। সম্প্রতি রায়বাড়ীর বিবাহে আইবুড়ভাত লইয়া গিয়া সে রায়েদের ঐশ্বর্য্য, বদান্যতা প্রভৃতি

দেখিয়া আসিয়াছিল, আহার্য্য এবং বিদায় ভালই পাইয়াছিল। বাড়ীর বড়বাবুর মেজাজও অসাধারণ ভাল, তাহাও লোকমুখে তার জানা আছে। তার দিদিমণি যদি সে বাড়ীর বউ হয় তো অন্যায় হইবে না। কিন্তু এখন দিদিমণিকে একবার দেখা যায় কেমন করিয়া? আর কি বাবু তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিবেন?

বাড়ীর আশেপাশে চোরের মত লুকাইয়া ফেরাই যে তার পক্ষে সবচেয়ে বিরুদ্ধ প্রমাণ দাঁড়াইয়াছিল, সে কথা ভুলিয়া গিয়া সে আবার সেই দুষ্কার্য্যই করিতে লাগিল, ও শেষে এক দিন পুরাতন মনিব বাড়ী মরিয়া হইয়া ঢুকিয়া পড়িতেও ছাড়িল না। দ্বারবান মাধোসিং তখন ফটকের পাশের কুঠরীতে আটা মাখিয়া মোটা মোটা লিট্টী পাকাইতে পাকাইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিল—

"তুলসীদাস হরি-চন্দন রগড়ে, পূজা করত রঘুবীর।"

গোপাল এই চৌগোঁপ্পা সরযূ-পারীর কঠিন দৃষ্টি হইতে নিজের শীর্ণ ও খর্ব্ব আকৃতিটা গোপন করিবার উপায় না দেখিয়া কাঁচুমাচু মুখে দুই হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে তাহারই শরণাপন্ন হইল।

"ভাল আছ ত বাবা, দারোয়ানজি! মেজাজ খুস্‌ হায়?"

"হ্যাঁ—অ্যাঁ—কাহে নেই?—কিসিকে নেহি চোরী কিয়া—কিসিকে নেহি অপচা কিয়া; কোই হামারে তক্‌লিব দে' শক্কে?"

গোপাল চোরের অধম হইয়া গেল। সব কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়া বিমূঢ় হইয়া রহিল, পরে আবার ধসিয়া পড়া শরীর মনকে একটুখানি গুছাইয়া লইয়া ক্রন্দনের সুরে আরম্ভ করিল, "দারোয়ানজী বাবা! হামার খোঁকি দিদিমণিকে একবার বুলিয়ে দেবে বাবা? বাবা! তোমার কাছে হামি জন্মের মতন কেনা হয়ে থাকবো, বাবা! একবারটি তোকে বুলিয়ে দাও।"

মাধোসিং গঞ্জিকাপ্রসাদাৎ রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি অগ্নিতপ্ত লোহার ভাঁটার মত পাকাইয়া গোপালের দিকে ছুড়িয়া মারিল, বজ্রনির্ঘোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, "কেঁ্য ও! চোট্টাকে সাথ ম্যয়কো খামিন্‌কা লেড়কীকো মিল্‌নে দেঙ্গে?"

আরও কোন কোন কথা সে বলিত, কিন্তু ক্রোধাতিশয্যে কথা বাহির না হইয়া তাহাকে অকস্মাৎ স্প্রিংয়ের মতন ছিটকাইয়া তুলিল, প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া গোপালের পাঁকাটির মত সরু গলাটা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে সে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া গর্জ্জনস্বরে কহিল, "নিকালো শালে! হারামজাদ! ফিন্ ডেরামে আগ্ ফুঁকনে আয়া! বেহায়া, বদমাস! নিকালো।"

"দিদিমণি রে! আর তোকে দেখতে পেলাম না—"বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কারাবাসক্লেশে অর্দ্ধমৃত অনাহারী গোপাল সবেগে ফটকের বাহিরে পড়িতে পড়িতে না পড়িয়া হঠাৎ কেমন করিয়া যে আটকাইয়া গেল, প্রথমে না বুঝিলেও পরক্ষণে দেখা গেল—একটি সুরূপ কিশোরের সহিত মাধোসিংহের সমপদস্থ এক ব্যক্তি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; গোপাল তার গায়ের উপর পড়িয়া মাটীতে পড়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। গোপাল চিনিল, সে ভুবন বাবুর দ্বারবান্—গিরধারদাস চৌবে।

এদিকে ইতোমধ্যে আর একটা কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। গোপালের আর্ত্তনাদ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠে নিযুক্তা সুলেখার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, ধাতুরূপ বন্ধ করিয়া সে কশাহত জানোয়ারের মত তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, "নিশ্চয় গোপালদা'—সে এসেছে, কিন্তু আবার কি মাধোসিং তাকে মারছে!"—

সুলেখা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিল—"মাধোসিং! মাধোসিং! তোম্ উসকো জান লেনে চাহ্‌তা হ্যায় কেয়া?"

"ম্যয়কো কুছ্ কশোর নেহি হ্যায় দিদিসাহাব! হুজুরকা হুকুম ফিন্ কোভি উ দাগাবাজ আদমী কোঠীকো মাইল ভরমে আনে নেই শকে—ম্যয় তো তাঁবেদার হ্যায়।"

"গোপালদা'! গোপালদা'! তুমি আমার কাছে এসেছ? আহা গো! তুমি কি রোগাই হয়ে গেছ!"

বিগলিত করুণার জাহ্নবী-ধারা ঢালিয়া দিয়া সুলেখা গোপালের দিকে চোখ ফিরাইতেই তার করুণা-কাতর দৃষ্টি বিস্ময়-রেখায় ভরিয়া উঠিল, শুধু তো গোপাল দা'ই নয়; আরও যে কাহারা দাঁড়াইয়া আছে। আবেগ কম্পিতস্বরে গোপাল ডাকিয়া উঠিল, "দিদিমনিরে আমার, আবার তোকে দেখলুম!"

সুলেখার সোচ্ছ্বাস আনন্দের অভিব্যক্তি তার সম্মুখবর্ত্তী বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টি, কিশোরের সান্নিধ্যে পাইতেছিল। সে চিনিল, এ সেই ছেলেদেরই একজন—যারা সে দিন মাত্র তার বাবার হুকুমে বাজপেয়ীর হাতের বেত খাইয়াছে, বিস্মিত হইল, এখানে আবার ও কি জন্য আসিল?

"গোপালদা! এস, তোমায় খেতে দিই গে"—বলিয়া সে গোপালের হাত ধরিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সুশীলের অত্যন্ত লোভ হইতে থাকিলেও সে তার সম্মান-রক্ষাকর্ত্রীকে কৃতজ্ঞতার একটি কথাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, বলিতে লজ্জা বোধ হইল।

বিপ্রদাস বাবু দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিয়া আলবোলার নল টানিতেছিলেন, এক জন দাসী তাঁর মাংসবহুল পদযুগল টিপিয়া দিতেছিল, তাহাকে তাঁর স্ত্রীকে ডাকিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণী সত্যবতীর বয়স বিপ্রদাস বাবুর চেয়ে বেশ একটু কম, আকৃতি অনেকটা সুলেখারই মত; প্রকৃতিতেও তার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া

যায় ; তবে সে শিশু, ইনি পরিণতবয়স্কা জমিদারগৃহিণী এবং দুর্দ্দান্ত স্বামীর স্ত্রী।

দাসী বিদায় লইলে বিপ্রদাস কহিলেন, "তোমায় বাড়ী পোড়ানর ব্যাপারটা সব বলেছিলেম না ? আজ ভুবন বাবু যে তাঁর ছেলেকে ক্ষমা চাইতে পাঠিয়েছিলেন।"

সত্যবতী একটুখানি চঞ্চলভাবে স্বামীর দিকে বারেক চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওঃ—"

বিপ্রদাস কহিলেন, "খাসা ছেলে!"

সত্যবতী মনের মধ্যে ঈষৎ বিস্মিতা হইলেও মুখে মৌনী রহিলেন, এ শব্দটা তিনি স্বামীর মুখে আর কখন শুনিয়াছেন কিনা, বোধ করি, সেই কথাটা ভাবিতেছিলেন।

বিপ্রদাসের আজ বোধ করি মনোবীণা খুব উচ্চ সুরেই বাঁধা ছিল, আপনার চিন্তাধারাই অনুবর্ত্তন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভুবন বাবুর ঢের রোজগার, কলকাতায় অনেকগুলো ভাড়াটে বাড়ী—কারবারও খুব ফালাও, ঐ একটা ছেলে, ছেলেটিও দেখতে ভাল, লেখাপড়াও মন্দ করছে না,—কি বল ?—মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না কি ?"

সত্যবতী চকিত হইয়া উঠিলেন, "এখন ?"

বিপ্রদাস কহিলেন, "যখন হোক, পছন্দ কি না ?"

"ওদের লেখাকে যদি পছন্দ হয় তবে ত ?"

বিপ্রদাস বিজয়গর্ব্বে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পছন্দ হয় মানে ? ভুবন বাবু সে দিন স্থলি'কে দেখে পছন্দ করে গেছেন, বিয়ের কথা স্পষ্ট না লিখলেও ওর রূপের কথা, গুণের কথা আজকের চিঠিতে না হোক পাঁচ যায়গায় লিখেছেন, শেষে লিখেছেন, 'আ[illegible]র ছেলে যদি আজ এত বড় অপরাধে অপরাধী না হতো তা হলে—

যাক, মনে কত সাধ যায়—সবই কি আমরা মিটাবার সৌভাগ্য নিয়ে এসেছি।’—আর কি স্পষ্ট বল্‌বেন ?”

সত্যবতীর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইল, ক্ষণকাল নতমুখে থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন, “সে কথাও তো সত্যি, সুশীল যে কাজটা করেছে বড় হয়ে—”

“ডাকাতের সর্দ্দার হবে ? মোটেই তা’ নয়—”

বিপ্রদাস এবার হাহাশব্দে হাসিয়া উঠিলেন—“ছেলেটির অতি নধর-কান্তি, নম্রমূর্ত্তি, সে এ কাজের যোগ্যই নয় ! আমি বোকা নই ; ভুবন বাবু না বল্লেও বুঝেছি ও জেরা ক’রে বা’র করেছি, আগুন দে’বার পরামর্শ এবং দেওয়া সুশীলের নয়, শুভেন্দুর—ওঁর এক বন্ধুর ছেলের, সুশীল সঙ্গে ছিল। আর যদি দিয়েও থাকে, ছোট বেলায় কত ছেলে কত কাণ্ডই করে। সবাই তো আর তোমার এবং ভুবনের মতন ধর্ম্মধ্বজ ও ধর্ম্মধ্বজী নয় ! ও সব কি ধর্ত্তব্য ?”

একটু থামিয়া মৃদুহাস্যের সহিত পুনশ্চ কহিলেন, “ধর—এই আমিই ওর বয়সে কারু ঘরে আগুন না দিয়ে থাকি, একবার সংস্কৃত পণ্ডিতের টিকিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম, আর একটু হলেই গো-হত্যা নয়, ব্রহ্মহত্যা হয়ে যেত। একবার না—যাক্ তা’ তোমার মত কি ? আমি তো মন ঠিক ক’রেই ফেলেছি—আমি যখন ডাকাত হই নি ও-ও হবে না।”

সত্যবতী মনে মনে বলিলেন, “তুমি ডাকাতের চাইতে কমই বা কি ?” প্রকাশ্যে বলিলেন, “দেখ, যা ভাল হয়, তা ওরা এখন তো বিয়ে দিতে চাইবে না ? লেখা এখন বড্ড ছোট।”

“এখন দে’বার কথা হচ্ছে না”—বলিয়া বিপ্রদাস গম্ভীর মুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা তাঁর পক্ষে এই

যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে, মেয়েমানুষের সঙ্গে বেশী কথা কওয়া নিজেকে খেলো করা এই তাঁর বিশ্বাস। তাঁহাকে একটু প্রসন্ন বোধ করিয়া সত্যবতী এই সঙ্গে একটী আরজী পেশ করিয়া বসিলেন, হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "লেখা তো গোপালের জন্যে বড্ড কান্নাকাটি করছে, সে যখন দোষী নয়, তখন তাকে বাড়ীতে রাখায় কি আপত্যি আছে?"

বিপ্রদাসের মুখ প্রবিষ্ট আলবোলার নল বিবর নির্গত সর্পমুখের ন্যায় সবেগে বাহির হইয়া আসিল, ধূমধারা গুম্ফরাজীর মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িল, মনে হইল যেন, গভীর বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গম্ভীর ও অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন, "সে হারামজাদা কি আমার বাড়ীতে ঢুক্‌তে পেয়েছে না কি?—নাঃ, সুলুটা বড় জ্বালালে দেখছি!"

সত্যবতী ভয় পাইয়া নামের মর্য্যাদারক্ষায় সমর্থা হইলেন না, 'ইতি গজ' করিয়া বলিলেন, "আসার কথা নয়, যদি আসতে মত দাও, তাই বল্‌ছিলাম, সে ত আর দোষী নয়।"

"দোষী নয়? বল কি তুমি? সে আমায় জব্দ করবে ব'লে মুখের উপর শাসিয়ে যায় নি? তার পর এই যে দণ্ড না পেয়ে ফিরে এলো, এতে কি ওর কম আস্কারা বাড়লো মনে কর? ব্যাটার ধরাকে এখন সরা জ্ঞান হবে না! আর ওর দেখাদেখি সব লোকজন বিগ্‌ড়ে যাবে না! ওকে আমার বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে যেন আস্‌তে দেওয়া না হয়, আমি মাধোসিংকে বলে দিয়েছিলাম—এই কে আছিস্?"

সত্যবতী তাড়াতাড়ি অন্যপথে সরিয়া পড়িলেন ও যেখানে সুলেখা আপনি বসিয়া বহুদিনের অভুক্ত গোপালকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতেছিল, সেইখানে গিয়া অগত্যাই তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিতে হইল। সুলেখার চোখ দিয়া অমনই টপ টপ করিয়া জলের

ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু গোপাল এ সংবাদে বিচলিত হইল না ; সুলেখাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "কাঁদিস্ নে' দিদিমণি ! আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, তোর শ্বশুর তাঁর দরওয়ানকে দিয়ে আমায় তাঁর বাড়ীতে থাকবার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন, বলেছেন, কল্‌কেতায় নিয়ে যাবেন। দুদিন দেখা হবে না বটে, আবার তুই ভাই, সেই ঘরই তো চিরদিন ধরে কর্‌বি।"

মুখ তুলিয়া সত্যবতীর কৌতুক-স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "খাসা মানুষ মা, আমার দিদিমণির শ্বশুর—দেবতুল্যি লোক ! জেলখানায় গিয়ে আমার মতন ছোট লোকের গায়ে হাত দিয়ে কি আদরটাই না করা। যেমন আমার সীতাদেবী দিদিমণি, তেমনি রাজা দশরথের মতন শ্বশুর হবে।"

সত্যবতী প্রীতি আনন্দে সস্নেহ-নেত্রে কন্যার দিকে চাহিলেন, মন্দ নয়, ইহারই মধ্যে সংবাদটা ছুটিয়াছে ত অনেক দূর ! তা' কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়, সুলেখার পিতা যদি ভুবন বাবুকে বৈবাহিক করেন, তবে তাঁর জীবনে অন্ততঃ একটাও ভাল কাজ করা হইবে।

সুলেখা অশ্রুভরা দুই চোখে রোষের বাণ ভরিয়া গোপালের দিকে সন্ধানপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "বড্ড দুষ্টু হয়ে এসেছ তুমি !"

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি যত না হোক, বাইবেল ও যিশুর গান শিক্ষার উন্নতি মন্দ হইল না। মিসেস্ গুঁই বা মিস্ হর্ণের কিন্তু কিছুতেই মনঃপুত হইল না। মিসেস্ গুঁইএর ক্লাসে প্রথমেই প্রার্থনা-গান—তার পর প্রার্থনা, তার পর বাইবেলের "বুক অফ দানিয়েল", "জেনিসিস্ সামুয়েল"—এম্‌নি কোন না কোন একটা কিছু পড়া। তার পর হাতের লেখায়ও সেই বাইবেল, ডিক্‌টেশন দিলে সেও বাইবেল, ইংরাজী হপ্তায় দুই দিন তাও ওল্ড টেষ্টমেণ্ট ছত্র কতক। বাকী রহিল অঙ্ক ও সেলাই, ও দুইটার মধ্যে নাকি বাইবেল গুঁজিয়া দেওয়া যায় না, তাই ও দুটাকে এই বাইবেলময় স্কুলে সঙ্কুচিত রাখা হইয়াছে। তবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ রীড্ নীলিমার সৌভাগ্য-বশতঃ তাকে একটু সুনজরে দেখিয়া হপ্তায় এক দিন উচ্চশিক্ষা দিতে চাহেন, ঘর হইতে উপকরণ যখন সে আনিতে পারিল না, অগত্যাই তিনি কিছু কিছু রেশমী সূতা ও কাপড় তাকে দিলেন এবং ইংরাজীর ভারটাও নিলেন, তবে সে ইংরাজীও বাইবেল সম্বন্ধীয়, ইহা বলাই বাহুল্য। ছাত্রীদিগের অণুতে পরমাণুতে এইরূপে বাইবেল এবং যিশু-প্রেম ইন্‌জেক্ট করিয়া দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, এবং তপ্তলৌহের তরলসারে পরিপূর্ণ বীভৎস কুম্ভীরময় কুম্ভীপাকের হস্ত হইতে অনন্তমুক্তি প্রদানে উহাদিগকেও ধন্য করিতে চাহিলেন।

নীলিমা ক্লাসের কাহারও চেয়ে এই আত্ম-রক্ষা কার্য্যে মনো-যোগিনী না হইয়াও শিক্ষয়িত্রীদের ভৎ‌সনা লাভ করিতেছিল। মিস্ হর্ণ

এক দিন প্রশ্ন করিলেন, "আই হোপ, ইউ লাইক দি সাম্‌স্? (আমি আশা করি, Psalms তোমার ভাল লাগে)?

নীলিমা ভয়ে ভয়ে জানাইল "লাগে না।"

"নো!—ওহ্ হাউ শক!" (না? উঃ কি ভয়ানক!) মিস্ হর্ণ চোখ কপালে তুলিয়া বক্ষে ক্রশ চিহ্নে দেহশুদ্ধি করিলেন।

মিসেস গুঁই মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই! তোরা সব পুতুলদের ভক্তি করিস? ওদের দেবতা মনে করিস?"

সব মেয়েই প্রায় ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া থাকিল, চুপকরা যখন অচল হইল, তখন সত্যকে অস্বীকার করিয়া বলিল, "নেহি মান্‌তে হৈ, পহিলে মান্‌তে থি, লেকিন্ আব হিতো কেবল যেশুকো প্রেম কর্‌তে হেঁ।"

মিসেস্ গুঁই প্রীতিকটাক্ষ করিয়া সন্তুষ্টভাবে কহিলেন, "উহে ঠিক কাম করতে হেঁ, তোম লোগ্‌কা আত্মা নরক সে বাঁচ্ গিয়া।"

শুনিয়া মেয়েরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মিসেস্ গুঁই তখন কোটরবাসী চোখ দুইটাতে ঠেলা দিয়া কটমট করিয়া নীলিমার দিকে চাহিলেন—"তোমার বুঝি ও কথা বলবার সাধ্য হলো না? তুমি বুঝি এখনও পুতুলের পা ধোয়াচ্চো?"

এই সময়ের জন্যই নীলিমা প্রতীক্ষা করিয়াছিল। সম্বোধিত হইয়া বুকটা তার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। কথা কহিল না।

মিসেস্ গুঁইএর হয় ত বিশ্বাস তাঁর নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীদের আত্মার চাইতে ব্রাহ্মণকন্যা নীলিমার আত্মার বাজারদর বেশী, সেই জন্যই বোধ করি, উহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তাঁর আগ্রহটাও সমধিক ছিল, নীলিমাকে যে উঠিতে বসিতে যিশু-প্রেম শিক্ষা দিয়াও ফল এমন অফলা [illegible] করিতেই মন খারাপ হইয়া, মূর্ত্তিও ভীষণ হইয়া উঠিল।

[illegible] সেম্! নেলি! ফর্ সেম্!—ঈশ্বর তোমায় আমাদেরই সঙ্গে

এক রকমেরই মানুষের চেহারা দিয়েছেন, দেন্‌নি? বয়সও তোমার কাঁচা, ইচ্ছা করলে এখনও তুমি তাঁর নিজের ভেড়ার-ছেনা হ'তে পারতে, কিন্তু তা' না করে, কি লজ্জার বিষয় যে, তুমি শয়তানকে আত্মবিক্রয় করে রেখে দিলে। ঈশ্বরের পুত্রকে শরণ না নিয়ে পুতুলের কাছে নিলে। বাড়ী গিয়ে বাঁ পায়ের লাথি দিয়ে দেখ দেখি, তোমার পূজো করা সেই পুতুলগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠে তোমায় উল্টো লাথি মারতে পারে কি না! * তা যদি না পারে, তবে সে তোমায় অনন্ত নরক থেকে মুক্তি দিতে পারবে?"

নীলিমার চোখে সহজে জল আসে না, আসিলেও ঝরিয়া পড়ে না, কিন্তু আজ তার চোখের জল চোখের মধ্যে ধরা রহিল না। কিন্তু ফল ভাল হইবে না বুঝিয়া অশ্রু সংযত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল।

চোখের জল কিন্তু গোপন ছিল না এবং দ্রষ্টার মনের অঙ্গে তাহা বোধ করি বিছার মত হুল ফুটাইয়া দিয়াছিল। মিসেস গুঁই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ নেলি! এত দিন এত শিক্ষা পেয়ে তুমি পুতুলের শোকে কেঁদে ফেল্লে।—কি ভয়ানক!—কি লজ্জা!—কি ঘেন্না! কোথায় আজ প্রভু যীশুর প্রেমে তোমার চোখে প্রেমের ধারা বইবে, তোমার স্বর্গের আলোক হাস্‌তে থাকবে, তোমার আত্মা অনন্তকালের জন্য যীশুর আশ্রয়ে পরিত্রাণ লাভ করবে, তা' না হয়ে নুলো জগন্নাথ, জিব-বারকরা ন্যাংটা কালী, হাতীমুখো গণেশ, মনে করতেও গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে—সেইগুলোর শোকে তুমি চোখে সরষে-ফুল দেখছো? এই মেয়েরা! তোরা আর এর সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসবিনে; ওর সঙ্গে কথা ক'বিনে; ওর দিকে কেউ

---

* এই ঘটনা'টি কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে।

তাকাবিনে, ওর আত্মা নরকের দোর গোড়ায় পৌঁচেছে। সেখানে ওর আত্মা কীট-পতঙ্গের আহার হয়েছে—সেখানে ওর আত্মা সংসারের যাবতীয় পাপের ভারে ভারী হয়ে যত কিছু ময়লা জিনিষের মধ্যে ডুবে গেছে। সেখানে ওর আত্মা আগুনের হাপরে যেমন গলান লোহা ঢেউ খেলতে থাকে, তেমন ধারা গরম লোহার চৌবাচ্চায় প'ড়ে জ্ব'লে যাচ্ছে—জ্ব'লে যাচ্ছে—জ্ব'লে যাচ্ছে!"

নীলিমার ঠোঁট ফুলিতে লাগিল, বুক ঠেলিতে লাগিল, চোখ ফাটিতে লাগিল, মনে হইল, বাস্তবিকই যেন তার উক্তবিধ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে! তার আত্মা (সেটা যে কোথায় আছে, না জানিলেও) যেন হাঙ্গরে চিবাইয়া, কুমীরে গিলিয়া, জোঁকেরা চুষিয়া, পতঙ্গে কুরিয়া খাইতেছে। গরম লোহা তরল অগ্নির মতই যেন তার সমস্ত শরীরকে পোড়াইয়া দিতেছে, অথচ ছাই করিতে পারিতেছে না! নীলিমা হাঁপাইতে লাগিল, তার হাত পায়ের তলা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া প্রবল কম্পন দেখা দিল, সে পতনোন্মুখ হইল।

মিসেস গুঁই তীব্রদৃষ্টিতে বোধ করি সেই তরল অগ্নিরই একটা ঝাপটা মারিতে চাহিয়া সতেজে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "সেই গলা আগুনে প'ড়ে দুষ্টাত্মা কর্ণে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; চক্ষুতে দেখবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করবে না, চীৎকার ক'রে ডাকলেও কেউ আসবে না। আবার এর চেয়েও ভীষণ দণ্ড পাবে—যখন ঐ আগুনের কুণ্ড হ'তে তুলে পচা গন্ধময় পুকুরে ঠেলে ফেলা হবে। তখন চীৎকার ক'রে উঠলে সেই পচা ময়লা থেকে সুইস্রটা ভীষণাকার কৃমিকীট কিল্‌কিল্ ক'রে মুখের মধ্যে—"

নীলিমার কানে শুনিবার, চোখে দেখিবার শক্তি সত্যই লোপ পাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ পরে, সে কতকটা আত্মস্থ হইয়া, চোখ মেলিয়া দেখিল—তার ক্লাসের মেয়েরা ত বটেই, অন্যান্য ক্লাসের মেয়েরাও ক্লাস

ছাড়িয়া জমা হইয়াছে। মিস হর্ণ আসিয়া নিতান্ত সকরুণভাবে দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে "হাউ সকিং!" "হোয়াট এ পীটি!" ইত্যাদি আপশোষ জানাইতেছেন। নীলিমার চক্ষু-কর্ণের এ সব দেখার অবসর ছিল না, মিসেস গুঁইর প্রকাণ্ড তামাটে মুখ ও কাংস্যরব দর্শন-শ্রবণেই সে আকৃষ্ট হইয়া রহিল।

উত্তপ্ত তরল লৌহ বুঝি একটুখানি জুড়াইয়া আসিয়াছিল। মিসেস গুঁই কিন্তু সমধিক শীতল হইয়াছিলেন। কিছু সংযতভাবে পাঠ করিলেন —"এবং সেই পরাজিত সকলেও করে, যাহাদের উপর আমার নাম ডাকা হইয়াছে। অতএব আমার বিচার এই, পরজাতীয়দিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, আমরা যেন তাহাদিগকে কষ্ট না দিই, কিন্তু তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাই, যেন তাহারা প্রতিমা-ঘটিত অশুচিতা হইতে, ব্যভিচার হইতে গলা টিপিয়া মারা প্রাণী হইতে এবং রক্ত হইতে স্বতন্ত্র থাকে।"

"নেলি? নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছ ত? আজ সারা রাত্রি ধ'রে অনুতাপ ক'রে পাপ ক্ষালন কর গে'। পবিত্রাত্মার কাছে ঐ পশু হৃদয়ের বদলে একটি মানুষের হৃদয় প্রার্থনা ক'রে খুব চোখের জল ফেল গে'। কি বল্‌বো—তুমি আমাদের বোর্ডিংএর মেয়ে নও, তা হ'লে একদিনেই তোমায় আমি ঠিক করে নিতুম। না খেয়ে ঘরে বন্ধ থাকলে আর শাস্তির কথা শুনলে পুতুল পূজো বের হয়ে যেত!"

সকলের তীব্র ও অনেকেরই ঘৃণাপূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টির মধ্য দিয়া ভীত, কম্পিত, সঙ্কুচিত নীলিমা বাহিরে আসিয়া আর্ত্তশ্বাস গ্রহণ করিল। ভয়টা অবশ্য গুঁই-হর্ণের উদ্দেশ্যে, অথবা তাঁদের বর্ণিত নরকযন্ত্রণার ভবিষ্য-আতঙ্কে, না বুঝিলেও মনে হইতে লাগিল, সে গিয়াছে, জন্মের মত অনন্তকালের মতই নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

ক্লাসের মেয়েরা ছুটির পূর্ব্বেকার প্রার্থনা-গান গাহিতেছিল—

"ইশ-মশি মেরা প্রাণ বাঁচাইও"—

এই প্রার্থনার সঙ্গে তার ভয়ার্ত্তচিত্ত ঐ গান সপ্তস্বরে গাহিয়া উঠিল—মর্ম্মের ভিতর হইতে ভীত ত্রস্ত ব্যাকুলচিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলিতে লাগিল—"ইশ-মশি মেরা প্রাণ বাঁচাইও—প্রাণ বাঁচাইও—প্রাণ বাঁচাইও।"

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিবার মুখে সারা পথ নীলিমা ভাবিতে ভাবিতে আসিল বাড়ী ফিরিয়াই মা'র কাছে জানিয়া লইবে, খ্রীষ্টধর্ম্মের চেয়ে হিন্দুধর্ম্ম বড় কি ছোট? খ্রীষ্টান না হইয়া মানুষকে অত্যন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কি হয় না! মিসেস্ গুঁই বিদায়কালেও বলিয়া দিয়াছেন—মিস্ হর্ণ নিশ্চিত বিশ্বাসে পিঠ চাপড়াইয়াছেন—কা'ল তাঁরা নিশ্চিত তাকে 'গুড বিলিভার' দেখিতে পাইবেন। অসহ্য অশিক্ষিত ষাঁড়ে চড়া মহাদেব, ঠুঁটো জগন্নাথ, কুচরিত্র কৃষ্ণ, উলাঙ্গিনী কালী এদের প্রতি ভক্তি ছাড়িয়া 'সেভিয়ারের' শরণাপন্ন হইলেই যখন তার দীন-আত্মা অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারে তখন নিজের ক্ষুধিত আত্মাকে সেই অনায়াস সাধ্য সুধাপাত্র কেনই বা সে পান করাইবে না? এ'না করিলে তার পাপ অন্যান্য 'হীদেন'-এর চেয়ে কোটি গুণ বেশী হইবে, যীশু যে 'খ্রীষ্ট' এবং তিনিই যে একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র এবং সকলের ত্রাণকর্ত্তা, সে সম্বন্ধে নীলিমাকে বিশেষভাবে জ্ঞানদান করা হইয়াছে। নীলিমা জানে, পিতৃ-পুরুষ দায়ূদ প্রবাচক ছিলেন এবং ঈশ্বর দিব্য-পূর্ব্বক তাঁর কাছে শপথ

করিয়াছিলেন, তাঁর ঔরসজাত একজনকে তাঁর সিংহাসনে বসাইবেন, এই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া খৃষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে এই কথা কহিলেন যে, 'তাঁহাকে পাতালে ফেলিয়া রাখা হইল না, তাঁর মাংসও ক্ষয় পাইল না, এই যীশুকে ঈশ্বর উঠাইলেন, আমরা সকলে এ বিষয় সাক্ষী। অতএব ঈশ্বরের দক্ষিণহস্ত দ্বারা উন্নীত হওয়াতে এবং পিতার কাছে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা তিনি বর্ষণ করিলেন। কারণ, দায়ুদ স্বর্গে আরোহণ করেন নাই ; কিন্তু তিনি নিজেই প্রভুকে বলিলেন, 'তুমি আমার দক্ষিণে উপবেশন কর, যে পর্য্যন্ত আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার চরণের পদাসন না করি।' অতএব সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকেই ঈশ্বর প্রভু-খৃষ্ট উভয়ই করিয়াছেন।'

মিস্ হর্ণ শাম্পানের কাছে আসিয়া কহিলেন, "পাপবিমোচনার্থ প্রত্যেকে যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও ; তাহাতে তোমরা পবিত্র আত্মাদান প্রাপ্ত হইবে।"

নীলিমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া এই কথার প্রতিধ্বনি ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল। সুখসেব্য স্বর্গবাস যদি ইহাতে ঘটে, তবে কেনই বা সে "যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ" না হইবে ?

নীলিমার মায়ের মুখ মনে পড়িল, মা যদি শোনেন অত বড় বিপাকের মধ্যে তাকে ডুবিতে হইবে তবে কি তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন ? নিশ্চয়ই তাকে খৃষ্টান হইবার অনুমতি দিবেনই। মা'র কাছে পৌঁছিতে সমস্ত মনপ্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠিল। অথচ কি মন্থর গতি ওই বুড়া বলদ দুইটার পায়ে, আর সেণ্টপিটার্স মিশন স্কুল হইতে নীলিমাদের বাড়ীর রাস্তাটাও কি তেমনই দীর্ঘ !

কিন্তু এ কি ! নীলিমার সকল ব্যগ্রতাই যে ঘোর নৈরাশ্যের তীরে

আছাড় খাইয়া পড়িল।—অসময়ে মায়ের ভাঁড়ার ঘরে পিতার কণ্ঠের সাড়া আসিতেছে কেন? নীলিমা সহসা নিজের অনন্ত নরকযন্ত্রণার ভয়াবহতা বিস্মৃত হইয়া মায়ের সমাগত বিপৎপাতের কল্পনায় শুষ্ক হইয়া গেল। নীলিমা স্রোতোহত পুষ্পগুচ্ছের মত নিশ্চল হইয়া রহিল এবং শুনিতে পাইল।

"বল কি, ছোঁড়াটাকে ত আজ বছর চারেক হ'তে চল্লো ভুবোন রায় পুষছে, থাকবার মধ্যে তুমি আর তোমার মেয়ে, আমার কথা ছেড়েই রাখ, আমি ক'টাই বা ভাত মুখে দিই, রাত্রে তো গোণা সাতখানা রুটির বেশী যদি কখনও নিই তো বড় জোর—দু'খানা—ঐতেই তোমার মাসকাবারের দু দিন আগে চাল, গম, নুণ, আলু স-ব ফুরিয়ে গেল! কি হয় বল তো?"

নীলিমা মায়ের মুখ হইতে এই রূঢ় প্রশ্নের কোন উত্তর শুনিতে পাইল না। অপ্রাপ্ত উত্তরের জন্য ক্ষণকাল সময়ক্ষেপ করিয়া পিতাই পুনশ্চ আরম্ভ করিলেন—"নিশ্চয়ই চাল-টাল নিয়ে কিছু করা হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই কোন কিছু হয়।—না হ'লে—বলি, দুটো মানুষের পেটে তো আর রাক্ষস ঢোকেনি—যায় কোথায়? ভাল কথা—ধোপার হিসেবে যে এবার দেখছি সাতখানা ধুতী লিখেছ, আবার বেলাউস একখানা রয়েছে, তার মানে কি? এক ধোপে তিন তিনখানা ধুতী প'রে বাহারটা দিলেন কে শুনি? বেলাউসটি কার?—তোমার না কি?"

নীলিমার বুক ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল, শেষ কথা কয়টা তার মা'র উদ্দেশ্যে যে সুরে উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে তার মনে মা'র জন্য দারুণ একটা অপমানের আঘাত লাগিল। চিরসহিষ্ণুশীলা সর্ব্বত্যাগিনী মায়ের প্রতি এ শ্লেষ একান্তই অশোভন! অথচ তার বাবা জানেন, এ ব্লাউস কার!

এবারও স্বর্ণলতার নিকট হইতে কোন কৈফিয়ৎ আদায় করা গেল না। তিনি যথাপূর্ব্ব মৌনীই রহিলেন—নীলিমা অর্দ্ধমুক্ত দ্বারপথে তাঁর নির্ব্বাক প্রস্তরমূর্ত্তির একটা অস্পষ্ট আভাস দেখিতে পাইতেছিল, তাঁর পাতলা ও শুষ্ক ঠোঁট দুখানি পরস্পরে এমনই আঁটিয়া রহিয়াছে, মনে হয়, বুঝি বাটালীর চাড় না দিলে এ জন্মে খুলিবে না। নীলিমা কণ্ঠোত্থিত গভীর দীর্ঘশ্বাস সাবধানে নিরোধপূর্ব্বক সরিয়া গেল।

শুনা যায়, 'বোবার নাকি শত্রু নাই!'—কিন্তু সব ক্ষেত্রে ঐ প্রবচনটি খাটে না, স্বর্ণলতার সহিষ্ণুতাপূর্ণ মৌনতার সকল সম্মান তুচ্ছ করিয়া অনুকূলচন্দ্রের হিংস্র কণ্ঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত উচ্চারিত হইল—"বল না গো? কথা কওনা কেন?—বল? কোন্ রাণীধীরাণী মহারাণীর ধোপে দু'খানা কাপড়ে কুলোয় না? আবার বেলাউস পরে ঠমক দে'বার দরকার হয় কার? এত যাঁর সখ, তাঁকে বলো, নিজে যেন গিয়ে তিনি টাকা রোজগার ক'রে আনেন। বাবা শালা তো চোর দায়ে ধরা পড়ে নি, বার মাস পাতর পাতর ভাত জোগাবে, কাপড় জোগাবে, জামা-জোড়া জোগাবে, ইস্তক তার কাচাই জোগাবে! তিনখানা কাপড় কেন পরা হয়েছিল শুনি? বেলাউসই বা জুটলো কোত্থেকে?"

স্বর্ণলতার প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তির পরস্পর সংযুক্ত ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইল। উত্তর বাহির হইল—"স্কুলে প্রাইজের দিন প'রবে বলে একখানা আধময়লা তোলা সাড়ী কাচিয়ে নিয়েছিলেম।"

"বিবি-সাহেবার জন্যে? তাই বল! তা' সেজে গুজে পরীটি হয়ে তিনি তো দিব্যিই ইস্কুল-ঘর করচেন, একটা বরও তো জোগাড় করবার নাম নেই!—কি হলো তা'হলে, তাঁকে এতদিন ধ'রে লেখাপড়া শিখিয়ে লায়েক ক'রে—যদি নিজের একটা হিল্লে লাগিয়ে নিতেই না পারলেন?"

নীলিমার পায়ের আঙ্গুলের ডগা হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত

অকথ্য লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। শরীর রক্তে সেই অসহ্য লজ্জার জ্বালা যেন আগুন হইয়া ধোঁয়াইতে লাগিল, দাঁত দিয়া সে এমন জোরে ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল, তাহাতে ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িল।

মায়ের মুখ দেখিতে পাইল না কিন্তু তিনি যে এত বড় নির্লজ্জ অপমানেরও এতটুকু প্রতিবাদ করিলেন না, ইহাতে বাপের চেয়ে মায়ের প্রতি ক্রোধ জন্মিল।—এ কি অন্যায় নীরবতা! সংসারে স্বামীই সব? —মেয়ে কেউ নয়?—বাপ হইয়া মেয়েকে এমন দুরন্ত অপমানটা করিলেন; অথচ এর প্রতিবাদ করিবার জন্য একটিমাত্র জিহ্বাও নড়িল না? নীলিমা না হয় মেয়ে হইবার অপরাধে এও সহ্য করিবে, কিন্তু মায়ের উচিত ছিল না তার হইয়া দুইটা কথা বলা?—তবে কি মা'ও তাকে যথেষ্ট ভালবাসেন না? তাই বা কেমন করিয়া বলা যায়?—মা তো নিজের পক্ষেও অপমানের চূড়ান্ত হইয়া মুখ খোলেন না?—তবে কি মিসেস গুঁইএর কথাই ঠিক? তিনি যে বলেন, 'হিঁদুর মেয়েরা কেবল লাথি-ঝাঁটা খাবার জন্যেই জন্মেছে!—তারা ক্রীতদাসীর চাইতেও অধম, পালিত পশুর চেয়ে অধীন এবং পোষা কুকুর হতেও লাথীখেকো!' মিথ্যাই বা কি?—তার মায়ের যে অবস্থা তাঁর বর্ণিত বিষয় হইতে বিশেষ তফাৎ কি? এই হিন্দু মেয়ের জীবন? জীবন্তেই তো তাদের নরকের দ্বারে বসিয়া কাটাইতে হয়, মরণের পরে যে নরকে যাইবে সে আর বিচিত্র কি?

ঘরের মধ্য হইতে অনুকূলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"দেখ, ও সব নবাবী আমার ভাত খেয়ে চল্‌বে না, তা' তোমাদি'গে বলে দিচ্চি—এক ধোপে তিন তিনখানা কাপড় কাচান? আমার বাপ কখন এমন কথা শোনেনি! তা আবার একটা ধুম্বোবুড়ী মেয়ের জন্যে?—গিছি আর কি। এবার থেকে খারে কাচবে, ধোপা আসা চল্‌বে না আর।

আর দেখ, চালটালগুলো কম ক'রে খরচ করো, আমি কি তোমাদের জন্যে সিঁদকাঠি নিয়ে সিঁদ কাট্‌তে যাব নাকি? দাও দেখি এক গেলাস জল, কেমন যেন ক্ষিধে ক্ষিধে লাগছে; পেট ভরে জলটা খেয়ে যাই।"

নীলিমা ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গেল।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার মনে বিদ্রোহের ঝড় বহিতে লাগিল। মন পিতৃ-অবিচারের আঘাতে আঘাতে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্র হইয়া উঠিল। পূর্ব্বসঞ্চিত যতটুকু সম্বল—যতটুকু বিবেকবুদ্ধি জমা ছিল, সেই সামান্য পুঁজি লইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ প্রতিরোধচেষ্টা যে করে নাই, তা নয়; কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের অজস্র শরক্ষেপে সেই দুর্ব্বল প্রচেষ্টা তলাইয়া গেল। অবশেষে নিজের কাছে পরাস্ত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল, হিন্দুধর্ম্মে বস্তু নাই! হিন্দুধর্ম্মের উপাসকদের মধ্যটাও অসার। প্রমাণ তার বাপ-মা।—হিন্দু স্বামীর কর্ত্তব্যজ্ঞান যে কত বড় নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত আজন্ম ধরিয়াই দেখিতেছে, হিন্দুনারী যে পুরুষের হাতের কত অসার খেলার পুতুল, তাও একদিনের দেখা নয়। এই হিন্দুসমাজের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক? এই হিন্দু-পুরুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান, এই হিন্দু স্ত্রীর পতিব্রতা? হিন্দু হওয়ায় এই যদি ফল হয়, অমন হিন্দুত্বে জলাঞ্জলি দেওয়াই ভাল।—মায়ের যে জীবন সে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে, একটা পাশবদ্ধ জন্তুর জীবনের চাইতে তার কতটুকু প্রভেদ?

হিন্দু-সমাজের সকল পুরুষই কি তার পিতার মত হৃদয়হীন? সব নারীই কি তার মায়ের মত অত্যাচার-নিপীড়নে জড়পিণ্ডে পরিণতা?

এ কথা নীলিমার বিদ্রোহবিষে জর্জ্জরিত বিদ্বিষ্ট চিত্তে উদিত হয় নাই, তা নয়, কিন্তু এর সমাধান তার অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজিয়া পায় নাই। ঠাকুরমা ও বাপের অভদ্র আচরণে তাদের বাড়ী কোন ভদ্র-পরিবারের মেয়েদের আসা যাওয়া ছিল না। কোন বিশেষ বড় সমারোহ কার্য্যের নিমন্ত্রণ কদাচিৎ আসিলে লৌকিকতা দিবার ভয়ে অনুকূলচন্দ্র স্ত্রীকন্যাকে নিমন্ত্রণে পাঠাইতেন না। সহপাঠীদের বাড়ী সে বার দুই নিমন্ত্রণে গিয়াছে, সেইটুকুই তার হিন্দুসমাজের পরিচয়। সেখানেও সে খুব বেশী উন্নত ভাব প্রত্যক্ষ করে নাই। এ ভিন্ন বাড়ীর আশেপাশে হিন্দু নামধেয় অন্ত্যজাতীয় স্ত্রীপুরুষের কলহ-কাকলিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কতকটা বরং দেখিতে পায়। প্রকৃত হিন্দুর কি আচরণ, সে সবের কোন ধারণাই তার নাই। আজ সেইটুকু সঞ্চয় লইয়া হিন্দুনারীর অবস্থা, তাদের আচার-আচরণ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া সে কোন বড় জিনিষ খুঁজিয়া পাইল না। নিমন্ত্রণ-গৃহে হিন্দুনারীকে অপরের পাতে মাছের মুড়া পড়িতে দেখিয়া নিজেকে খর্ব্ব বোধে অভিমানভরে ছল ধরিয়া অভুক্ত উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছে; প্রতিবেসিনীর অঙ্গে অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য দেখিয়া নিজের কপালের ও অলঙ্কার প্রদানে অসমর্থ 'পোড়ামুখো-মিনষের' প্র তি গালিবর্ষণ করিতে শুনিয়াছে; নিমন্ত্রককে বস্ত্রালঙ্কারের জাঁকজমক দেখিয়া আদর আপ্যায়নের তারতম্য করিতে দেখিয়াছে; কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর বর্ষীয়সী পত্নীকে [illegible] প্রতিবেশিনী সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণার সহিত বলিতে শুনিয়াছে [illegible]াণী-ধ্যারাণীদের বউয়ের খবর আমি রাখিনে!" এই হিন্দু-সমাজ?—হিন্দুনারীর এই সঙ্কীর্ণতম শিক্ষা?—অথবা ইহা ভিন্ন তাদের উপায় বা কি? পুরুষ তাদের লৌহনিগড়নিবদ্ধ সেবাদাসী করিয়া রাখিয়াছে, কেমন করিয়া বিশুদ্ধ

জীবন তারা লাভ করিবে? মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা কোথায়, তার কোন্ সংবাদ তাদের সীমাবদ্ধ জীবনে প্রবেশপথ পাইয়াছে? দু'খানা গহনা পরিয়া নিমন্ত্রণ বাড়ীর বড় মাছের মুড়াটা উপভোগ করিতে পাওয়াই বোধ করি তাদের হিসাবে নারীজীবনের চরম-প্রাপ্তি!

নীলিমার চিত্ত গভীর ব্যথায় আচ্ছন্ন রহিল। নিজের ধর্ম্ম ও সমাজকে তুলনায় নীচে নামাইতে বুকে কাঁটা ফুটিতেছিল, অথচ তা' ভিন্ন আর কোন পথ সে দেখিল না। তাদের স্কুলের মেয়েরা—মিসেস গুঁই, মিসেস গুঁইএর সতীনঝি মিস্ এনা সরকার, এমন কি তাদের অরফ্যানেজের হিন্দুস্থানী মেয়েগুলা দাইরা শুদ্ধ কেমন সতেজ কেমন স্বাধীন কেমন সুখ-চঞ্চল ও আত্মনির্ভরশীল। আর তার মা অকারণে অকথ্য লজ্জাস্কর লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা হইয়াও ঘৃণ্য অপরাধীর মত নির্ব্বিবাদে সে লাঞ্ছনা বুকে তুলিয়া লইতেছেন। নিজের মেয়ের প্রতি হীন অবিচারকে পর্য্যন্ত এতটুকু প্রতিবাদ করিবার সাধ্য শক্তি তাঁর নাই। খৃষ্টান স্কুলের একটা ক্ষুদ্র টিচারও সে দিন 'বড়মেমের' নিকট গালি খাইয়া আদালতে যাইবার ভয় দেখাইল। না—হিন্দুত্বে পুরুষত্ব নাশ করে, নারীত্ব জড়ত্বে পরিণত হয়, মনুষ্যত্ব পশুত্বে অবনত হইয়া পড়ে।

নীলিমার মনে পড়িল, সে দিন মিস্ হর্ণ বলিতেছিলেন, 'এ দেশের লোকেদের মনে 'ফিলিং' বলিয়া কিছু নাই। তারা এখনও সেই আদিম ভাবেই আছে—অন্যের মন বুঝিয়া মনের বিনিময় করিতে তাহারা জানে না; প্রতিপালিত জীববিশেষের মত গতানুগতিকভাবে চলিতে বা আদেশ পালন করিতেই পারে।' কথাগুলার মধ্যে সত্য কি নাই? নহিলে মা তার এতবড় মানসিক যন্ত্রণা কি না ধরিতে পারিতেন? যখন

মার একটু আদর তার আহত চিত্তকে কতখানি সুস্থ করিতে পারিত তখন তিনি কেন তার কাছ হইতে আরও দূরে সরিয়া রহিলেন, কেন সে এত উত্তেজিত অসহিষ্ণু হইয়া থাকে, তাহা বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না!

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার কপাল ফিরিল।

মিসেস গুঁই তাহাকে শুভদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিতেই মিস হর্ণ, মিস বিল্, মাদাম পিরী সকলেরই নিকট হইতে অল্পবিস্তর কৃপা ক্ষরিত হইতে লাগিল। মিস হর্ণেরই অধ্যবসায় পূর্ব্বাপর অধিক ছিল, এখন মাত্রাতিক্রম করিল। মিসেস গুঁইএর মুখে কি সমাচার লাভ করিয়া তিনি রক্তবর্ণ মুখে ছুটিয়া আসিলেন।

"নেল্! ইহা কি সুসমাচার! তুমি যীশস্ ক্রাইষ্টের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছ?—ইহা কি সত্য?"

নীলিমা বাইবেলের পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি না তুলিয়া নতমুখে মাথা হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

"ইজ নট ইট গ্লোরিয়াস্!" (ইহা প্রশংসার্হ!)

"তুমি এখন যীশস্ ক্রাইষ্টের পবিত্র নামে বাপ্তাইজ হইতে সম্মত আছ?"

নীলিমার প্রত্যেক লোমকূপ এই প্রস্তাবে অননুভূতপূর্ব্ব শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টি দিয়া সে যেন সম্মুখবর্ত্তিনী বিদেশিনী-প্রলোভিকার শুভ্র মূর্ত্তি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল না। কি একটা

সম্মতিসূচক বাক্য বলিতে গেল, কিন্তু ভিতর হইতে তার জিহ্বা তালু ওষ্ঠাধর এমনই অ-বল হইয়া রহিল, যাহাতে শব্দ বাহির হইল না।

মিস হর্ণ পুলকিতচিত্তে শিকার-করা পাখীর মত তার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন; কাছে আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া, স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, "মাই গার্ল! নিজেকে অশান্ত করিও না, সময় লও—যীশস্ ক্রাইষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ কর—যেমন একটি ভেড়ার ছানা! আমি তোমায় এ বিষয়ে সাহায্য করিব। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, 'বিলিভার' হইয়া তুমি এ সংসারেই কত উন্নতি করিতে পারিবে। অন্য জগতের কথা তো দূরের, এ জগতেই বা তুমি 'আন্-বিলিভার' থাকিয়া কি পাইয়াছ?

নীলিমার ফরসা মুখ শোণিতোচ্ছ্বাসে সিন্দুর-রাঙ্গা হইয়া উঠিল, অবসাদ-অবসন্ন স্নায়ুপেশী যেন নবীন জীবনীশক্তির পুনরভ্যুদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিল, তার সংসার সুখভোগে অপরিতৃপ্ত, তৃষিত মনপ্রাণ এই প্রলোভনবাক্যের যাদুযষ্টিস্পর্শে সুখহীন, স্নেহহীন, আশাহীন নিরানন্দ অতীতটাকে পুরাতন সর্প-নির্ম্মোকের মত ঠেলিয়া ফেলিয়া সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে সাগ্রহে স্বাগত জানাইতে চাহিল। ঐ কথা কয়টির প্রতিধ্বনি তুলিয়া তার উৎপীড়িত অভিমানী চিত্ত বিদ্রোহ করিয়া বসিল;—পরলোকের কথা তো অনেক দূরের—ইহলোকেই বা সে কি পাইয়াছে—কি পাইতেছে? কি পাইলে তার গৌরবে, তার বন্ধনে তার আশ্বাসে এদের দেওয়া ইহ জীবনের সুখ পরজীবনের শান্তি ত্যাগ করিতে পারে? মায়ের বুকে স্নেহ আছে, কিন্তু সেই নিরুপায় ব্যর্থ স্নেহ—যাহা স্নেহপাত্রকে অকথ্য অপমান হইতে রক্ষা করিতেও অসমর্থ, সে থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা ক্ষতি কিসের? বাপ? নীলিমার সর্ব্বশরীরে টান ধরিল! ঐ পিতার কন্যা হইয়া থাকার চেয়ে আর সব কিছু হওয়া ভাল!

ঐ পিতার আশ্রয়ে অতীত ও বর্ত্তমানে যাই হোক, ভবিষ্যতে ভাগ্যে আরও যে কি আছে, তার ঠিকানা কি? তার মা যে জীবন বহন করিতেছেন, পিতার নির্ব্বাচনে খুব সম্ভব ঐ দরেরই কেহ নীলিমাকে ক্রয় করিয়া লইবে, তাদের নিম্ন শ্রোত্রীয় শ্রেণীতে পয়সা লইয়া মেয়ে বেচারও তো প্রথা আছে। অতএব ভবিষ্যতের দড়ী-কলসীর চাইতে এদের আশ্রয় কি মন্দ! এদিকে মিসেস গুঁই বুঝাইতে লাগিলেন, খৃষ্টান হইলে তার সুখের সীমা থাকিবে না। বলিলেন, "এই দেখ্ না, কম বয়সে বিধবা হয়ে ভাইয়ের সংসারে খেটে মরছিলুম, একাদশী ক'রে প্রাণটা ত্রাহি ত্রাহি করতো, জিভটা জলে ভরে গেলেও মাছ খাবার যোটি ছিল না, ভাগ্যিস্ এরা আমায় ভজন দিয়ে বার ক'রে আন্‌লে, তাই না আজ একবার ছেড়ে দুবার বিয়ে হলো, মাছ ছেড়ে বেকন-ফাউলও।—আর রেঁধে মরবার বদলে দাই খানসামা রেঁধে খাওয়াচ্চে। যেখানে খুসী যাচ্চি আস্‌ছি, কৈফিয়ৎ কাটবার কেউ নেই! তা তোরও খুব সুখ হবে, তোর অমন খাসা চেয়ারা, ভাল খেতে পরতে পেলে তুই লেডী বনে যাবি—চাই কি কোন সিভিলিয়ান কি ব্যারিষ্টার ফিরিঙ্গি সাহেবের নজরেও লেগে যেতে পারিস। আমি দেখতে ভাল নয় ব'লে আমার ও সাধ পুরো হলো না, একবার কোল আর অন্যবারে বাউরী খৃশ্চান জুটলো।"

গভীর ঘৃণায় আবার নীলিমার বুক ভরিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গি সাহেবকে বিবাহ করিতে নাকি বাঙ্গালীর মেয়ে পারে? সে যদি খৃষ্টান হয়, বিবাহ সে তার মত কোন ভালঘরের খৃষ্টান হওয়া ছেলেকেই করিবে; বিবাহ তো আর কাহারও জবরদস্তিতে হইবে না, তবে আর ভাবনা কিসের?

নীলিমার মা মেয়ের মনের এত বড় পরিবর্ত্তন ধারণা করিতে না

পারিলেও বিশেষ একটা বদল লক্ষ্য করিলেন। সে তাঁর সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কহে না, পূর্ব্বে গৃহকার্য্যের সাহায্য স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াও করিত, কত সময় তাঁর নিষেধ মানিত না, এখন সব পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি কত সময় বিশেষ প্রয়োজনে ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যায় না, এমনই গভীর অন্যমনস্কতায় ডুবিয়া থাকে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে বই লইয়া কোণের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া থাকে, স্কুলের সময় ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া ছুট দেয়। স্বর্ণলতা মেয়ের সামনে নিঃশব্দে থাকেন, আড়ালে বুক ঠেলিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠে, মেয়ের মনে যে একটা বিরাট চিন্তা ও বেদনা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হইতেছে এবং সেটা যে তাঁদের প্রতি অভিমান, এ তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু বুঝিলেই বা উপায় কি? চিরদিনের অত্যাচার পীড়নে তাঁর সকল মনোবৃত্তিই যে মূর্চ্ছাবসন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাঁর পক্ষে তাই এটুকুও অপ্রতিবিধেয়! জীবনের শেষ শান্তি মেয়ের সহানুভূতিটুকু, সেটুকুও তিনি হারাইতে বসিয়াছেন—সে ক্ষতি মনে তাঁর বিষম হইয়া বাজিলেও তা লইয়া অভিযোগ করার ভরসা তাঁর হইল না।

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের বন্ধে ডাউন পঞ্জাব মেলে নামিয়া দুইটি তরুণ ছেলে ভাড়া গাড়ী করিয়া অনুকূলচন্দ্রের জীর্ণ দ্বারে উপস্থিত হইল। এক জন দীর্ঘায়ত শরীর, বলিষ্ঠ, উজ্জ্বলতর গৌরাঙ্গ ও স্বভাবচঞ্চল, সে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই লম্ফ দিয়া নামিল ও তার সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা না করিয়া রুদ্ধ

দ্বারের কড়া নাড়িতে লাগিল। তার সবল হস্তের আকর্ষণে মরিচাধরা কব্জা যখন খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, ভিতর হইতে দ্বার খুলিল। ততক্ষণে দ্বিতীয় আরোহী গাড়ী ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া "এস হে সুশীল!"—বলিয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে পা বাড়াইয়া সঙ্কুচিতা নীলিমাকে পলায়নোদ্যতা দেখিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হাঃ, নীলিমণি যে! থিন অ্যাণ্ড র‍্যাগেড্ অ্যাজ এভার! (সেই রকমই শুঁটকী এবং ন্যাকড়া পরা!)"

কথার স্বরে নীলিমা দাদাকে চিনিয়া সকৌতুকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিতমূর্ত্তি জ্যেষ্ঠের প্রতি চাহিতেই বিস্ময়ে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শুভেন্দুর হিম-গৌরবর্ণ সহরের বদ্ধ জল বায়ুতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আতিশয্যে এবং সযত্নপরিমার্জ্জনে শতগুণ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হইয়াছে, তার দৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত দেহে সহজ কমনীয়তা স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। তার উপর অসাধারণ বিলাসিতাপূর্ণ সাজসজ্জায় তাকে ময়ূরছাড়া কার্ত্তিকটির মতই দেখাইতে ছিল।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিলে "দাদা?" বলিয়া নীলিমা প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই দ্বারের বাহিরে আর একটা জুতাপরা পায়ের শব্দ হইল এবং আরও একজন কেহ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জানা গেল। সে-ও যে দাদার মতই একজন তরুণ ও প্রায় সর্ব্ববিষয়ে তার সমকক্ষ, সেটুকু নীলিমা দেখিয়াছিল। তার উদ্যত প্রণাম-নিবেদন মধ্যপথেই বাধিয়া গেল এবং সে এই অপরিচিত নবীনের আকস্মিক অভ্যুদয়ে থাকিবে কি পলাইবে স্থির করিতে না পারিয়া অশান্ত ও চঞ্চল হইয়াও স্রোতোবদ্ধ শৈবালখণ্ডের মতই আটকাইয়া রহিল।

শুভেন্দু ডাকিয়া উঠিল, "এস না, সুশীল! নীল্‌টিকে আবার সমীহ করতে হবে না কি? উঃ রে!—ওঃ, লগেজগুলো?—হ্যাঁ তাই ত!—কে' নিয়ে যাবে? এই নীলি! তোদের চাকর টাকর আছে? এগুলো নিয়ে যায় কে, বল ত?"

দাদার কথা শুনিয়া ও তার বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া নীলিমার মনে সকৌতুক হাসির সঙ্গে একটু মায়াও হইল। দাদা একা থাকিলে, সে হয় ত বলিয়া ফেলিত, "চাকর-বাকরের মধ্যে আমিই আছি, আমিই নিয়ে যাচ্চি—"এবং সেগুলা বহিবার সাহায্যও সে দাদাকে করিতে আসিত, কিন্তু দাদার সমভিব্যাহারী দ্বিতীয় লোকটিকে স্মরণ করিয়া সে কিছুই না বলিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, চাকর এ বাড়ীতে নাই। সঙ্গে সঙ্গেই বহু দিনের পরে সদ্য-সমাগত ভাইএর প্রতি তীব্র বিরক্তিতে মন ভরিয়া উঠিল।—বাড়ীর হালচাল জানিয়াও দাদা এ'কি ছেলেমানুষী করিয়াছে?—এই বাড়ীতে কোন ভদ্রলোককে কেহ ডাকিয়া আনে! এ দিকে শুভেন্দু যে ভয় করিয়া বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক ছুটীতে সুশীলকে ঠেকাইয়া আসিতেছিল, নিজ গৃহের যে দৈন্য-দুর্দ্দশা, কার্পণ্য সে প্রাণান্তেও তাকে দেখাইতে ইচ্ছুক ছিল না, তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া এবার নাইনিতাল হইতে ফিরিবার সময় এই ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ভুবনবাবু যখন তাদের দুজনকেই নামিতে আদেশ দিলেন, তখন দু' একটা দুর্ব্বল আপত্তি করিলেও জোর করিয়া ট্রেণে চাপিয়া থাকিয়া সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে শুভেন্দুর মত দুঃসাহসিকেরও সাহসে কুলাইল না। মনের উষ্মা মনেই মারিয়া পিতৃমাতৃসন্দর্শনে প্রস্তুত হইয়া নামিয়াই পড়িল। সুশীলকেও যখন নামিবার আদেশ হইল, তখন তার মাথায় যেন কে মুগুর মারিল! প্রবল প্রতিবাদ করিতেও যাইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তীব্র নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া

পঞ্জাব মেলের হুইশেল গর্জ্জিয়া উঠিয়াই তাহাতে গতিবেগ প্রদান করিল। ততক্ষণে সুটকেসটা প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিয়া সুশীলও এক লম্ফে নামিয়া পড়িয়াছে।

লগেজগুলাকে নিজেরাই কোনমতে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। স্বর্ণলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিতেই শুভেন্দু বলিয়া উঠিল, "হাউ ডু ইউ ডু মাদার—ওঃ আই মীন্ মা! ভাল আছ ত?

স্বর্ণলতার অতি-বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখে বহুকাল পরে একটা আনন্দের স্মিতরশ্মি খেলা করিতেছিল, পশ্চিম আকাশের শেষ রক্তিমা সান্ধ্য-ধূসরতা ভেদ করিয়াও যেমন আত্মপ্রকাশ করে, বহুদিন পরে সন্তান-মিলনের আনন্দ এতই প্রচুর হইয়া উঠিয়াছিল যে, মরা নদীর বুকে আকস্মিক বন্যা প্লাবনের মতই তাহা যেন কুলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছে! পরিপূর্ণ চিত্তে প্রায়-অপরিচিত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক কষ্টে সুখের অশ্রু সংবরণ করিলেন। পরক্ষণেই শুভেন্দুর পার্শ্ববর্ত্তী তাঁহারই পদধূলি লইতে অবনত তনু আর একটি শোভন মূর্ত্তি তরুণের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইল। মাতার বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টির নীরব প্রশ্নোত্তরে শুভেন্দু কহিল, "ও সুশীল—ভুবনবাবুর ছেলে।" তার পর এ দিক ও দিক চাহিয়া বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, "এই পাঁচ বছরে তোমাদের বাড়ীর পুরণো 'রুল' সমস্তই ত দেখছি যথাপূর্ব্ব বজায় আছে! দেখ, সুশীলকে যদি এক কাপ চা ক'রে দিতে পেরে ওঠো। আমাকেও দেবে অবশ্য সেই সঙ্গে দু'এক কাপ।"

স্বর্ণলতার শুষ্ক মুখে যে সজীবতাটুকু দেখা দিয়াছিল—সেটুকু মরু-সলিলবৎ নিঃশেষ হইয়া গেল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "এখন তোমরা নাওয়া খাওয়া করে নিলে হ'ত না? বিকেলে চা খেতে—"

শুভেন্দু অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উহুঁঃ, সে হয় না। এক কাপ চা এখনই না খেলে শরীরটা চাঙ্গা হবে না।—যাও—নীলিকেও ডেকে নাও, ও মাদার! বি' এ গুড্ গার্ল!"

স্বর্ণলতা বিপন্ন ভাবে থাকিয়া পরিশেষে মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "চা ত বাড়ীতে নেই শুভু! বাজার থেকে ওবেলা আনিয়ে নেব, তাই বলছিলুম, এখন নাই বা চা খেলি, চান ক'রে নিয়ে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মনে পড়িল, হাঁড়িতে তাঁর নিজের ভাগের কয়টি মোটা চালের ভাত আছে, আধখানা আলুভাতে ও একটুখানি ভাজা-কলাইএর দালের সঙ্গে কয়েক খণ্ড পেঁপে সিদ্ধ তাঁর সম্বল, বহুমূল্য সিল্কের পাঞ্জাবী ও চকচকে পাম্পসু পরা সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষদের—তা' হউক সে নিজেরও ছেলে—কোলে ধরিয়া দিবার কথা মনে হইতেই স্বর্ণলতার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। জীবনে হয়ত এই প্রথম নিজের কর্ম্মকে তারস্বরে ধিক্কার দিয়া উঠিলেন। মনে হইল, নারীজন্ম যদি তাঁর না হইত, এই ছেলে যদি না জন্মিত, সে ছেলে যদি ধনী বন্ধুর সঙ্গে না আসিত।—পরক্ষণেই আসন্ন বিপদের যথাসাধ্য প্রতিবিধান চেষ্টাও যে এই মুহূর্ত্তে করা আবশ্যক, ইহা স্মরণে ত্রস্তে "তোমরা কাপড়-চোপড় ছাড়, বাবা! আমি রান্না চাপিয়ে দিই গে।"—বলিতে বলিতে যথাসাধ্য দ্রুত চলিয়া গেলেন!

শুভেন্দু চাপা দাঁতের মধ্যে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ড্যাম্ ইওর রান্না! রাঁধবে যা' ছাই তা' আমার জানাই আছে। এমন জায়গায়ও মানুষ মরতে আসে?—কাকাবাবুর যেমন কাণ্ড!—"

প্রায় হতবুদ্ধি ও সঙ্কুচিত সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে শুদ্ধ আবার জোটালেন! আমার বলে 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না

শঙ্করাকে ডাকে', তাই হয়েছে। বাড়ী যদি আমার বাড়ীর মত হ'বে তবে এতকাল ধরে পরের দুয়োরে ধন্না দিচ্ছি কেন ?"

সুশীল নির্ব্বাক বিস্ময়ে ও লজ্জাভিভূতভাবে মাতাপুত্রের মিলন-কথ শুনিতেছিল। নিজেকেই এদের এই বিপদ-বিড়ম্বনার হেতু বুঝি লজ্জাক্ষুন্নও হইয়াছিল। স্বর্ণলতাকে প্রস্থিত হইতে দেখিয়া সে একটুখানি শান্তিবোধ করিল এবং শুভেন্দুর কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিয়া উঠিল, "কি কর্‌ছো, শুভুদা ! জ্যেঠাইমাকে কেন ব্যস্ত করচো।— আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি, এমন সময় এক্ষণি কি ব্যবস্থা ক'রে তুলবেন ? একটা বেলা চা না হয় না-ই বা খেলে—চুপ ক'রে যাও এস কাপড় ছেড়ে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাক।"

বিরক্তি অ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে শুভেন্দু সুশীলের কথার প্রত্যুত্তরে জবাব দিল, "যে বাড়ীতে মাথা গলিয়েছ, ঠাণ্ডা এখানে হতেই হবে গায়ের সবখানি রক্ত বরফ ক'রে দিয়ে না ফিরতে হয়—"

উপেক্ষার চাপাস্বরে সুশীল বাধা দিল, "কি কর, শুভুদা ! জ্যেঠাইমার মনে কত কষ্ট হবে এ সব শুনলে।"

শুভেন্দু পাতলা পাঞ্জাবীতে লাগান চুণি বসান সোনার বোতাম খুলিতে খুলিতে ভুরু কুঁচকাইয়া তীব্র করিয়াই উত্তর দিল—"দেখ—সোজা কথাই বলবো, তা'তে কা'র মনে কি হুল ফোটাবে তা'র জন্যে প্যাঁচ লাগিয়ে কথা কওয়া আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই। সে জন্যে তোমরা কবি মানুষরা আছ, কথার কাব্যি বানিয়ে রাতকে দিন তৈরি ক'রো গে।— এই নীলি ! একটু গরম জল এনে দে' দেখি, দাড়ীটা কামিয়ে নিই।"

# বিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরের ছেলে যখন পর হয়, তখন সে যেমন অতিমাত্রায় পর হইয়া যায়, সত্যকার পরও ততখানি পর হইতে কুণ্ঠা বোধ করে। এই দারিদ্র্য-পূর্ণ এবং কার্পণ্যে কঠোর গৃহস্থালীর সহস্র অভাবের অভিযোগে ঘরের ছেলে শুভেন্দুর সুগঠিত নাসা যতই ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকিল, পরের ছেলে সুশীলের লজ্জা-বিপন্নতা ততই বর্দ্ধিত করিয়া তার কোমল চিত্ত অসহায় সাংসারের মধ্যে টানিয়া লইতে থাকিল। বন্ধুর ত্রুটী সে যে কেমন করিয়া শোধরাইয়া লইবে, কি করিয়া কোন্ কথা বলিয়া এই দুটি নিরুপায়া নারীর অপরিসীম লজ্জা-বেদনা প্রশমিত করিয়া দিবে, ইহা সে দিশাহারা হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইল এবং ওর জন্য স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়া নিজেকে একান্ত মুখর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

শুভেন্দু যখনই বিলাসবস্তুর অভাবে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া মাতাকে অনুযোগ ও পিতার উদ্দেশ্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে, সুশীলকেও সঙ্গে সঙ্গেই জানাইয়া দিতে হয়, শুভেন্দুর মাতার অনুপায়তায় এবং পিতার কৃপণতায় তার পক্ষে কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটে নাই।

শুভেন্দুর পিতা বাড়ী ফিরিয়া শুভদর্শন তরুণ দুইটিকে সন্ধ্যার স্বল্পালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিলেন, "কে গা তোমরা? কিসের মতলবে এসেছ? এটা অতিথিশালা নয়।"

নীলিমা সেইমাত্র মাতাপুত্রীর সমবেত চেষ্টায় সংগ্রহ করা দু' বাটি গরম চায়ের সঙ্গে একটু আটার মোহনভোগ দুখানি কাঁসার রেকাবে লইয়া অতিথিদ্বয়কে দিতে আসিতেছিল, বাপের গলার আওয়াজে তার হাত কাঁপিয়া একটা বাটির গরম চা খানিকটা চল্‌কিয়া তার পায়ে

পড়িল। সে গতিহারা হইয়া গেল। শুনিতে পাইল, দাদা বিরক্তকণ্ঠে বলিতেছে, "আমি শুভেন্দু। কাকাবাবু এখানে দেখা ক'রে যেতে নামিয়ে দিলেন, কালই আমরা ফিরে যাব—এটি কাকাবাবুর ছেলে।"

নীলিমা দেখিল, সুশীল আসিয়া তার বাপের ছেঁড়া চটিপরা ধূলি-ধূসরিত ফাটাপায়ের ধূলা তুলিয়া লইল, সবিনয় মিষ্টস্বরে কহিল, "জ্যেঠা-মশাই! আমার নাম সুশীল—বাবা আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন!"

"হাঃ, তাই বলো! তোমরা ভুবনের কাছ থেকে আস্‌ছো—বহোৎ আচ্ছা! ভুবন নিশ্চয় ভাল আছে? যার এত ধনদৌলৎ, সে ভাল না থেকে কর্‌বে কি? তার পর? তোমরা—বড়মানুষের ছেলেরা—তোমরা গরীবের গরীবখানায় রাত কাটাতে পারবে ত? আর না পেরেই বা আজকের রাতে যাবে কোথায়? কোন গতিকে চোখকান বুজে একটা রাত্তির চালিয়ে নাও। কি বল হে—সুনীল না সুশীল বুঝি?—কি নাম তোমার বল্লে?"

এই অপ্রচ্ছন্ন প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে সুশীল স্মিতমুখে উত্তর করিল, "আজ্ঞে সুশীল।"

ঔদাস্যব্যঞ্জক নীরসস্বরে অনুকূলচন্দ্র কহিলেন, "তা' সুনীলই হোক, আর সুশীলই হোক, ও একই কথা—আজকালকার দিনের ছেলে কত 'সু' হয়, সে আমার জানা আছে। তবে 'নীল' আর 'শীল' নিয়ে যেটুকু তফাৎ—তা' হ্যাঁ, বলছিলুম কি, একটা রাত্তির তোমাদের এই খানে তা'হলে কাটাতেই হচ্ছে, তা হোক!—কালকের ভোরের প্যাসেঞ্জারটায় বেরুলে পরশু ভোরেই তোমাদিগে' হাবড়া ইষ্টেসান নামিয়ে দেবে। অসুবিধা বিশেষ হবে না, সেইটেতেই যেও। আমি কখনও বাড়ী গেলে ওইটেতেই যাই, ভাড়াও সস্তা।"

এই কথা বলিয়া প্রসন্ন-হইয়া সজোরে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কল্‌কেতার ছেলেদের শুনেছি বেলা ৮ টার আগে ঘুম ভাঙ্গে না, তা' আমি আর গিন্নী খুব ভোরেই উঠি, আমরা তোমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবো'খন। অত সকালে তো আর মুখে কিছু দিতে পারবে না, চট্‌ ক'রে বেরিয়ে পড়লে, অ'নায়াসে সাড়ে পাঁচটার প্যাসেঞ্জারটা ধ'রে ফেলতে পারবে। হাঃ, তার পর সুশীল! তোমার বাবার ব্যবসা বোধ করি খুব ভালই চল্‌ছে? মাস মাস কতটি টাকা করে জমাতে পারছেন বল তো? কি গো—কুমারী নাইটিঙ্গেল আবার কি নিয়ে এলেন?—কি ও বাটিতে? দুবাটি ও'কি আনা হলো?—আবার রেকাবে অতখানি ক'রে হালুয়া কেন? হাঃ-তোর গুষ্ঠীর পিণ্ডি! কল্‌কেতার ছেলে ওরা, ওরা নাকি ওই হালুয়ার তাল দুটো গিল্‌তে পারবে? তোর মতন কি ওদের রাক্ষুসে ক্ষিধে! ওরা হাওয়া খেয়ে থাকে, ইলেক্‌ট্রিকের পাখার হাওয়া!"

ইলেক্‌ট্রিকের পাখার হাওয়া খাইয়া ক্ষুধামান্দ্য করে কি না বলা যায় না, তবে এ বাড়ীতে নাকি উহার কোন পাঠই ছিল না বলিয়াই না কি, ক্ষুধা এ দুই জন তরুণের অল্পবিস্তর পাইয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর মুখে নিজেদের ঐ অনৈসর্গিক আহার্য্যের ব্যবস্থা শুনিয়া শুভেন্দু ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হইয়া নীলিমার দত্ত চায়ের বাটিটা মাত্র তুলিয়া লইয়া হাতের ধাক্কা দিয়া রেকাবখানা ঠেলিয়া গম্ভীর চাপাস্বরে বলিল, "নিয়ে যা—"

সুশীল উহার অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও উহা করিতে লজ্জা বোধ করিল।

নীলিমা অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও যখন দেখিল, তার 'পিতৃকবল হইতে এদের উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত, তখন সেই বহুলায়াসে

সংগৃহীত চায়ের দুর্দ্দশা ফেনের সহিত একীভূত হয় দেখিয়া অগত্যাই পিতৃসান্নিধ্যকে সম্মান দিতে সাহস করে নাই, ফলে সে গৃহের কদন্নের দায়ে প্রায়-অভুক্ত শুভেন্দুকে এবারও অভুক্ত থাকিতে দেখিয়া তার সোদরা-স্নেহ আহত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে পীড়াদান করিল এবং কেন অধিকতর চেষ্টায় এই সামান্য সংগ্রহটুকু একটু পূর্ব্বে করিয়া তুলিতে পারে নাই, এ জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়া অপর জনের দিকে সমধিক সঙ্কুচিতপদে ও উদ্বেলিতবক্ষে অগ্রসর হইল।

দিবসান্তের সেই শেষ ধূসর-রশ্মিরেখায় সে মুখের পীড়িত, তৃষ্ণিত, ব্যথিত দৃষ্টি সুশীলের সুপ্রচুর সহানুভূতি ভরা পরিপূর্ণ চিত্তকে অতি সহজেই অভিভূত করিয়া তুলিল, সে বিষণ্ণনেত্রে বিব্রত বিপন্ন মুখের দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইয়া তার রেকাবশুদ্ধ চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল এবং অনুকূলচন্দ্রের বিরক্তি-অপ্রচ্ছন্ন হিংসাকুটিল মুখের দিকে উৎফুল্ল চোখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিয়া উঠিল, "কল্‌কেতার ছেলেরা শুধু ইলেট্রিক পাখার হাওয়াই খায় না, ভাল ভাল মোহনভোগও অনায়াসে খেতে পারে, বসে থেকে দেখুন। শুভুদা! তুমি যদি উল্টে দাবী না আনো, তা হ'লে হুকুম পেলে তোমার ভাগটাও মিলিয়ে নিয়ে কল্‌কেতার ছেলেদের কলঙ্ক মোচন করে জ্যেঠামশাইএর কাছে প্রাইজ পেয়ে যাই।"—এই বলিয়া সুশীল হাসিয়া উঠিল এবং হাস্যোৎফুল্ল মুখ অকুণ্ঠিতভাবে তুলিয়া নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"যদি আপত্তি না থাকে ও রেকাবখানাও আমায় দিয়ে দাও, জ্যেঠামশাইএর এ রকম ভুল রেখে যাওয়া তো কোনমতেই চলবে না।"

নীলিমার সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, উহা আনন্দে কি সঙ্কোচে, বুঝিতে না পারিলেও মনে হইল, এতদিন পরে যেন তার জীবন সার্থক হইল। এমন সুরে, এমন সহানুভূতিতে তাহাকে আর তো কেহ আহ্বান

করে নাই! সে লজ্জিত, জড়িত ও আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়া সবটুকু খাবার তার পাতে ফেলিয়া দিল, পিতার ভ্রূকুটিকুটিল মুখের ছবি তীব্র ইঙ্গিতে কিছু বাঁচাইবার কঠিন সঙ্কেত জানাইতেছিল, সে দিকে চাহিয়াও দেখিল না।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

যন্ত্রের মধ্যে সুর ভরা থাকিলেও যন্ত্রীর হাতের স্পর্শ ব্যতীত সে যেমন নিজেকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, উপযুক্ত যন্ত্রীর হাতের এতটুকু স্পর্শ-লাভে তার সেই নীরস কঠোরতা এক নিমেষেই যেমন রসের স্রোতে উথলিয়া উঠে তেমনই সে দিন সুশীলের এতটুকু মিষ্টহাসি, একটুখানি স্নিগ্ধ দৃষ্টি ও কয়েকটি সস্নেহ বাণীর অচিন্ স্পর্শেই নীলিমার বক্ষোনিলীন সুপ্ত সুরের সপ্ত ধারা উথলিয়া উঠিল। তার প্রাণের তারে ওই স্পর্শটুকু যেন ঝঙ্কার দিয়া সুরবাহারের অসংখ্য সুর বাজাইয়া তুলিল? মনের মরাগাঙ্গে জোয়ারের স্রোত বহাইল, সঙ্কোচ-শঙ্কিত মুদিত চিত্তে রাজরাণীর ঐশ্বর্য্যভারের সমাবেশ করিল। সহসা সে দিন প্রথম মনে পড়িল, তার বয়স আর বালিকার বয়স নাই। তার অর্দ্ধপরিণত যৌবনোন্মেসিত তনু দেহ আজ এই অর্দ্ধাবরণের ফাঁকে ফাঁকে তার চিত্তকে নিরতিশয় লজ্জা-বিপন্নতায় বিব্রত করিয়া তুলিল। নিজের পরিধৃত মলিন বস্ত্র তার অন্তরকে ধিক্কারে ভরাইয়া তুলিল। নিজেদের দৈন্যে ও কার্পণ্যে বিরস গৃহস্থালী তাহাকে আজ একান্ত পরিতপ্ত, আহত ও অসহিষ্ণু করিল। এই অপূর্ব্বদর্শন সুখসেবিত তরুণযুগলকে একান্ত কুশ্রীতায় ভরা, দুঃখ দারিদ্র্য এবং হৃদয়হীন গৃহস্থালীর মধ্যে কোথায় রাখিয়া কেমন করিয়া

সেবাপূজা করিবে, সে কথা ভাবিয়া এই অসহায়া তরুণীর বুকে লজ্জা মথিত রক্তের স্রোত কলকল্লোলে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।—উঃ গরীবের মেয়ে হওয়ার এত বিড়ম্বনা—তার উপর সেই গরীব যদি কৃপণ পেঁচোয়া এবং হৃদয়হীন হয়।

স্বর্ণলতার মনের বেলায় যে এই ঢেউ আঘাত করে নাই তা' নয়, কিন্তু এই চিয়-অসহায়া নারীর পাথর-জমাট বুকে সকল আশা তৃষ্ণাই যে চিরসমাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে আঘাত পড়ে, তাহাতে আহতকে প্রত্যাখ্যাত করায় না, মাত্র অবরুদ্ধ বেদনার গুরুভারে অবসন্ন মনটাকে আরও মূর্চ্ছাতুর করিয়া ফেলে তাই মনের মধ্যে সকল ইচ্ছা চাপিয়া তিনি চির প্রথামত মোটা আটার রুটি, মশূরির দাল এবং বিলাতী কুমড়ার ছক্কা রাঁধিতে রাঁধিতে এই খাদ্য পরিবেশন করিবার সময়কার নিজের ব্যথা ও ছেলের অপ্রসন্ন মন্তব্য মনে করিয়া লজ্জা-পীড়িত হইতে ছিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দুর সুখসেবিত সুন্দর মূর্ত্তি মনে পড়িয়া তাঁর সকল দুঃখের উপর পরম সুখের শীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতে ছিল।

রান্নাঘরে ঢুকিল নীলিমা। অমনই স্বর্ণলতার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। আজ পুত্রৈশ্বর্য্যের পাশাপাশি এই মেয়ের দুর্দ্দশাটা তাঁর কাছেও যেন অত্যন্তই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর শুভেন্দুর সমভিব্যাহারী সুশীলের স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি মুগ্ধ মনের উপর কি মায়াজালই যে বিস্তৃত করিয়াছে, সে শুধু সেই জানে, যে অভাগা বাতুল গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মর্ত্ত্য মানবের সহিত বৃথাই সংস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে! স্বর্ণলতার বিমোহিত অন্তরের অত্যন্ত গোপন গুহায় সন্তর্পণে এমন একটা অসম্ভব অসঙ্গত বাসনাও উচ্চকিত হইয়া উঠিতেছিল যে, তার একটু-খানি বহিঃপ্রকাশে সমস্ত মানবজগতে এমন

একটা হাস্যতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে পারে, যার পর ওই চিরবিড়ম্বিত নারীর সকল সহ্য সীমা ছাড়াইয়া যাইবে, তার কোন হিসাব থাকিবে না! নীলিমার গৃহপ্রবেশে সেই দুরাকাঙ্ক্ষারই চকিতোদয়ে তাই স্বর্ণলতার নিস্তেজ বক্ষ হইতে অত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল, সুশীলের হাতে যদি নীলিমাকে দেওয়া চলিত!

নীলিমা আসিয়া কাঠের 'কেঠো'য় কোটা কুটনাগুলার উপর বারেক অবজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; উনানে চাপানো ফুটন্ত দালের হাঁড়িটার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তার পর জলঢালা আটাগুলার উপর চোখ পড়িতেই জ্বলিয়া উঠিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "মা! আজও ঠিক তোমার সেই মান্ধাতাকালের বন্দোবস্ত! দাদাকে তা'হলে তোমরা নির্ঘাত উপোস করিয়ে মারবে ঠিক করেছ? ও তো তোমার ওই পেটেণ্ট-লেদারের রুটি দাঁতে কাটতে পারবে না।"—বলিতে বলিতে এতক্ষণকার সকল অভিযোগের বেদনা এই উপায়হীনা জননীর উপরেই ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে উত্তেজনায় অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল।—

"অদ্ভুত মানুষ তোমরা! এত দিন পরে ছেলে এলো, কোথায় তাকে যত্নে আদরে ভরিয়ে দেবে, দুদিন ধরে রাখবার চেষ্টা করবে, তা' না, না খেতে দিয়ে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্চো? তা'না ক'রে ওকে যদি হাতে রাখ্‌তে, ভবিষ্যতে তোমাদেরই ভাল হতো।—দেখছো না কি, তোমাদের হতশ্রদ্ধায় কুকুরের মতন দোরদোর ঘুরে বেড়ান সে দাদা আর নেই!"

অসহায়া জননীর আর্ত্ত করুণ দুটি চোখের উপর চোখ পড়িতেই অকস্মাৎ সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। আনায়বদ্ধ নিরুপায় জীব-জননীর ব্যথাকাতর মূক দৃষ্টির মতই তাহাতেও সেই একই আশাহীনতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নীলিমাকে সেই অভিযোগহীন, বেদনা

বজ্রবলে আঘাত করিল। এই ধৈর্য্যচ্যুতির মূলে যত বড় অবিবেচনাই থাক, মায়ের সম্বন্ধে সেও যে তার চেয়ে কম কিছু করে নাই, মনে পড়িতেই চুপ করিয়া গেল। মাকে এ সব বলা যে একেবারেই নিরর্থক এবং মার পক্ষে কোন প্রতিকার করা স্বর্গের সিঁড়ি করার মতই অসম্ভব, এ কি তার জানা নাই? ক্ষণকাল অন্তর্গূঢ় অসহ্য কোপে স্তব্ধ থাকিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহস্বামীর রাত্রের আহার চুকিয়া গিয়াছে। অনুকূলচন্দ্রের শয়নকাল ঠিক সন্ধ্যা ৮টা, সৌভাগ্যক্রমে আজও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। রান্নাঘরে চৌকিদারী করিয়া হৃষ্টচিত্তে শয়ন করিতে গেলেন, স্ত্রী কন্যাকে বলিয়া গেলেন, "তোমরাও অনর্থক রাত করো না, ওদের দুখানা খাইয়ে দিয়ে লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়ো, ভোর না হ'তেই ওদে'ঘরে ইষ্টিশানে পৌঁছে দিতে হবে। অত ভোরে খাবে কি করে, ট্রেণে বসে কিনেই খাবে'খন।"

সন্ধ্যার অপরিস্ফুট অন্ধকারে দোতলার ছাতের আলিসায় হেলান দিয়া নীলিমা বসিয়াছিল। আকাশভরা নক্ষত্রগুলা প্রাণপণে জ্বলিয়াও এই নিরালোক বাড়ীটাকে এতটুকু উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্তু ওই অসংখ্য নক্ষত্রসমষ্টির একতমের মত ক্ষুদ্র আলোকসম্পাতে আজ নীলিমার চিত্তে স্মিত-শুভ্র রজতালোকের একটি স্নিগ্ধধারা অতি ধীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আকাশে বাতাসে সম্মোহনশক্তির কোন

উপাদানই ছড়ান ছিল না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা একান্তই প্রতিকূল, তথাপি এ কি গোলাপী নেশার আবেশে চোখের পাতা তার জড়াইয়া আসিতেছে! মুদিত মনের তারে কোন্ অজানা সুরের রাগিণী অনর্থক ঝঙ্কৃত হইতে চায়? মায়ের উপর অভিমান ও পিতার উদ্দেশ্যে ক্রোধ লইয়া সে অতিথিদের ভোজনব্যাপারে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল, কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই কোথা হইতে কোন্ অজ্ঞাত চিন্তার অনাহূত আগমনে সমুদয় অপ্রিয় প্রসঙ্গ ও পারিবারিক লজ্জা জ্বালা নিরুদ্ধ হইয়া গেল। শুভেন্দুর আহ্বানে সসংজ্ঞ হইয়া জানিতে পারিল, তার অন্তরের বিদ্বেষবহ্নি সহসাই নিবিয়া গিয়াছে এবং সেই নির্ব্বাপিত-শিখা অগ্নিজ্বালার স্থলে অজস্র সুধাধারা ক্ষরিত হইতেছে। পুলক-কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "দাদা!"

শুভেন্দু রাগে দুঃখে গর্জ্জিতেছিল, নীলিমাকে পাইয়া কাঁদো কাঁদো মুখে অস্ফুট তর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "কি ঝকমারি করেছি—তোমাদের বাড়ী এসে! আমার ইচ্ছা ছিল না, তা'তে আবার ওই ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে ক'রে—কাকাবাবুর ঐ যে কেমন একটা ছোটলোকী-গোঁয়ার-তুমি, যা' ধরবে তা' না করিয়ে ছাড়বে না। বল্লে কি না, মা-বাপকে একবার দেখে আসা উচিত! আরে বাপু, মা-বাপ কি আমার মা-বাপের মতন, তা হলে তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছি কেন? এখন এই সন্থ অপমানের হাত থেকে কেমন ক'রে বাঁচা যায়, তাই ভেবে আমার তো মাথা ঘুরচে! কি করি বল্?"

নীলিমার মুগ্ধ অন্তরের স্বপ্নবিভোরতা বাস্তবের তপ্ত স্পর্শে ব্যাহত হইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

শুভেন্দু বিরক্তি-তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "কি হয়েছে, জানিস্ নে'? ন্যাকামী করিস্ কেন? আমি না হয় উচ্ছন্নই গেলুম, একটা রাতের

মতন ত থাকা, সেটা না হয় স্রেফ জল গিলেই কাটিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ওই যে একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে ঝক্‌মারী ক'রে এনেছি, ওর পাতে ওই চোকরের রুটি আর মুসুরীর দাল ঢালতে তোদের না হয় লজ্জা নেই —তোরা না হয় পারবি, আমি কেমন ক'রে দাঁড়িয়ে দেখবো বল তো? ওদের হিন্দুস্থানী দরওয়ানগুলো রুটি ঐ রকমই পাকায়, কিন্তু দালে তাদের ঘি পড়ে কতটি!

নীলিমার দিক হইতে সাড়া না পাইয়া জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়া শুভেন্দু গলা চড়াইয়া কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"গিন্নিঠাক্‌রুণকেও আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে এসেছি, আর তুমি ঠাক্‌রুণও জেনে রাখ—তোমাদের বাড়ীর ও ছাই-পিণ্ডি সুশীলের পাতে আমি দিতে দেবো না, তার চাইতে তাকে নিয়ে আমি এক্ষুণি বিদায় হচ্ছি।"

এই বলিয়া রাগে গস গস করিতে করিতে শুভেন্দু চলিয়া যায়, নীলিমা তার পথরোধ করিয়া বলিল, "একটু দেরি কর, আমি জোগাড় করে তোমাদের লুচি ক'রে দিচ্ছি।"

শুভেন্দুও অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া নরমসুরে কহিল, "আহা, তা' যদি পারিস রে! কি বলবো তোকে? দেখ দেখি বাবার কি অন্যায়। সাধ ক'রে কি আর দু'টি চক্ষে প'ড়ে ওকে দেখতে পারিনে! বারমাস ওদের খাচ্ছি, আর সে কি রাজভোগে খাওয়া, তোদের চৌদ্দ পুরুষেও কখন অমন খাওয়া খায়নি।—তা একটা দিনের জন্যে এসেছে, এতটুকু যত্ন করে খেতে দিতে পারলে না?—লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করে?"

শুভেন্দু আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল। নীলিমা আর সে সব কথা কানে না তুলিয়া কৃতসঙ্কল্প লইয়া চলিয়া গেল। রান্নাঘরে রাঁধা আহার্য্য সাম্‌নে লইয়া স্বর্ণলতা হেঁটমুখে বসিয়া বোধ করি বা নীরবে অশ্রুপাতই করিতেছিলেন। মেয়ের পদশব্দে আরও সঙ্কুচিত

হইলেন।—সেও যে তাঁকে ভৎ‍র্সনা করিতেই আসিতেছে, এ বিষয়ে তাঁর মনে দ্বিধাই ছিল না, কিন্তু রূঢ় সম্ভাষণের পরিবর্ত্তে মেয়ে ডাকিল, "মা!"

তার গলার নম্র ও অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে জননীর নিজের অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাসিন্ধু উথলিত হইয়া উঠিতে গেল, বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন—"মাগো!"

"তুমি উনোন নিবিও না, মা। ভাল ময়দা, ঘি, হাঁসের ডিম, আলু সব বামাকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি, সেই দিয়ে দাদাদের খাবার ক'রে দিতেই হবে, না হ'লে ও না খেয়ে এক্ষুণি চলে যাচ্ছে।"

স্বর্ণলতা তড়িৎস্পৃষ্টার মত চমকিয়া চাহিলেন; তাঁর অবরুদ্ধ বক্ষ ঠেলিয়া ক্ষুধিত প্রাণের আর্ত্ত স্বর ছুটিয়া বাহির হইল—"ও সব কিনতে পয়সা কোথা পাবি মা?"

নীলিমা সঙ্কল্পদৃঢ় স্থির স্বরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "সে হয়ে যাবে, দেখো না।"

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে আহার্য্য প্রস্তুত হইলে প্রফুল্ল স্মিতমুখে নীলিমা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল, ইতোমধ্যে একটা চির-পরিত্যক্ত ঘরকে ঝাঁটপাট দিয়া একখানা তক্তপোষের উপর ময়লা তোষক ফসা চাদরে ঢাকিয়া সে ওদের বসিবার স্থান করিয়া দিয়া গিয়াছে। পোর-সিলেনের পুরাতন বাতিদানিতে একটি বাতি আনাইয়া জ্বালিয়া দিয়াছিল। শুভেন্দু সেইখানে শুইয়া ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে মনে মনে নিজের পিতা হইতে সুশীলের পিতার পর্য্যন্ত মুণ্ডপাত করিতে-ছিল এবং বিলম্ব দেখিয়া নীলিমার কৃতকার্য্যতার উপরেও সন্দিহান হইয়া উহাকেও গালি পাড়িতেছিল—অবশ্য সবটাই মনে মনে। সুশীল কয়েকবার কথাবার্ত্তার চেষ্টা করিয়া ধমক খাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল,

স্বর্ণলতার নিকট রান্নাঘরে উপস্থিত হইবার লোভ হইলেও শুভেন্দুর মনের অবস্থা দেখিয়া ভরসা করিতে পারে নাই; অথচ শুভেন্দুর এই আগ্রহ-হীন মাতৃ-মিলনের সবখানি ব্যর্থতাই তার মাতৃ-হারা চিত্তকে বিস্ময়ে ব্যথায় ভরাইয়া দিয়াছিল। সেই সঙ্গে ঐ দুঃখসহিষ্ণু দীন মূর্ত্তি অভাগী মায়ের জটিল জীবনযাত্রার চিত্র তার গভীর সহানুভূতিপূর্ণ তরুণ চিত্তকে যেন মমতায় মথিত করিতে লাগিল। সুশীলের মনে হইল, যদি সে ঐ বেদনা ভারাতুর স্নেহ বুভুক্ষিতা মাতৃহৃদয়কে নিজের ক্ষুধিত চিত্তের ভক্তিপ্রেমে ভরাইয়া তুলিতে পারিত!

নীলিমার হাতে পূর্ব্বে কতকগুলা কাঁচের চুড়ি থাকিত, এখন তাও ছিল না, মিশনের অনেক মেয়ে ও টীচারের অনুকরণে সে এখন শুধু হাতেই থাকে, বাজারের সব চেয়ে নিকৃষ্ট বাজে চুড়ি ঘৃণা করিয়াই পরে না, নিজের আসার আগমনী জানাইবার কোন উপায় না থাকায় অগত্যা ডাকিল—"দাদা!"

শুভেন্দুর বোধ করি একটুখানি তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে, তার সাড়া না পাইয়া সুশীলের দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের খাবার কি এইখানে আনা হবে?

সুশীল এই প্রশ্নে একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল, উত্তেজিত কণ্ঠে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে কি! না না এখানে কেন?—আমরা তাঁ'র কাছেই যাচ্ছি—শুভুদা! ও শুভুদা! কি বিপদ! ঘুম দিচ্চো নাকি? চল চল, খেয়ে আসা যাক।"

শুভেন্দু ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁচাঘুম ভাঙ্গার বিরক্তিতে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া বসিল এবং সাম্‌নেই নীলিমাকে দেখিতে পাইয়া বিরক্তি নীরস-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হ্যালো!—কি ব্যাপার বল ত? ছাই-পিণ্ডি কি দেবে দিয়েই ফেল না, আশায় আশায় আর কত রাখবে?"

শুভেন্দুর নিজের বোনের প্রতি এই শুষ্ক সম্ভাষণে সুশীল যেন চোর হইয়া গেল, সে সলজ্জে উঠিয়া তাড়াতাড়ি শুভেন্দুর হাত ধরিয়া বলিল, "উনি তো কখন্ থেকেই ডাকাডাকি করছেন, তোমারই যে ঘুম ভাঙ্গে না!"

আহারে বসিয়া শুভেন্দু আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখে নাই ত? কলের ময়দার ধপধপে ফুল্‌কো লুচি, পটল আলু ভাজা, হাঁসের ডিমের কালিয়া, কিস্‌মিসের চাটনী, সন্দেশ রসগোল্লা, একখানা রেকাবে কয়েক টুকরা বোম্বাই আম। শুভেন্দু বিস্মিত উল্লাসে উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল, "হ্যালো! এ বাড়ীতে কি কর্ত্তা বদল হয়ে আমিই মালিক হয়েছি নাকি? এ সব কোথা থেকে এলো? তোর খৃশ্চান স্কুলের টিচাররা কি তোকে আলাদীনের পিদীম দিয়েছে নাকি রে?—বাঃ বাঃ খাসা মেয়ে তুই!"

স্বর্ণলতার প্রীতি-প্রসন্ন সজল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি গভীর স্নেহে নীলিমার আনত মুখের উপর নীরব আশীর্ব্বাদের কিরণ বর্ষণ করিল, সে যে আজ এই আনন্দ-মিলনের দিনকে ব্যর্থ হইতে না দিয়া মায়ের প্রাণকে এই একটি মাত্র দিনের জন্যও সার্থকতার সুখে ভরিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে, তার মূল্য যে এই চিরদুঃখিনীর কাছে কত বড়—তা' অন্তর্য্যামী ভিন্ন জানিবে কে? সুশীল সকল কথা না বুঝিলেও স্বর্ণলতার আনন্দ-স্মিত মূর্ত্তিখানি উৎফুল্ল হইয়া নিরীক্ষণ করিল ও তার পর তাঁরই দৃষ্টি অনুসরণে অদূরবর্ত্তিনী স্থির পাষাণমূর্ত্তির মতই অচলা তরুণীর দিকে সস্নেহে চাহিয়া দেখিল, কেবল সেই আনন্দ-মিলনের সকলটুকু আনন্দের মধ্যেও ভারাক্রান্ত ও শঙ্কিত হইয়া রহিল নীলিমার অপরাধ-পীড়িত চিত্ত।

# ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রেম সর্ব্বত্রই থাকে না; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ততঃ তার একটা বাহ্যিক ভাণও থাকে, স্বর্ণলতাদের দাম্পত্য জীবনে আর যাই কিছু থাক মিথ্যার আবরণ ছিল না। বিগত-প্রায় যৌবন-সীমায় পৌঁছিয়া কোন অতীত স্মৃতি আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য এই দম্পতীর প্রাণের কোণেও বুঝি কখনও ব্যাকুলতা জাগে নাই, স্ত্রী শুধু ঘরকরণার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে, স্বামী তার পদ-মর্য্যাদায় সুস্থিত। সহসা আজ নিঝুম বিনিদ্র চিন্তার পর একটা কোন সঙ্কল্প স্থির করিয়া অনুকূল শয্যাত্যাগ করিলেন, চিরদিনের পর আজ গৃহিণীকে সচিবের পদ দিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। পাশের ঘরে স্বর্ণলতা নীলিমার সহিত গভীর নিদ্রামগ্না, অন্ধকারে চাপাগলায় ডাকিলেন, "বলি ওগো! একবার উঠে এস ত?

ঘুমের ঘোরে উঠিয়া বসিয়া অর্দ্ধ সন্দেহে স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

"আমি গো, বুকটায় একটা ব্যথা ধরেছে; একটু হাত বুলিয়ে দাও দেখি।"

স্বর্ণলতা মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিলেন—ভাগ্যে ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে ব্যথাটা ধরে নাই।

বিছানায় ফিরিয়াই অনুকূলচন্দ্রের ব্যথার সেবা করাইবার ইচ্ছাটা সহসা বদলাইয়া গেল, চাপা গলায় মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, তোমার ওই আইবুড়-কার্ত্তিক ধেড়ে আহ্লাদীকে পার করবার এমন

সুযোগ আর পাবে না, ভুবন রায়ের ছেলেটাকে যদি হাত ক'রে ওর গলায় মেয়েটাকে গছাতে পার, তা'রই জন্যে লেগে পড় দেখি, যেমন ক'রে হোক, এ কাজ তোমার করতেই হবে।"

এই প্রস্তাব এমন অপ্রত্যাশিত স্বর্ণলতা ইহাতে ভীষণ ভাবে চমকিয়া উঠিলেন ও তাঁর মুখ দিয়া আচমকা বাহির হইয়া গেল—"আমার কপালে এত সুখ কি হবে!"

অনুকূল স্থির-সঙ্কল্পের দৃঢ় স্বরে জবাব দিলেন, "কেন হবে না শুনি? অতবড় তৈরি মেয়ে রয়েছে, ছেলেও খোকাটি নয়; দুটোকে খুব মেলা মেশা করতে দাও, ম্যাম সাহেবের মতন—তা'র পর নিজেই বিয়ে করতে পথ পাবে না। সাহেবদের ওই রকমই হয়; ওতে দোষ নেই, আমাদের ঘরেও আখচার হচ্চে।"

চিরজীবন স্বামীর সকল যুক্তি নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিবাদে পালন করাই স্বর্ণলতার অভ্যাস, মন তাতে সায় দিক, বা না-ই দিক, প্রতিবাদ তিনি করেন না, কিন্তু আজ গ্রহণ করিতে পারিলেন না, আশাহতভাবে ক্ষীণ প্রতিবাদে কহিলেন, "সুশীলের বাপ রয়েছেন, সে কি কখন নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করতে পারে? তার চেয়ে ভুবন বাবুকে বল্লে হয় না, যদি তিনি দয়া ক'রে ওকে নেন, মেয়ে তো মন্দ নয়।"

অনুকূল বিরক্তি সূচক চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তোমার দয়ার সাগরকে সে কথা আমি বলতে ভুলিনি, তিনি তার কাটান্ জবাব বহুকাল পূর্ব্বেই দিয়ে চুকেছেন—কোন্ বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে নাকি ছেলের ছোটবেলা থেকেই বিয়ের কথা দিয়ে গরীবের মেয়েদের পথ তিনি বন্ধ করেছেন—ছোকরা চালাক কি কম নাকি! দেখেছো তো, —তোমার ছেলেটাকে কি রকম জেণ্টেলম্যান বানিয়ে ফেলেছে! তুমি কি মনে কর ওকে নিজের জামাই করবার মতলব ওর নেই? আমিও

তা'র শোধ নেব, ছেলের বিয়ের টাকা তো আর চাইতে পারব না, আমার ছেলে তো ওরই হাতে, তাই যখন হাতে পেয়েছি তখন 'ওর ছেলেকেও আমি ছাড়ছি নে'—ওর ঘাড়ে নীলিকে গছাবো, তবেই আমার নাম অনুকূল চক্রবর্ত্তী। তেমন কোন ঘটনা নাও ঘটে, যেচে বিয়ে নেহাৎ না করে, তবে জবরদস্তিতে আলবৎ করতে হবে।"

স্বর্ণলতার বুকের ভিতর আশার ক্ষীণ শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া যেটুকু তীক্ষ্ণ ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে আড়াল করিয়া এই কথায় সহসা জাগিয়া উঠিল—প্রচণ্ড একটা সর্ব্বনাশা আতঙ্ক! সর্ব্বশরীর মনে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "অমন কথা বলো না গো, সুশীলের বাপের মতের বিরুদ্ধে সে কেন তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে, তুমিই বা তাকে কোন্ হিসাবে সে কথা বল্‌বে? সে কাজ নেই—সে কাজ নেই, আমাদের তেমন কপাল নয়।"

স্বর্ণলতার হতাশাক্ষুব্ধ ও ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর চাপা দিয়া অনুকূলের ক্রুর কঠোর কণ্ঠ সপ্তমে বাজিয়া উঠিল, সেই শব্দে জানালার বাহিরের ফাটলে উপবিষ্ট একটা কালপেঁচা অকস্মাৎ ভয় পাইয়া চ্যাঁ চ্যাঁ করিতে করিতে চেঁচাইয়া উঠিয়া উড়িয়া গেল—স্বর্ণলতার দুর্ব্বল বুক তাহাতে দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল।

"কপাল আমি তৈরী কর্‌ব—কপাল আবার কি? কপাল নিজের হাতে, সুযোগ আমি নষ্ট হ'তে দেবো না—সুযোগ মানুষ দু'বার পায় না, তুমি আমায় সাহায্য না কর চুপ ক'রে বসে দেখ—কোন রকমে বাধা দিয়েছ কি মরেছ, এইটি জেনে রেখে দিও—এর বিরুদ্ধে একটি কথা কইবে কি গলা কেটে দুখান করে ফেলবো!"

একটা ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্বর্ণলতার বাম অঙ্গ স্পন্দিত ও সর্ব্বশরীর স্বেদজলে অভিষিক্ত হইয়া গেল, শ্বাস-প্রশ্বাস জীর্ণ বক্ষের মধ্যে

চাপিয়া থাকিয়া বহিরাগমনে একান্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করিল, তার পর কোন্ সময়ে মাথা ঘুরিয়া তিনি যে সশব্দে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন, জানিতেও পারিলেন না।

যখন তাঁর চৈতন্যোদয় হইল অবসন্ন দেহভার নিতান্তই হালছাড়া অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, অন্তর্জ্ঞানের উদয় হইলেও বহিঃপ্রকাশ একটু একটু করিয়া প্রকটিত হইতে লাগিল, মনে হইল, চিরসংযমের-বাঁধভাঙ্গা এ অবসাদ আর কখনও ঘুচিবে না, এই জীবন্মৃত অবস্থাতেই তাঁকে হয়ত থাকিতে হইবে। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে ভীত-ত্রস্ত গৃহবাসী অনুকূলের উচ্চ চীৎকারে তাঁর কক্ষে সমবেত হইয়া দেখিল, তিনি পাগলের মত বুক চাপড়াইতেছেন ও চেঁচাইতেছেন, "গিন্নি!—ওগো গিন্নি! বলি গিন্নি! —ওগো সত্যি কি আমায় ফেলে তুমি চ'লে গেলে? হ্যাঁ গা, পাষাণ কি তুমি! এমন করেই কি ভাসিয়ে যেতে হয়?"

নীলিমা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল, তার মা—সেই সর্ব্বংসহা মা!

শুভেন্দু এবং সুশীলও আসিয়াছিল? শুভেন্দু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যথিত চোখে মায়ের শাক-বর্ণ মুখের ম্লানচ্ছবি দেখিতে লাগিল এবং বাপের কান্নাকে মনে মনে রুষ্ট বিদ্রূপে তিরস্কার করিতে লাগিল, সুশীল শুধু নিজের আর্দ্রদৃষ্টি কোনমতে ফিরাইয়া এক ঘটি জল ও পাখা সংগ্রহ করিয়া মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষায় মনোযোগী হইল।

রোগিণীর চেতনা ফিরিলে অনুকূল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া সুশীলকে জড়াইয়া ধরিলেন, "বাবা সুশীল! তোমার জন্যেই শুভেন্দুর গর্ভধারিণী এ যাত্রা রক্ষা পেলেন, ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাবা! নৈলে আমার কি হত?"

গতকল্য হইতে রুক্ষভাষী, শুষ্কচিত্ত কৃপণের প্রতি যতটাই বিতৃষ্ণা

সুশীলের মনে জাগিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই সহানুভূতি তার স্থলাধিকার করিল, বাহিরে যত কঠোর দেখাক, অন্তরের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন প্রেমের নির্ঝর লুকান আছে, ইহা স্থির করিতেই না জানিয়া অবিচার করার গ্লানিতে সে নিজের প্রতি বিরক্ত হইল।

নীলিমা কাছে গেলে, স্বর্ণলতার চক্ষে একটা তৃষিত ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। রক্তরাগশূন্য পাংশু ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া তিনি কি যেন বলিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু কণ্ঠের মধ্যে সামান্য একটা অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না। সুশীল তাড়াতাড়ি মুখে এক চামচ জল দিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল, "চুপ করুন, মা! কথা এখন কইবেন না।"

তাড়াতাড়িতে সে জ্যেঠাইমা'র পরিবর্তে যে স্বর্ণলতাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহা তার কানে ধরা না পড়িলেও অনুকূল ও নীলিমা দু'জনকার কানেই উহা ঠেকিয়াছিল এবং ওই একটি শব্দই দু'জনের মনে দুই প্রকার অর্থ বোধ করাইল, নীলিমা এ ঘনিষ্ঠতায় এত বড় বিপদেও যেন একটা কূল দেখিতে পাইল এবং তার গুণমুগ্ধ মোহিত মনে এই আশাটা জাগিল যে, আজই সুশীল তাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না। অনুকূল মনে মনে বলিলেন, "নিজের মুখেই সম্বন্ধটা স্বীকার ক'রে নিলে বাছাধন, আর তুমি যাবে কোথায়? যাহোক, গিন্নি এ খেলাটা ভালই খেলেছে, চারটী বেশ সুষ্ঠ ভাবেই ফেলা হলো?"

সে দিন ঘরের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়েরই যাওয়া রদ হইল। কেহ কাহাকেও অবশ্য থাকিতে আমন্ত্রণ করিল না, কিন্তু বাড়ীর এই আকস্মিক বিপদে যাইবার কথাই বা কহিবে কে? তবে খানিকটা বেলা বাড়িলে এবং স্বর্ণলতা কিছু সুস্থ হইয়াছেন বিশ্বাসে নিজের চিন্তায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুভেন্দু মনে মনে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল। ট্রেণের সময় চলিয়া গিয়াছে মনে পড়িতেই ট্রেণ ফেলের কারণটাও মনে পড়িল, মায়ের

প্রতি মনুটা বিষম বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল—মা কি অজ্ঞান হইবার আর দিন পায় নাই? তারা চলিয়া গেলে অজ্ঞান হইলেও তো চলিত! সুশীল স্বর্ণলতার মাথার কাছে বসিয়া তাঁকে বাতাস করিতেছে, নীলিমা তাঁর পায়ের কাছে জড়ের মত বসিয়া আছে, মায়ের অর্দ্ধমুদিতচক্ষুর শিরাসঙ্কুল পাণ্ডুমুখের ভাবহীনতা ও অতি মৃদু শ্বাসমাত্রে জীবিতচিহ্নযুক্ত শীর্ণ দেহ তার ভয়ার্ত্ত মনকে যেন নিরাশ্বাসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া দিতেছিল। প্রাণপণে চোখের জলকে সে ঠেলিয়া রাখিলেও সমস্ত বুক জুড়িয়া প্রবল একটা ক্রন্দনের রোল উঠিয়া চিত্তকে তার হাহাকারে ভরাইয়া তুলিতেছে। অন্তরের সেই অব্যক্ত আর্ত্তনাদ কেবলই বলিতেছিল, "মা আমার আর উঠিবেন না!"—যে মানুষ জীবনে একদিনও রোগশয্যায় শোয় নাই, তার এই যে নিশ্চিন্ত শয়ন, এ যে তার শেষ শোওয়া,—সে খবর কি জানিতে বাকি থাকে!

শুভেন্দু আসিয়া বিরক্ত-বিরস মুখে ডাকিল, "নীলি!—শুনে যা।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলিমাকে উঠিতে হইল।

শুভেন্দু নীরস-স্বরে কহিল, "আমাদের আজকের গতিটা কি রকম হবে? ট্রেণ তো ওদিকে ফেল হয়ে গেল, আবার তো চব্বিশটি ঘণ্টা এই গারদ ঘরে বাস করতে হবে, একটু চা টা দেবে, না আজও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনেই সারবে?"

নীলিমা ভাইএর কথার ভঙ্গীতে ব্যথার উপর বেদনা বোধ করিলেও নীরবে সেটুকু সহিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "ক'রে দিচ্ছি, তুমি মা'র কাছে একটু বসবে?"

শুভেন্দু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, "কি করবো ব'সে?—'আমাদের ডাক্তার-সাহেব তো খুবই লেগে পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি! আমি বাপু

ওসবের মধ্যে নেই,—জানিওনে কিছু, আর পারিওনে। চল দেখি, চা আর কাল রাত্রের সেই ডিমের কালিয়ার ডিম যদি কিছু বাকি থাকে ত তাই-দুটো হাফ্‌বয়েল ক'রে দে, দুজনে কোনগতিকে ব্রেকফাষ্টটা সেরে নিই।"

নীলিমার বিষাদবিষণ্ণ মুখ ক্ষণেকের জন্য ঘৃণার বিরাগে আরক্ত হইয়া উঠিল, তার পর সে ভাব দমন করিয়া লইয়া সে সনিশ্বাসে এই কথাই ভাবিল, 'মা বাবার কাছ থেকে ওই-বা কি পেয়েছে যাতে ক'রে ওদের পরে শ্রদ্ধা ভালবাসা জন্মাবে? আমি তো জানি মা'র কি দুর্দ্দশা,—তবু কি সব সময় আমারই মাথার ঠিক থাকে? ও বেচারীও দুঃখী বড় কম নয়। স্নেহ না জানতে পারলে কি শ্রদ্ধা আসে!

অনুকূলচন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়াই চোখে হাত চাপা দিলেন, কাঁদো কাঁদো গলায় কহিলেন, "গিন্নীর মনে শেষে এই ছিল। এমন করে শুয়ে পড়লেন!—আহা, সুশীলকে যে একটু যত্ন আত্তি করবো, তারও আমার উপায় নেই বাবা সুশীল তুমি কিছু মনে করো না, বাবা! এ তোমার নিজের ঘর, তুমি নিজে দেখেশুনে নিয়ে কষ্ট ক'রে দুটো দিন থেকে যাও, আমি অকূলে একটু কূল পাই,—মাথায় আমার যেন বজ্রাঘাত পড়েছে!"

সুশীল সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া গিয়া আগ্রহ-প্রদীপ্ত মুখে তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, "কিছু ব্যস্ত হবেন না, জ্যেঠামশাই! জ্যেঠাইমা না সারা অবধি যেতেই পারবো না, আমি তো ডাক্তারী পড়েছি, সেদিক দিয়ে একটা কর্ত্তব্যও তো আছে।"

"বটে! ডাক্তারী পড়ছ? তা' হলে তো আর কথাই নেই! না হ'লে—এই এক্ষুণি মনে করছিলুম, যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারকে একবারটি না হয় ডাকিয়েই আনাই। বলি, হঠাৎ এমনটাই বা হলো কেন? তা' তুমি

যখন ডাক্তার রয়েছ, তখন আর বাইরের ডাক্তার এসে বেশী কি করতে পারবে।”

সুশীল উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া কহিল, “আমিও অপনাকে বলব ভাবছিলুম একজন ডাক্তার দেখানই ভাল। আমি এই তো দু'বছর মাত্র ভর্ত্তি হয়েছি। চিকিৎসার কি জানি। একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের দেখা খুবই দরকার, আমি তাঁর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হ'তে পারব অবশ্য।”

অনুকুল বিস্ময়-প্রদীপ্ত মুখে দ্রুতস্বরে উত্তর করিলেন, “বিচক্ষণ ডাক্তার! তুমি কোন ডাক্তারকে কখন বিচক্ষণ হ'তে দেখেছ? যতক্ষণ শিক্ষানবীশ থাকে, ডাক্তার ততক্ষণই ভাল। যেই প্র্যাকৃটিসনার হলেন, ভিজিট করলেন, অমনি তাঁর মাথাটি ঘুরে গেল! কিসে দুটোর যারগায় চারটে ভিজিট করবেন, এই চিন্তাই তাঁর জপমালা হলো, রোগী মেয়ে কি পুরুষ, তা'ও তাঁ'রা দেখবার অবসর পান না, কতকগুলি জিনিষ কাঁচাতেই মিষ্টি থাকে বাবা! ডাক্তার তা'র মধ্যে একটি।”

সুশীল যদিও ডাক্তার-জাতীয় জীবের সকলকেই ঠিক “ভ্যামপায়ার” জাতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিল না, তথাপি এ ক্ষেত্রে তাহাকে ঐক্যমত্যা-বলম্বন করিতেই হইল, প্রতিবাদ বৃথা জানিয়া নীরব হইয়া রোগীর দিকে চাহিতেই দেখিল, অসহায় ও আনায়-বদ্ধ জীব-বিশেষের মতই ভাষাভরা মৌন দৃষ্টিতে স্বর্ণলতা তাহারই মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছেন, সে দৃষ্টির উদ্বেলিত স্নেহসিন্ধু মুহূর্ত্তেই অনুভব করিয়া সুশীলের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহারই প্রতিক্রিয়ায় স্বর্ণলতার দু'চোখের কোণ গড়াইয়া দুইটি অশ্রুর ধারা বহিয়া গেল। সুশীল এ আশা নিরাশায় মিশান অশ্রুস্রোতের মূলানুসন্ধান না পাইলেও সে অশ্রু তার এই সেবাটুকু হইতেই যে সঞ্জাত, এই বিশ্বাসে স্থির করিল, ইঁহাকে সুস্থ না করিয়া সে এখান হইতে নড়িবে না—আহা বেচারী বড় দুঃখী, তারও ত মা নাই!

# চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীকে অচলার মত দেখাইলেও ভূগোলশাস্ত্রে যেমন তার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষের জীবনস্রোতকেও রুদ্ধগতি বোধ হইলেও কালচক্র যে গতি হারায় না, অতর্কিতে সে তাহা একদা প্রমাণ করিয়া দেয়। স্বর্ণলতার দশমবর্ষীয় জীবন-নদী চল্লিশের পরেও ঠিক একই খাদে প্রবাহিত হইতে থাকিলেও সে দিনের ভোরে সেই যে অকস্মাৎ স্রোতো-হত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই হইতে তাঁর জীবন-নদীর প্রবাহ পুরাতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। সুশীল যথাসাধ্য, এমন কি, তারও চেয়ে বেশী চেষ্টা করিয়াছিল—অর্থাৎ নিজে হালে পানি না পাইয়া গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে যজ্ঞেশ্বর ডাক্তার, নন্দলাল কবিরাজ, এমন কি, প্রতিবেশী কেরামতুল্লার অনুরোধে হাকিম নসীরকেও ডাকিয়া আনিয়া রোগী দেখাইয়াছিল, কিন্তু সকল ফলই সমান হইল ;—অর্থাৎ অফলা হইয়া গেল। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন পথাবলম্বীদের মধ্যে ঔষধ-নির্ব্বাচনে যতই অনৈক্য ঘটুক, রোগনির্ণয়ে একমত অবলম্বন করিয়াছিলেন, রোগ এপোপ্লেক্সি, রোগীর জীবনের ভয় আপাততঃ নাই, তবে ভরসাও কম, যে কোন উত্তেজনায় প্রাণবিয়োগ যে কোন মুহূর্ত্তেই ঘটিতে পারে। বাক্‌শক্তি ফিরিবে না।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, "এঁর ভাগ্যে এইরকম কিছু ঘটবে, সে যে-কেউ অনুমান করতে পারত, তবে এ অবস্থার চেয়ে মৃত্যু হলেই ভাল হতো এবং তা ঘটাও কিছু অসম্ভব নয়।

ডাক্তার চলিয়া গেলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুশীল ভাবিল,

বাস্তবিকই ডাক্তারীতে মানুষের মনকে কঠোর করে, আহা, বেচারী জ্যেঠাইমা! ওঁকে ভাল হওয়া চাই, নৈলে নীলিমার কি হবে?

সুশীল স্বর্ণলতার জীবন-মরণের মধ্যে যে নীলিমার জন্যই বিশেষ করিয়া চিন্তিত হইল, কারণ এ কয় দিনে সে কি-দিনে কি রাত্রে নীলিমার সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছে, তার অবস্থা যে কত শোচনীয় তাও সে বুঝিয়াছে। মা ভিন্ন জগতে যে তার মুখ চাহিতে দ্বিতীয় কেহ নাই, ইহা বুঝিয়াই এই দুর্ভাগিনী কিশোরীর প্রতি তার সহানুভূতির অবধি ছিল না। স্বর্ণলতাকে বাঁচাইবার চেষ্টা তার মুখ চাহিয়াই যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাই যজ্ঞেশ্বর বাবুর মন্তব্যে মনটা বিশেষভাবেই বিমর্ষ হইয়া গেল। এমন সময় দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিল, নীলিমা আড়ষ্ট কাঠের মতন দাঁড়াইয়া আছে, সে সবই শুনিয়াছে বুঝিয়া সুশীলের মনে বড় দুঃখ হইল, কাছে আসিয়া স্নেহশীল কণ্ঠে কহিল, "ও সব বাজে কথায় মন খারাপ করো না, আমি বলছি, জ্যেঠাইমা ভাল হবেন।"

দৈববাণীর মত এই দৃঢ় উচ্চারিত আশ্বাসবাণী নীলিমার দুঃখ-বিদারিত মনের উপর শীতল জলের ধারার মতই নিপতিত হইয়া তাহাকে যেন এক মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া দিল এবং গভীরতম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়া সে আত্মহারাবৎ সেই একমাত্র আশ্বাসদাতার দুই পায়ের উপর অকস্মাৎ আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া লুকাইয়া পড়িল।

সুশীল এই আকস্মিক বন্যাপ্লাবনের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না, সে নীলিমার এই কার্য্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কি বলিবে, কি করিবে, কি করিয়া উহাকে পায়ের উপর হইতে উঠাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ বিপন্নভাবে থাকিয়া অনেকখানি ইতস্ততঃ করিয়া নতদেহে বাহু ধরিয়া নিজের অশ্রু-ধৌত পদতল হইতে উঠাইবার

চেষ্টা করিয়া কহিল, "স্থির হও নীলিমা! অত কাতর হ'লে ত চলবে না, আমাদের ধৈর্য্যের উপরই যে জ্যেঠাইমা'র জীবন নির্ভর করছে, তা' কি বুঝতে পারছো না?"

নীলিমা সেই আকর্ষণে সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং যথাসাধ্য ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিতে করিতে অস্ফুট ও অস্থির কণ্ঠে কহিল, "মা গেলে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারবো না, তখন আমার কি হ'বে?"

সুশীলের বুকের মধ্যে এই হতাশাকাতর কণ্ঠের কাতর প্রশ্ন গভীর বলে আঘাত করিল, "আমার কি হ'বে?"—বাস্তবিক এ সংসারের যে বিধিব্যবস্থা তাহাতে মাতৃহীনা বালিকার পক্ষে এখানে পড়িয়া থাকা একান্তই অসম্ভব! রাত্রিদিন রোগীর সেবার সহিত সমস্ত সংসারের সমুদায় কার্য্যসাধন অকাতরে করিয়াও তাহাকে পিতার মুখের কঠোর কুৎসিত ভৎর্সনা ব্যতীত আর কিছু পাইতে সুশীল একটীদিনও শুনে নাই। মমতা-মথিত স্নেহভরে সে অকস্মাৎ নিজের কোঁচার কাপড়ে তার অশ্রুপ্লাবিত মুখ মুছাইয়া দিয়া উৎসাহদীপ্ত প্রফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল, "ভয় কি নীলু! আমরা দু'জনে জ্যেঠাইমা'কে বাঁচিয়ে তুলবো, চেষ্টা করলে কি না হয়?"

ভয়ের তাড়না কোথায় সরিয়া গেল—আর সেই স্থানে কি প্রবল হইয়া উঠিল—বুকভরা আনন্দ! এই স্পর্শ, এই কণ্ঠ, এই আদরের "নীলু" ডাক, এ' কি বস্তু নীলিমা আজ সুশীলের কাছে লাভ করিয়া বসিল? এ যে তার গোপন বাসনারও অতীত! এ যে তার ঘুমন্ত স্বপ্নেরও অগোচর! এই তরুণ হাতের কোমল স্পর্শের অনুভূতি তার অশ্রু-আর্দ্র কপালে আবীর গুলিয়া দিল; তার কান্না-ধোয়া চোখের পাতা ইহারই আবেশে বিহ্বল হইয়া নামিয়া পড়িল; তার থর-কম্পিত

দেহলতা এই আভ্যন্তরিক সুখোচ্ছ্বাসে যেন শিথিল হইয়া আসিল, কণ্ঠে তার ভাষা হারাইয়া গেল, বক্ষে প্রবল রুদিতোচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া রহিল।

সুশীল আরও কিছু বলিতে গিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর এমন একটি সুখের উচ্ছ্বাস ও আবেগের তরঙ্গ অতর্কিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অজ্ঞাতেই হিল্লোলিত হইতেছিল যে, সে আবির্ভাব কাহারও চোখ এড়াইয়া যায় না। কিন্তু না বুঝিলেও সুশীলের তরুণ কণ্ঠ ব্যাপিয়া লজ্জার রক্তিমা দ্রুত ফুটিয়া উঠিল, নীলিমা কি তার ব্যবহারে লজ্জা পাইল? বিনতার মত ব্যবহার কি সঙ্গত নয়? উঁহুঁ—নীলিমা তার কথায় খুব সান্ত্বনা পাইয়াছে।

স্বর্ণলতাকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য মুখ ফিরাইতেই সাম্‌নাসাম্‌নি হইয়া গেল অনুকূলের সহিত, অনুকূলের কুঞ্চিত শীর্ণ মুখে একটা বিজয়দৃপ্ত হিংস্র হাসি।

শুভেন্দু আর একটা দিন মা'র রোগ আরোগ্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, মা'র ভাল হইবার গতিক নয় এবং ডাক্তারের মুখে শুনিল এ রোগ আরোগ্য হইবে না—তখন সে ভোরের ট্রেণ ধরিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। পড়াশুনায় এত ব্যাঘাত জন্মান সঙ্গত বোধ হইল না, সুশীলও অবশ্য যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে কলেজ বন্ধ থাকার নজীরে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল এবং অনুকূলও তাকে থাকিবার জন্য অশেষ বিশেষে অনুরোধ করিলেন। নীলিমা উৎকণ্ঠিত ও উৎকর্ণ হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সুশীলের মুখে "আমি এখন যাব না"—শুনিতে পাইয়া তার হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে উল্লাসে লাফাইয়া একটা দোল খাইল।

সুশীল গেল না, ধনী-সন্তান চিরসুখ পালিত সুশীল দরিদ্রের দৈন্যের অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক শুধু তাদের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়াই রহিল

আর শুভেন্দু তার মা'র শেষটুকুর জন্যও অপেক্ষা করিতে পারিল না! অন্তরের দুই তারে হর্ষ-বিষাদের এই দুই বিভিন্ন সুর ধ্বনিয়া উঠিতে থাকিলেও নীলিমার বক্ষে যে আনন্দের সুরটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তার অজ্ঞাত নয়। মনে মনে বলিল, "তোমার এত দয়া না হ'লে কি আমার মন প্রাণ এমন ক'রে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়তো? কি ভাল তুমি! কত ভাল তুমি!"

অপরাহ্ণে সুশীল ও নীলিমা রোগীর দুই পাশে বসিয়াছিল, রোগী যথাপূর্ব্ব নিদ্রাচ্ছন্নবৎ পড়িয়া আছেন। অনুকূল ঘরে ঢুকিলেন, হাতে এক কৌটা চা এবং একটা বড় মোড়কে বাঁধা কয়েকটা জিনিবপত্র, ছেঁড়া ছাতাটা রাখিয়া নীলিমাকে বলিলেন, "এই সব নে', যা খুব ভাল ক'রে এক কাপ চা করে সুশীলকে দে' দেখি, আহা, দিনরাত খেটে বাছার আমার চাঁদ মুখটি শুকিয়ে গেছে!"

নীলিমা কিছু বিস্মিত এবং অত্যন্ত প্রীতভাবে বাপের হাত হইতে মোড়কগুলি গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করিতে উঠিয়া গেল। তার সংগৃহীত চা-চিনি সবই আজ হইয়া শেষ গিয়াছে তাই ভাবিয়া সুশীল থাকার আনন্দটাও যেন মনের মধ্যে অঙ্গহীন হইয়া পড়িতেছিল। এ কয় দিন কত দুঃখেই যে সে এ দু'জনের চা, জলখাবার ও লুচির ময়দা ঘি যোগাইয়াছে, তাহা সেই জানে, আর জানেন ঈশ্বর।

কাঠ-কুটায় উনান ধরাইয়া একটা ঘটিতে জল চড়াইয়া নীলিমা পাথর বাটিতে চা ভিজাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, চটিজুতার শব্দে বুকের সঙ্গে হাত কাঁপিয়া বাটিটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, ঘরে ঢুকিয়া এই কাণ্ড চোখে পড়িতেই সুশীল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"বাঃ, বাঃ, বাঃ—খুব কাজের লোক্! এ দিকে জ্যেঠামশাই আমায় তাড়া দিয়ে তুলে দিলেন যে, চা নাকি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! এখন দেখছি, চা জুড়িয়ে

পাথরবাটি হয়ে গেছে! উঃ, কি আশ্চর্য্য ম্যাজিক তুমি করতে জান, নীলু!"

নীলিমা তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা বাটি লুকাইয়া ফেলিয়া পাত্রান্তরে চা ভিজাইতে দিল ও কোন মতে বক্ষের দ্রুত স্পন্দন সংহত রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "বসুন, এখনই আমি চা করে দিচ্ছি।"

সুশীল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "বাঃ, 'বসুন' বল্লে যে বড়? তা হলে ত বসাই হবে না দেখছি! ভদ্রলোকেরা কি আর রান্নাঘরে বসে? বাইরের লোক, বৈঠকখানায় বসিগে'।"

নীলিমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নত চোখে চা ঢালিতে ঢালিতে ক্ষীণভাবে হাসিয়া বলিল, "তা হলে কি বলবো?"

সুশীল পুনশ্চ হাসিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, "বাঃ আর যেন বলবার মত কথাই নেই? 'বস' বল্‌তে পারো না? আমি বুঝি তোমার কাছে বাইরের লোক হয়েই থাকবো? আমায় অত পর মনে কর কেন বল তো? কৈ, আমি তো করি না—করি কি? সত্যি বলো? আমি কি তোমাদের পরের মতন করি! ও কি কর্‌ছো? বাটিতে ধরছে না—তবু ঢালতে হবে? কেন ওটা আর একটা বাটিতে ঢেলে নেওয়া কি যায় না?"

নীলিমা এ কথার অর্থ না বুঝিয়া সরলভাবে কহিল, "আপনি আগে ওটা খান, তা'পর ঐতেই বাকিটা ঢেলে দেবো।"

সুশীল গরম চায়ে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করিয়া ত্বরিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আবার সেই 'খান' 'খান' বল্লে কিন্তু খাবো না। তা দেখে নিও! এই রইল তোমার চা, আমি জ্যেঠাইমার কাছে চল্লুম।"

নীলিমা লজ্জায় ও আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিয়া স্মিতমুখে কহিল, "আচ্ছা—আর বলবো না—খাও—হয়েছে ত? যান—আপনি ভারী দুষ্টু!"

সুশীল কৌতুকে করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, "যান যান্—আপনিও কম নন!—ও কি! আমায় আবার দিচ্ছেন যে, ওটা ত আমি চাই নি, ওটা তুমি খাবে—না, না, আপনি খাবেন—অভ্যাস নাই? না-ই থাকলো? রাত জাগাও ত অভ্যাস ছিল না?—লক্ষীটি!—সত্যি খেয়ে ফেল। তোমার খাওয়া বড্ড কম হয়, আমি দেখেছি—কাল রাত্তিরে তুমি কিচ্ছু খাওনি অথচ আজ সেই দুপুরবেলা খেলে, রাত্তিরে আবার কি করবে—সে তুমিই জানো।"

নীলিমার চোখে জল আর চাপা থাকে না, এত করিয়া তার মত তুচ্ছকে যত্ন করা! তার কার্য্যকলাপ এমন করিয়া খুঁটিয়া দেখা, এও কি সম্ভব?—এই সুদর্শন, তরুণ, শিক্ষিত ধনী সন্তানের পক্ষেও সম্ভব? সহসা নীলিমার মনে হইল, এও তো হিন্দুর ঘরেই জন্মিয়াছে!—মা-বাপ ত এরও হিন্দু!—তবে এর মধ্যেই বা এমন উদারতা কোথা হইতে আসিল? ভুল, ভুল, নীলিমার জীবনের সবটাই প্রহেলিকা!

নীলিমাকে নিরুত্তর ও চিন্তিত দেখিয়া সুশীল তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং চা-পাত্রের বাকি চা-টা একটা মার্জ্জিত পাত্রে ঢালিয়া লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তার মুখে তুলিয়া ধরিল, "লক্ষীটি! খেয়ে ফেল, না খেয়ে খেয়ে এত খাটলে তুমি মারা পড়বে! তা' করলে হবে না, সে আমি শুনবো না, আমার কথা শোনো, খেয়ে ফেল।"

নীলিমার বক্ষ-শোণিত যেন কল-কল্লোলে সমুদ্রের তরঙ্গের মতই উত্তাল হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সর্ব্বশরীরে যেন সহস্র তড়িৎ-শিখা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল, হাত বাড়াইয়া সে চায়ের বাটিটা তুলিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিতেই, মনে হইল, ইন্দ্র-দেবতার হস্ত-পরিবেশিত স্বর্গীয় সুরাপাত্র সে যেন নিঃশেষ করিল! তার দেহ, মন প্রাণ, আত্মা সকলই যেন সেই সুধাসারে প্লাবিত হইয়া

সুধাস্রোতে তলাইয়া সুধামাখা হইয়া গেল। তার চিরদিনের দুঃখ, দারিদ্র্য, অত্যাচার, অবিচার সমুদায় যেন আজ নিঃশেষ হইয়া গিয়া তাহাকে কোন অজ্ঞাত পুলকের আলোকের মহাসাম্রাজ্যে সম্রাজ্ঞীর আসনে অধিষ্ঠিতা করিয়া দিয়া গেল।—তার পৃথিবী আর ধূলার ধরণী রহিল না, তার জীবনকে আর জীবন-সংগ্রাম মনে হইল না, তার বাসনারুদ্ধ কুমারী জীবনকে সুপরিতৃপ্ত কল্যাণ-পূর্ণ মহীয়সী মহিলার বরেণ্য জীবন বলিয়া সে গর্ব্বানুভব করিল।

সুশীল কিন্তু অত কথার ধার ধারিল না, সে নিজের ভাবে ভোর রহিয়াই হাস্যদীপ্ত উৎফুল্ল মুখে বলিতে লাগিল, "দেখ দেখি কেমন হলো! যাই বল কিন্তু, চা-টি শুধু নিজে খেয়ে সুখ হয় না—বেশ তিন চার জনে বসে বসে গল্পে সল্পে 'সিপ্' ক'রে ক'রে খাওয়া যা'বে তবে না! হ্যাঁ একটা কথা, জ্যেঠাইমা আজ ভাল আছেন—কেমন ক'রে জানলুম? বাঃ, আমি ডাক্তারী পড়ছি না বুঝি? তা'ছাড়া আরও শোনো, তুমি চ'লে এলে একটু পরেই জ্যেঠামশাই যখন আমায় চা খেতে আস্‌তে বল্লেন, জ্যেঠাইমা তখন যে কি ভয়ানক চম্‌কে উঠেছিলেন—একেবারে দু' চোখ ঠিকরে চেয়ে আমায় যেন মিনতি করে কি বল্লেন—কি বলতে চান, সেটা তো বোঝা গেল না, আমার মনে হলো, যেন আমি ওঁর কাছ থেকে না যাই এই বলছেন—কিন্তু জ্যেঠামশাই ঠিক উল্টোই বল্লেন, যা হোক্, এই বুঝতে পারাটাও তো ভালরই লক্ষণ।"

নীলিমা কিন্তু এই বর্ণনা শুনিয়া উৎকণ্ঠা চঞ্চল হইল, তার বাপের আকস্মিক মুক্তহস্ততা সুশীলকে ঠেলিয়া চা পান করিতে পাঠান এবং সেই সংবাদে মায়ের অর্দ্ধমূর্চ্ছিত চিত্তে আকস্মিক উদ্বেগের সঞ্চার—এ সবই কি কোন অর্থ-সঙ্গতিপূর্ণ ষড়যন্ত্র? অথবা—আর কিছু না ভাবিতে চাহিয়াই সে ত্বরিৎ উঠিয়া বলিল, "মার কাছে যাই—এতক্ষণ—"

বলিতে বলিতেই নজর পড়িল প্রস্থানোদ্যত পিতৃমূর্ত্তির উপরে—লজ্জায় অপমানে মুখ তার কালো হইয়া গেল, মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু বাপের উপর বিদ্বিষ্ট বিরাগে ইন্ধন চড়াইতে গিয়া সে অকস্মাৎ সবিস্ময়ে দেখিল্ সেই পর্ব্বতপ্রমাণ বিরক্তি ও অভিমানের বরফ গলিয়া সেখানে কৃতজ্ঞতার স্ফটিকনির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে! সুখাপ্লুত ও বেপমানা হইয়া সে মনে মনে পিতৃচরণোদ্দেশ্যে সেই বোধ করি প্রথম বার আন্তরিক প্রণিপাত জানাইয়া অন্তর্য্যামীর কাছে প্রার্থনা করিল, "হে ঠাকুর! যদি স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও থাক, তবে আমি যেন ওঁকে পাই—আমার বাবার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়! তিনি যা চাইছেন আমি বুঝেছি—কিন্তু আমার কি সেই ভাগ্য!"

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রখর সূর্য্যতাপতপ্ত ধরণীবক্ষে সে দিন প্রথম বারিপাত হইয়াছিল, তাহাতে ধরণীর মলিন অঙ্গ মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। ধুলি-মলিন আকাশের ম্লানিমা অপসৃত হইয়া সুপ্রসন্ন ও সমুজ্জ্বল নীলিমায় দিগ্বলয়ের সমুদায়টুকুই নয়নরঞ্জন শোভা ধারণ করিয়াছিল, বসন্তের শ্যামলতা এত দিন পরে ধুলিজাল ভেদ করিয়া লোক-লোচনে আত্মপ্রকাশ করিতে অবসর পাইয়াছে, মনে হইতেছিল, বরবর্ণিনী প্রকৃতি এত দিনে তাঁর ধুসর ওড়না অঙ্গ হইতে খুলিয়া নীল আঙ্গিয়া ও হরিৎ বসনে তনু দেহ সুসজ্জিত করিয়াছেন।

অনভ্যস্ত পরিশ্রমে ও দারুণ গ্রীষ্মে সুশীলের স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিতেছে,

দুই দিন জ্বর লুকাইবার পর আজ জ্বরটা একটু বেশীই হইয়াছিল, অনুকূল জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি নীলিমাকে দিয়া বিছানা করাইলেন, মাথার দিব্য দিয়া সুশীলকে শয়ন করাইয়া নীলিমাকে মাথায় বাতাস দিতে আদেশ দিলেন—নিজেই তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইয়া গেলেন। সুশীলের কোন আপত্তিই টিকিল না, দেখিয়া নীলিমার সন্ত্রস্ত-শঙ্কিত চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুশীল বিমর্ষমুখে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, পাখার বাতাস কপালে ঠেকিতেই উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিল, "খবরদার! বলছি, তুমি জ্যেঠাইমার কাছে যাও—কথা শুনছো না কেন?"

নীলিমা স্মিতমুখে উত্তর করিল, "ক'জনের কথা শুনবো?" বলিয়া সে নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল কিন্তু হাতের কাজ বন্ধ করিল না।

সুশীল দ্বিগুণ চটিয়া পাখাখানা ধরিয়া ফেলিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "ন্যায়ের পক্ষেই জয় থাকা সঙ্গত!—আমার তো কিছুই হয়নি, আসল ফেলে নকল নিয়ে বসলে চলবে কেন? লক্ষ্মীটি যাও।"

নীলিমার আজকাল সাহস বাড়িয়াছে, নিজের মনের দুরাকাঙ্ক্ষায় পিতৃদত্ত ইন্ধনের বলে সে এখন নিজেকে যথেষ্ট বলীয়ান্ মনে করিতেছিল, তাই জোর করিয়া পাখাখানা চাপিয়া ধরিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখ সুশীলের সম্মুখে অসঙ্কোচে উন্নত করিয়া দীপ্তমুখে কহিল, "নাও দেখি কেড়ে কেমন পারো, পারবে না।"

"পারবো না! দেখ তবে"—সুশীল নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া এমন হেঁচকা টান মারিল যে, পাখা ত কত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল, নীলিমাও তাল সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল।

"ছি ছি! কি করলুম!" বলিতে বলিতে সুশীল এক লম্ফে খাট হইতে নামিয়া নীলিমাকে টানিয়া তুলিল, নীলিমার একটা হাতে একটু

চোট লাগিয়াছিল, সে তাহা স্বীকার না করিলেও সুশীল সেই আহত স্থানের সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তার শুশ্রূষায় যত্নবান হইল, দুই একবার মৃদু আপত্তি করিয়া নীলিমা অগত্যাই থামিয়া গেল। ডাক্তার আসিলেন, তখন রোগীর জ্বর বড় একটা ছিল না; কিন্তু তাঁহাকে নীলিমার বাঁহাতে "বাড়" বাঁধিতে হইল। সুশীল অপরাধীভাবে দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। ঐ ভাঙ্গা হাতে কেমন করিয়া নীলিমা রান্না করিবে ভাবিয়া তার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল, অবশেষে থাকিতে না পারিয়া অনুকূলকে গিয়া বলিল—"নীলিমা তো রাঁধতে পারবে না, একটা বামুন খুঁজে আনবো ?"

অনুকূল তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "বিলক্ষণ! তুমি কোথায় খুঁজতে যাবে, আমি আনছি।"

এই কথা স্বর্ণলতার ঘরের মধ্যেই হইল, স্বর্ণলতার ডাগর চোখের দৃষ্টি ইহাতে ভয়ার্ত্তের মত দেখাইলেও সে দিকে কিন্তু কেহই দৃষ্টিদানও করিল না। দরখাস্ত এত শীঘ্র মঞ্জুর হইতে দেখিয়া সুশীলের খুসীর সীমা রহিল না, মনে মনে বলিল, "জ্যেঠামশাই মানুষ খারাপ তো নন! সকলকার পরে'ই তো যথেষ্ট যত্ন আছে।"

নীলিমার হাত সারিতে দিন পাঁচেক লাগিল, ইতোমধ্যে স্বর্ণলতার অবস্থা কিছু উন্নত হইলেও বাক্‌শক্তি যে তাঁর ফিরিবেনা তাহা জানাই গিয়াছে।—সুশীলের এখানে আসার পর দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, আজ তার পিসিমা তাহাকে বাড়ী ফিরিবার জন্য পত্র দিয়াছেন, ভুবন বাবুর শরীর সুস্থ নাই, এ দিকে বিনতার বিবাহের কথাবার্ত্তাও চলিতেছে, তরু স্বামীর কর্ম্মস্থান হইতে ছেলেমেয়ে লইয়া আসিয়াছে। এই সব নানা কারণে সুশীলের শীঘ্র ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক।

এক দিকে বাড়ীর জন্য, দিদির জন্য, পিতার জন্য উদ্বেগ এবং অপর

দিকে স্বর্ণলতা এবং নীলিমার জন্য উৎকণ্ঠা, দু' দিক হইতে দুইটা তরঙ্গ আসিয়া সুশীলের মনকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল।

অনুকূলের কাছে পত্রের উল্লেখ করিবামাত্র তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "সে কি হয়? গিন্নির এই অবস্থা, মেয়েটা কোন্ দিকে কি করবে? আর কিছু দিন থেকে যাও।"

থাকিবার উপায় নাই শুনিয়া যেন বিশেষ চিন্তিত ভাবেই কহিলেন, "তা' হ'লে আগামী কালকেই একটু হলুদ দিয়ে আগামী পরশু দিনেই—কি কালই না হয় শুভকার্য্যটা সম্পন্ন ক'রেই দিই?"

সুশীল বিস্ময়ে অবাক হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার বাক্যের অর্থবোধ করিতে পারিল না দেখিয়া, অনুকূল পুনশ্চ সুস্পষ্ট স্বরেই কহিলেন, "নীলিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একসঙ্গেই আমায় ত তোমার বাপের কাছে পাঠাতে হ'বে, তা'র পর এই আধমরা স্ত্রী নিয়ে আমার যা দশা হয় তা' হোক—কিন্তু বিয়ের দেরি তো করা চলে না।"

সুশীল কোনমতে ভাষা খুঁজিয়া লইয়া সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল, "বিয়ের কথা আপনি কি বলছেন?—কাল পরশু বিয়ে দেবেন বলছেন, এর মানে কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে'!"

অনুকূল শান্ত ও সংযত স্বরে উত্তর দিলেন, "নীলিকে তুমি যে পছন্দ করেছ, তা' আমি জানি—সেও তোমার জন্যে যে ছটফটিয়ে মরছে, তাও আমার অজানা নেই, বিয়ে তোমাদের তো দিতেই হবে—এ ছাড়া এর উপায় কি?"

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া সুশীল যেন বিমূঢ় হইয়া গেল, ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বাক্যহারা থাকিয়া বিস্ময়ের সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস তার বক্ষে ঈষৎ সংহৃত হইয়া আসিলে কণ্ঠ হইতে একটা শিথিল ধ্বনি স্খলিত হইয়া আসিল—"বাবার মত জিজ্ঞাসা করে তাঁরই সঙ্গে কথা কোন।"

অনুকূল একটি ডাবা হুকায় তামাকু টানিতেছিলেন, একরাশি ধোঁয়া মুখ হইতে বাহির হইতে দিয়া কহিলেন, "ওহে ছোকরা তা' কি আর আমি না করেছি, তিনি কোন্ জমীদারের মেয়েকে কবে নাকি বাগদত্ত হয়েছেন, গরীবের মেয়েকে বউ করতে রাজী ন'ন।"

সুশীলের যেন ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন টুটিল! চটকাভাঙ্গা হইয়া সে মুহূর্ত্তে দূর অতীতে ফিরিয়া গেল—তার মনের সিংহাসনে আলোকময়ী বালিকা-প্রতিমার মূর্ত্তিখানি তেমনই তো প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।—সেই চাবুক খাওয়ার দিনের কথা মনে পড়িল—তার পর আরও কত দিন দুই জনের চাক্ষুস হইয়াছে, দেশের বাড়ীর নিমন্ত্রণে, কলিকাতার চিড়িয়াখানায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, একজিবিসনে, বায়স্কোপে, তাদের কলিকাতার বাটীতে নিমন্ত্রিতা সুলেখা মা-বাপের সঙ্গে কতবারই আসিয়াছে—সে সব কি ভুলিবার? ভুবন বাবুর সেই প্রাণভরা 'মা! মা!' ডাক। সে যে তিনি কতই প্রাণের মধ্য দিয়া ডাকেন, সুশীল কি তার মর্ম্ম জানে না? সুলেখার মুখের সেই সুলোহিত রক্তোচ্ছ্বাস, সেই সলজ্জ মন্দ হাস্য, সেও যে চির অবিস্মৃত স্মৃতির মতই বুকের মধ্যে আলো হইয়া আছে। সে ছবি তো এতটুকু ম্লান হয় নাই!—বিশেষ পিতার মনোনীতা বাগদত্তা সে। মনে মনে নীলিমার জন্য সুশীলের একটা ব্যথা বোধ হইল, এত দিন এ ভাবে সে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তার কথা ভাবিয়া দেখে নাই; কিন্তু কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িয়াছে, তখন বারেকের জন্য মনে হইল, চিরদুঃখিনী নীলিমার হয় ত দুঃখ সে বাড়াইয়া দিল! কুণ্ঠিত মৃদুবাক্যে কহিল, "বাবা যখন অমত করেছেন, তখন আমার ত কোন হাত নেই জ্যেঠামশাই!"

অনুকূলের তামাকুবর্ণে অনুরঞ্জিত ওষ্ঠাধরে একটা তীক্ষ্ণ হিংস্রহাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বের সেই শান্তসংযত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক

কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার বাবা না হয় অমত করতে পারেন, কিন্তু তুমি কি ক'রে করবে? ভদ্রসন্তান হয়ে একটা ভাল লোকের মেয়ের মাথা খেয়ে তা'কে পরিত্যাগ ক'রে যাবে, এও কি ধর্ম্মে সইবে ভেবেছ? না এ ন্যায়ের রাজ্যে আমরাই তাই সহ্য ক'রে নেবো?"

সুশীলের সমস্ত শরীরের মধ্যে জ্বলন্ত ধাতুর তরল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল, কর্ণে তার যেন একসঙ্গে সহস্র কামান দাগিয়া দিল, সে ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল কণ্ঠে আর্ত্তনাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ কি বলছেন আপনি আমায়? আমি?—আমি—আমাকে, এই সব কথা আপনি কি করে বল্‌ছেন!"

এই বারংবার "আমি" ও "আমায়" শব্দ দিয়া কি ঘোর বিস্ময়, কি নিরতিশয় অভিমান, কি তীব্র উগ্র ব্যথিত ভৎর্সনা ও অকথ্য ভীতি সে প্রকাশ করিতে গেল, তাহা বুঝাইবার নহে, সমস্ত প্রকৃতি যেন সেই অকথ্য অভিযোগের অপরিসীম লজ্জায় মুহ্যমান ও বিস্ময়াতঙ্কে সুশীলেরই সহিত সমানভাবে বজ্র-স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সুশীলের বক্ষের মধ্যে রুদ্ধ-শ্বাস যেন জগতের সমুদয় বায়ুস্তরকে পরাস্ত করিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িল, তার অন্তরের রাশি রাশি লজ্জায় সম্মুখের খর সূর্য্যকিরণ যেন মসীবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু প্রকৃতি যে লজ্জায় মুখ ঢাকা দিলেন, মানুষ যে তাহা নিজেই দান করিয়াছে, তার হীন চিত্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, এবার উগ্র ও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্লেষের স্বরে উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ তুমি!—তুমি!—তুমিই!—তুমি আমার সতের বছরের আই-বুড় মেয়েকে কোলে জড়িয়ে নিজের কোঁচার কাপড়ে মুখ মুছাওনি? তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়ের সঙ্গে এক বাটির চায়ে চুমুক দাও নি? তোমায় সে লুকিয়ে বাপের টাকা চুরি করে মাঝরাত্রে গরম লুচি ভেজে চব্যচুষ্য রেঁধে বেড়ে খাওয়ায় না?

তোমার শোবার ঘরের খাট থেকে প'ড়ে গিয়ে তার হাত ভেঙ্গে যায় নি কি? আমি ও সবের 'আই-উইট-নেস', আদালতে হলপ ক'রে সাক্ষী দেবো, আমার মেয়ে নিজের মুখে এ সব—আরও অনেক কথাই স্বীকার করবে—তখন তুমি করবে কি? আর তোমার বাপের মুখখানিই বা তখন কতটুকু হয়ে যাবে? ভেবে দেখ, আমি অমনি ছেড়ে দেবো—তা মনেও করো না!"

যদি সুশীলের ভাল করিয়া কিছু মনে করিবার অবস্থা থাকিত, তবে সে হয়ত ধরণীকেই দ্বিধা হইবার জন্য শুধু সকাতরে অনুরোধ জানাইত, কিন্তু তা'ও তার নাকি ছিল না, তাই সে শুধু অতলজলে অর্দ্ধমগ্ন—অভাগার মতই উর্দ্ধ স্বরে উচ্চারণ করিল—"ভগবান্!"

অনুকূল শ্লেষপূর্ণ কঠোর কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গেই কহিয়া উঠিলেন, "কি করবে তোমার ভগবান্? তোমার হয়ে হাকিমের কাছে সাক্ষী দেবে? আমি দেবো—এই চোখেই সমস্ত দেখেছি তো! হ্যাঁ আর আমার মেয়েও দেবে, মনে করো না সে তোমার দিক নিয়েচে! সে তোমায় পাবার জন্যে যে মরছে, সে কি আর আমি বুঝিনি মনে কর? তুমি হেঁটে গেলে সে বুকে ব্যথা পায়, বুকপেতে দিতে চায় তাও বুঝি—সেটা তুমিই কোন না জানো! তার চেয়ে বিয়েটা ভালয় ভালয় ক'রে যাও। বাপ দু'দিন একটু বিরক্তই হ'বে, তার পর একমাত্র ছেলে তুমি, বউও তার খুব কালো কুৎসিত হ'বে না, দুদিনে ভুলে যাবে।"

সুশীলের চক্ষের অন্ধকাররাশি ও বক্ষের অনিশ্বসিত বায়ুপ্রবাহ জমাট বাঁধিয়া তার ভিতরে বাহিরে যেন একটা প্রলয়ঝটিকার সৃষ্টি করিয়াছিল, বক্ষের শোণিত তরঙ্গ তুফানের বেগে কলকল নাদ করিয়া উঠিতে লাগিল, অশ্রুর নির্ঝর ঠেলিয়া কোনমতে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে সে উত্তর করিল—"আমি নীলিমার সঙ্গে বিনতার চেয়ে ভিন্ন ভাবে কোন ব্যবহারই

করিনি—” তার পর আর কোন কিছুই বলিতে পারিল না। এর চেয়ে বেশী কিছু বলিতে তার আত্মমর্য্যাদায় একান্তভাবেই আঘাত লাগিল! বলিবার আছেই বা কি?

অনুকূলের চোখ দুইটা আভ্যন্তরিক উল্লাসে বাঘের চোখের মতই উজ্জ্বল দেখাইল, তিনি আবার বেশ সহজ স্থির কণ্ঠেই কথা কহিলেন, বলিলেন, “কোলে ক’রে চুমু খাওয়া অত বড় পরের মেয়েকে—তা’র পর ডাক্তার যে নীলির হাতে ‘বাড়’ বেঁধেছিল, সে নীলিকে কোথায় দেখতে পেয়েছিল, সে কথাও তো সে বলতে বাধ্য! তা’ এ সবগুলোকে আদালতে দাঁড়িয়ে কি বোনের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রমাণ করতে পারবে সুশীল?”

সুশীল আতঙ্কে ভরা আর্ত্ত চোখে নিঃশব্দে বারেক আততায়ীর প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল এবং দুই জানুর মধ্যে সেই ঢাকা মুখ লুকাইল, অসংবরণীয় বিপুল ক্রন্দনের বেগকে সে আর যেন ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, এ কি অকথ্য কলঙ্কের ডালি নিরপরাধে তার মাথায় চাপিল? এর বিপুল লজ্জা, নিদারুণ ঘৃণ্য অপমান তরুণ কিশোর প্রাণে আর যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

সুশীলের বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল, কিন্তু না, না, না—কাঁদিবে সে কার কাছে? পাষাণ! পাষাণ! পাষাণ!—একটা-নির্ম্মম রক্তলোলুপ রাক্ষসের মত, অথবা মনুষ্যচর্ম্মাবৃত প্রস্তরস্তূপের মত এই অমানুষের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সে এর পায়ে ধরিয়া কাঁদিবে?—কখন না—কখন না, তার চেয়ে এর মেয়েকে বিবাহ—সেও ভাল।

ইহা ভাবিতে গিয়াও ঘৃণায় সুশীলের সর্ব্বশরীর মন গুটাইয়া ছোট্ট হইয়া গেল। নীলিমার উপরও মন তার বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল, এই পিশাচের মেয়ে, সেও কিছু কম পিশাচিনী নয়! তবে আগাগোড়াই হয়ত তাকে

লইয়া ইহারা একটা ঘৃণিত চক্রান্ত গড়িয়া তুলিয়াছে। নীলিমা নিশ্চয়ই এর মধ্যবর্ত্তিনী, সে নিশ্চয়ই সমস্ত জানে এবং স্বেচ্ছায় এর প্রধান ভূমিকা লইয়াছে! তার অহেতুক জড়িমা, অকস্মাৎ লালিমা, অনাবশ্যক লজ্জাভিনয় এ সকলেরই আজ সুশীল যেন একটা মূল দেখিতে পাইল, এসব তার অভিনয়োৎকর্ষ, তাকে ফাঁদে ফেলিবার প্রচেষ্টা!—সে যখন ছোট বোনের মত স্নেহভরে তার সঙ্গে অসঙ্কোচে মেলামেশা করিয়াছে, এই পিশাচের দল তখন তার সেই সরল বিশ্বস্ততার এত বড় নির্ম্মম প্রতিদান কল্পনায় নিষ্ঠুর চক্র গঠন করিতেছিল!—তবে কি স্বর্ণলতার রোগের মধ্যেও কোন হীন কৌশল—হেয় অভিনয়—

সুশীল নিজের চিন্তার আঘাতে নিজেই আহত হইয়া মাথা তুলিল, নিজের মনকে পীড়ন করিয়া বলিল, "তুমি—এত ছোট, এত নীচ হয়ো না—জ্যেঠাইমা-বেচারী নিশ্চয়ই এর মধ্যে নেই"—সর্ব্বশরীর শিহরিয়া তুলিয়া সহসাই সে দিনের সেই ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল—সেই যে দিন বড় আদরে গৃহস্বামী—এই জটিল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা—নিজে যাচিয়া ঠেলিয়া মেয়ের কাছে তাহাকে চা খাইতে পাঠাইতেছিলেন!—সে দৃষ্টি যে একান্ত মিনতিভরা নিষেধদৃষ্টি—সে দিনও এ সংশয় তার মনে জাগিয়াছিল, আজ সে নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। জ্যেঠাইমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা এ চক্রান্তের কোন আভাস তাঁর অর্দ্ধচেতনার মধ্যে জাগ্রত হইয়াই যেন তাহাকে সে দিন সাবধান করিয়া দিতে চাহিতেছিল, মূঢ় সে—তখনও কেন বুঝিতে পারিল না?

শিকারী যেমন ব্যগ্র আনন্দে শিকারকরা পাখীর মৃত্যুযন্ত্রণা নিরীক্ষণ করে, তেমনই করিয়া প্রসন্ন মুখে অনুকূল আবৃত-মুখ সুশীলের যন্ত্রণার্ত্ত মূর্ত্তির প্রতি স্থিরচোখে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "ওষুধ ঠিক ধ'রেছে!—প্রকাশ্যে প্রফুল্লভাব দমনে রাখিয়া পরম গম্ভীর মুখে কহিয়া

গেলেন—"বেশ ক'রে ভেবে দেখ সুশীল! হয় কালই তোমায় নীলিকে বিয়ে করতে হয়, না হয় কালই আমায় ফৌজদারীতে তোমার নামে নালিশ দায়ের ক'রে দিতে হয়, এর আর তৃতীয় পন্থা নেই!—ও মেয়ে আর কেউ তো বিয়ে করবে না, আর না জেনে করলেও তাতে মেয়ের পক্ষে অন্যপূর্ব্বা দোষ তো হ'বে, তাছাড়া ভেতরে যদি—আর কিছু ব্যাপার জন্মেই থাকে, বলাও তো যায় না। বিয়ের সব ঢাকা পড়ে যাবে। বিয়ে না কর, খবরের কাগজে শুদ্ধু এই কেলেঙ্কারী ব্যাপারে নামটী উঠবে, আমার তা'তে লজ্জা নেই, আমরা গরীব মানুষ, বড় লোকের অত্যাচার আমাদের উপর কি রকম ভাবে পড়ে সেটা দশে ধর্ম্মে দেখতে পেলে তা'তে আমাদেরই লাভ—বরো, তোমাদের চেষ্টা চরিতে আদালত জোর ক'রে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে যদি নাও দেয়, অন্য কোন দেশভক্ত ছেলে ওকে 'মর‍্যাল ক্যারেজ' দেখাবার জন্যে হয়ত তখনই বিয়ে ক'রে নেবে; কিন্তু তোমার ত অন্ততঃ পাঁচটি বছর ঘানি টানা বন্ধ করাতে কারু বাপের সাধ্য হবে না! সেইটী ত তোমার জন্যে থাকবেই!—তুমি চিন্তা কর, আমিও ততক্ষণ সবাইকে খবরটা জানিয়ে আর পুরুতের নাপিতের, টোপর মালা আর আভ্যুদিক জিনিষের ব্যবস্থা পত্র ক'রে আসি?—পরশু দিন তোমাদের ট্রেণে চাপিয়ে তোমার বাপকে 'তার' ক'রে দিলেই হবে—তার চাইতে একেবারে গিয়ে দাঁড়ানই ভাল, ছেলে বউএর মুখ দেখলে ভুলে যাবে 'খন।"

বলিয়া বারেক সুশীলের যথাপূর্ব্ব শুষ্কায়িত মুখের উদ্দেশ্যে একটা ক্রূর কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অনুকূল প্রস্থান করিলেন, আর সুশীল তেমনই কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ব্যথাহত, একই অবস্থায় বসিয়া রহিল।

# ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

শুষ্ক-জরা পুষ্পঝরা শীর্ণ শাখায় নববসন্তের নবপত্র মুকুলে যে নূতন শোভার সমাবেশ করে, কোকিলের কুহুতে, পাপিয়ার প্রিয়ানুসন্ধানে, শ্যামা-দোয়েল বুলবুলের আনন্দ গীতির মধ্যে যে উৎসব সমারোহ চলিতে থাকে, তরুণ জীবনে যখন নববসন্তের সমাগম হয় তখন সেখানেও ঠিক ইহারই অনুকরণ চলে। নীলিমার শীত-শীর্ণ হৃদয় কাননেও বসন্তাগম ঘটিয়াছিল, তার অনাদৃত জীবন যৌবন এত দিনে সহসা ফাল্গুন সমাগম লাভ করিয়া সার্থক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তার অন্তরের সুপ্ত কামনা-রাশি জাগ্রত হইয়া প্রেমের মুকুলকে মুঞ্জরিত করিয়া তুলিতেছে, তার বসন্ত-পুষ্পা-ভরণা জীবনোদ্যান ভরিয়া আশারূপী কোকিলের পঞ্চম স্বর—কল্পনারূপিণী বাণীর বীণার ঝঙ্কার—নব নব বাসনার পুলক-সঙ্গীতে পাপিয়া-দোয়েলের মধু কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল। এরই মধ্যে নীলিমা কত রূপেই তার মনের মন্দির সাজাইয়া তুলিয়াছিল। পিতৃ ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া সুশীলের অপর্য্যাপ্ত আদর যত্ন লাভ করিয়া নিজেকে সে উচ্চা-কাঙ্ক্ষার চরমে উন্নীত করিয়াছিল, তার সকল কর্ম্মের মধ্যে তার আগ্রহ আনন্দ ও উন্মাদনার অন্ত ছিল না। প্রভাত হইতে দিবসান্ত পর্য্যন্ত যেমন তার হস্ত পদের বিশ্রাম ছিল না, মনের ভিতরও তেমনই আনন্দময় কল্পনার স্রোত সমান গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। এ বাড়ীর চির নির্দ্ধারিত কদন্ন সে কোন দিনই সুশীলের পাত্রে পরিবেশন করিতে পারে নাই, অনেক রাত্রে ইচ্ছা-বিলম্বে পিতার শয়নের পর গরম লুচি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন সযত্নে রন্ধন করিয়া সে কি পরিতৃপ্ত সুখেই সুশীলের সম্মুখে নিবেদন করিয়া দিত, সে আনন্দ তার জানাইবার স্থান কোথায়?

এই সংগ্রহ কত দুঃখেই যে তাহাকে করিতে হয়, সুশীল যদি বিন্দু-বিসর্গও জানিত ত কখনই সে এর কণিকামাত্র গ্রহণ করিত না, কিন্তু সে যে তার এই গোপন দুঃখ জানে না, সেই ভরসাতেই না সে নিজেকে এত বড় দুঃসাহসের কার্য্যে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছে, এইটুকুই যে তার পরম পুরস্কার! চিরসুখাভ্যস্ত এ সংসারের সকল নিয়মের সহিত তার তো পরিচয় নাই, সে স্বপ্নেও জানে না, তাকে ঐটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে নীলিমা কত বড় ত্যাগ স্বীকার এই দিনের পর দিন ধরিয়া করিয়া চলিয়াছে।—তাই সে অবলীলাক্রমেই সেগুলি সহজভাবে গ্রহণ করিতেছিল, কিন্তু নীলিমার আত্মা পর্য্যন্ত যেন এই দানের মোহে ও ত্যাগের সুখে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। সে ন্যায় ও অন্যায়ের হিসাব পর্য্যন্ত খতাইতে ভুলিয়াছে!

সেদিন অনুকূল বাড়ী ফিরিলে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, নীলিমা তাহা জানিত না, সে রান্নাঘরে গজা, নিমকি প্রস্তুত করিতেছিল। সকল কাজ স্বহস্তে না করিলেও প্রবল ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহায়তায় সে আজকাল অনেক কিছুরই প্রস্তুতপ্রণালী আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। গরম খাবার পরিমার্জ্জিত রেকাবে সাজাইয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া সে প্রফুল্ল স্মিত মুখে সুশীলের সন্ধানে চলিল।

বেলা তখন অবসানের পথে ঢলিয়া পড়িয়াছে, সুবর্ণোজ্জ্বল আলোকের বন্যায় ধরিত্রী স্নাত হইতেছিল; আকাশের অঙ্গেও সে আলোর লহরী ইন্দ্রভবন রচনা করিতেছে, জনবিরল বাড়ীটার কোথাও সাড়া ছিল না, নীলিমা নিজ অন্তরের পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া মৃদুমৃদু গাহিয়া উঠিল—

"অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে!"

সিঁড়ি উঠিতেই সাম্‌নের দালানের একটু মাত্র দূরে দেওয়ালের

গায়ে পিঠ রাখিয়া কে বসিয়া রহিয়াছে? কে'? এ'কি! সুশীল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মুহ্যমান হইয়া আছে!

এই ভাঙ্গা বাড়ীটার সমস্ত ছাত প্রাচীর একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে যত না স্তম্ভিত হইত, এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে নীলিমার পুলক-চঞ্চল চিত্ত তদপেক্ষাও বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া গেল। হাস্যোদ্ভাসিত মুখ তার মুহূর্ত্তে কালিমাময় হইয়া উঠিল, ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া শ্লথ চরণে ধীরে ধীরে সুশীলের দিকে অগ্রসর হইল—আর সেই সঙ্গে তার বিকশিত হৃৎপদ্ম মুদিত হইয়া গেল। বোধ হইল, তাকে ঘিরিয়া অকস্মাৎ একটা প্রলয়ান্ধকার সবেগে মাথা তুলিয়াছে।

নিকটবর্ত্তী হইয়াও যখন সে সুশীলের দিক হইতে কোনই সাড়া পাইল না, তখন কিছু যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও সেটা যে কি, এর কোন আন্দাজ পর্য্যন্ত না পাইয়া শঙ্কিতমুখে স্তব্ধ থাকিল। সুশীল মুখ তুলিল, কিন্তু এ কি তার দৃষ্টিতে—সেই ঘৃণাভরা ক্রুদ্ধদৃষ্টি একটি ক্ষণের মধ্যেই যেন তাহাদের মধ্যকার সকল ঘনিষ্ঠতা সমস্ত পরিচয়কেই বিলুপ্ত করিয়া দিল, অটল অভেদ্য হইয়া তাহা নীলিমার গতি ও বাক্য একসঙ্গেই রোধ করিয়া দিল।

দুই জনের কেহই কোন কথা কহিল না, বহুক্ষণ সুশীল আরক্ত ও কঠিন দৃষ্টি শূন্যপথে সংন্যস্ত রাখিয়া অবশেষে আর একবার অজানা ভয়ে আড়ষ্ট নীলিমার মৌন নতমুখে স্থির করিল, সার্চ্চলাইট যেমন করিয়া নদীর তলদেশ ভেদ করিতে চায়, তেমনি করিয়া সেই তীক্ষ্ণ রুক্ষ দৃষ্টি যেন পাষাণে পরিবর্ত্তিতা নারীর অন্তরদেশ উলটিয়া দেখিতে চাহিল। সহসা বাপের উপরকার সকল বিদ্বেষ, সকল বিরক্তি, সমস্ত ক্রোধই যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া ইহার উপরে নিপতিত হইল,

সুশীলের জ্বালা-ভরা চিত্ত, অপমান পীড়িত চিত্ত, নীরব কোপে জ্বলিতে জ্বলিতে সিদ্ধান্ত করিল এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে নীলিমাও জড়িত আছে। সুশীল নিঃশব্দে উঠিয়া নীরবে প্রস্থান করিল—আর সেই সঙ্গে নীলিমার চোখের সামনে সারা বিশ্বটা কালো এবং পদতলের অবলম্বন ভূমিকম্পে দুলিতেছে বলিয়া অনুভূত হইল।

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কি হইল? কেন হইল? কিসের জন্য হইল? কিছুই যদি খুঁজিয়া না পাইয়াও কাহাকেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে কার্য্যের চাইতেও কারণটার জন্যই সে একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে—কি করিলাম যে অমন করিয়া গেলে?—এই প্রশ্নটাই নীলিমার মনে সব চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—কিছু যে ঘটিয়াছে, এবং সেটা যে সামান্য কিছু নয়—সে যে নীলিমারই সর্ব্বনাশের আয়োজন—সেই কথাটাই শুধু এই আকস্মিক ব্যাপারের এই অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যের তলদেশ হইতে ভাসিয়া উঠিতেছিল—আর সবই প্রচ্ছন্ন! আসন্ন সন্ধ্যার সেই আলোছায়াভরা সন্ধিক্ষণে নীলিমার সমুজ্জ্বল, পরিপূর্ণ চিত্ত অতলের অন্ধকারে আছাড় খাইয়া উর্দ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"আমার সব গেল—সব গেল!"

যার থাকে, তারই যায়, যার ছিল না, তার কোথা হইতে কি যাইবে?—এই সাধারণ হিসাব পড়িয়া আছে, কি আশ্চর্য্য, নীলিমার সে কথা মনেও তো হইল না!—তার ছিল কি? তার গেল কি?—

কোন হিসাবই করিল না, শুধু বেদনার তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ প্রাণ হু-হু করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে দারুণ জ্বালার সহিত অনুভব করিতে লাগিল যে, তার সব গেল!—সব গেল!—সে যে কতখানি পাইয়াছিল হারাণোর সঙ্গেই অনুভব করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণ সায়াহ্নে ও সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত হইল। জন-বিরল পল্লী প্রায় নিঃসাড় হইয়া আসিয়াছে, মধ্যে মধ্যে পাদচারী পথিকের গমনাগমন, পথচারী কুক্কুরের সতর্ক চীৎকারে অনুসূচিত হইতেছে মাত্র। অদূরে পোড়ো জঙ্গলে শৃগালরা কোলাহল করিয়া উঠিতেই কুকুরগুলা তার স্বরে ডাকিয়া নীরব করিয়া দিল। বাড়ী নিস্তব্ধ—ঘোর নিস্তব্ধ, সাড়া নাই, আলো নাই। নিবিড় অন্ধকারে সাবধানন্যস্ত পদক্ষেপে কেহ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিল। আর একটু হইলেই আগন্তুক একই ভাবে অবস্থিত নীলিমার ঘাড়ের উপরেই পড়িত, কিন্তু ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়া সে গতি রুদ্ধ করিল এবং চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল—“নীলি?—জেগে আছিস? একটা আলো জ্বেলে আন্ দেখি।”

কোন্ অন্ধকারের গুহা-গহ্বরাশ্রিত পলাতক মনটাকে টানিয়া আনিয়া নীলিমা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তার উপর দিয়া এই কয় ঘণ্টার মধ্যে যে কত বড় ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তখনই অনুভব করিতে পারিল—কি অপরিসীম অবসাদগ্রস্ত তার সমস্ত শরীর মন!

দীপ হাতে ফিরিয়া আসিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে হাতের প্রদীপ ত তার পড়িয়া গেলই, নিজেও যেন পতনোন্মুখী হইল। হয় ত মূর্চ্ছিত হইত, যদি না সেই মুহূর্ত্তে বাপের কঠোর ভৎর্সনার আঘাত অবসন্ন চিত্তকে ব্লিষ্টার প্রয়োগের মতই চেতাইয়া তুলিত। অনুকূল মেয়ের কাণ্ডে অসহিষ্ণু হইয়া চাপা তর্জ্জনে গালি দিয়া উঠিলেন—

"দিন দিন কচি খুকী হচ্ছিস নাকি! ভাঙ্গলী-তো পিদীমটে? বড় লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্চি বলে আহ্লাদে মাথার ঠিক নেই না কি?—যা শীগ্‌গির যা, একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে এসে টোপর, চেলি, কলা, পান, হলুদ, বাতাসা সব ভাল ক'রে তুলে পেড়ে রেখে দে'। আর খাবার দাবার যদি কিছু তোমার গুষ্টির পিণ্ডি থাকে তাই নিয়ে এস গে, কাল আবার উপোস করে মরতে হবে ত তোমার চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডী চট্‌কাতে!—যাও না, উদাসিনী রাজ-কন্যের মতন অবাক্ হয়ে দেখছো কি আমার মুণ্ডু? টোপর কখন চোখে দেখ নি, না আমাকেই চেনো না?"

নীলিমা এ আদেশও পালন করিল—কেমন করিয়া যে করিল, সে কথা সে নিজেও জানে না। কাপ্তেনের হুকুমে অকূল সমুদ্রের ভীষণ ঝটিকামধ্যেও যে অভ্যাসে ভীত নাবিকরা হাল ছাড়ে না, সেনাপতির আদেশে গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়াও সৈন্যদল যে অভ্যাসে অগ্রসর হয়, শুধু সেই চিরাভ্যস্ত বাধ্যতার ফলেই নীলিমাও নিজ শরীর মনের প্রবল কম্পন ও অচলতার মধ্য দিয়া এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া রান্নাঘরে গেল। রান্না আজ হয় নাই, সেই সুশীলের জন্য সযত্নে প্রস্তুত রেকাবে ভরা খাবারগুলি মাত্র অযত্নে পড়িয়া আছে, নির্ব্বিচারে তাহাই আনিয়া সে বাপের সামনে ধরিয়া দিল। মায়ের ঘরে দাঁড়াইয়া তখন তার বাপ হাত-মুখ নাড়িয়া তাঁকে কি সব বুঝাইতে-ছিলেন। লণ্ঠনের আলোতে নীলিমা দেখিল, স্বর্ণলতার মুখের চেহারায় অকথ্য ভয়ের ও অস্বাভাবিক লজ্জার ছায়া দেদীপ্যমান! তিনি প্রহার-ভীত বালকের মতই ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন। তখন নীলিমার মনে পড়িল, আজ মধ্যাহ্নের পর হইতে এই মা রে বাঁচিয়া আছেন, সে কথাও তার মনে ছিল না!

অনুকূল মেয়ের দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া মনের উৎসাহে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ছোঁড়াটা কি কম ঢ্যাঁটা! কিছুতেই রাজী করতে পারিনে, শেষকালে নালিশের ভয় দেখিয়ে তবে না তার মুখখানা বন্ধ করি! বলেছি, যদি আমার মেয়েকে বিয়ে না করে, তা'হলে বাপ-বেটিতে ফৌজদারী করবো—সমস্ত পৃথিবী জানবে, ভুবন রায়ের ছেলে সুশীল রায় কি জঘন্য চরিত্রের মন্দ লোক—তখন কোথায় থাকবে তোমার পিতৃভক্তি আর কোথায় থাকবে বড়-লোকের মেয়ে সুলেখা!—এখন কোন গতিকে কালকের দিনটায় দু'হাত এক করে চারটে মন্তর পড়িয়ে দিতে পারলেই সকল পাপের শান্তি হয়ে যায়। আজই দিতুম—তা' যদি আবার বে-আইনী হয়েছে ব'লে বিয়েটা 'ক্যানসেল' করিয়ে নেয়, তাই ভরসা হলো না।"

নীলিমার সমস্ত শরীরের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল—চলন্ত হৃৎপিণ্ড দম-ফুরানো ঘড়ির মত থামিয়া গেল। বায়ুস্তর কঠিন পদার্থের মত ভারী হইয়া উঠিল, অসাড় হাত হইতে খাদ্যভরা রেকাবখানা কোন্ সময় যে ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া খাবারগুলা ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিল পিতৃমুখের তিরস্কারে ;—

"বলি আহ্লাদের চোটে কি আমার ঘরকন্নার কিছুটী আর রেখে যাবে না? তুমিই না হয় বড়মানুষের বউ হচ্চো, আমায় কি তা বলে রাজা করে দেবে, যে, আমার সর্ব্বস্ব ভেঙ্গে ছড়িয়ে লোকসান করে দিচ্ছো?—ব্যাপারখানা কি বল্‌তে পার?"

বাপের খাবারগুলা কুড়াইয়া দিয়া কোন রকমে নীলিমা পলাইয়া আসিল। নিজের ঘরে খিল দিয়া অন্ধকারে শয্যাহীন তক্তাখানায় গিয়া বসিতেই চারিদিক হইতে একসঙ্গে বাঁধভাঙ্গা জলের মত বিভিন্ন চিন্তাস্রোত তার বুকের মধ্যে বিচিত্র তালে তরঙ্গিত হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ ঘোর বিস্ময়ের স্থলাধিকার করিল—অপরিমেয় আনন্দ। এই গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারের আশ্রয়ে যখন মায়ের আর্ত্ত চক্ষু ও বাপের চাতুরীভরা বাক্য দর্শন-শ্রবণের অতীত হইয়া গেল, তখন শুধু একান্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল, এতদিনের সংশয়-সঙ্কীর্ণ ক্ষীণ কল্পনার পূর্ণ পরিণতির সার্থকতা ও সুখ! সর্ব্বদেহে মনে আহ্লাদে কণ্টকিত হইয়া নীলিমা মনে মনে সুশীলের তরুণ রূপ ধ্যান করিল। কি সুন্দর সুঠাম দেহ! কি ঔদার্য্যব্যঞ্জক গভীর দৃষ্টি! কি সুমিষ্ট হাস্যরঞ্জিত গোলাপী অধরপুষ্ট! —সে হাসির সুধা যে নীলিমার চিত্ত চকোর কি দুরন্ত ক্ষুধায় মনে মনে গ্রাস করিয়া লইয়াছে!—তার মুদিত হৃদয়-কোরক সেই হাস্য-রশ্মি বিভাসিত হইয়াই না দলে দলে বিকশিত পদ্মের মত লোভাকুল দৃষ্টিতে গগন-ব্যবধান দীপ্ত সূর্য্যের পানে গোপন আকাঙ্ক্ষায় চাহিয়া আছে! উঃ—কি আনন্দ!—কি আনন্দ! কি আনন্দ!—আজ তার সেই মরু-মরীচিকা সত্য হইতে, সফল হইতে চলিল!—কি আনন্দ! নীলিমার জীবনে অপ্রত্যাশিত, কল্পনাতীত এ কি বিপুল আনন্দ রে!—এ কি অসীম সুখ! স্বর্গরাজ্য বাস্তবিকই কি মর্ত্ত্য-মানবীর উপভোগে ধরণীর এই প্রান্তে নামিয়া আসিল?

আনন্দোদ্বেলিত বক্ষে সে মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল, সুশীলের সুকোমল, তপ্ত, স্নিগ্ধ স্পর্শ—তার প্রণয়-গভীর স্নেহ-সুশীতল দৃষ্টি সে নিজের পিপাসিত দেহ-মনে মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ করিয়া লইল— নিজেকে তার নবোঢ়া বধূ, গৃহলক্ষ্মী, সন্তান-জননী—সকল ভাবেই ভাবিয়া দেখিল, এ কি অযাচিত করুণা—হে দয়াময়!

ঈশ্বরের নাম লইতে গিয়া নীলিমার মনে পড়িল যীশুকে। একটী মেয়েকে খৃষ্টান করা লইয়া মিশনের প্রতি হিন্দু সমাজ ক্রুদ্ধ হইয়া কোন মেয়েকে আর সেখানে পাঠায় নাই। অনুকূলও সমাজ শাসন মানিতে

বাধ্য হইয়া নীলিমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। কে বলে, হিন্দুর ধর্ম্মে মুক্তি নাই—জীবনে উদারতা নাই, যে বলে সে দেখুক—সুশীলকে, তার ত্যাগ—তার—তার—

নীলিমার হর্ষোদ্দীপ্ত আনন্দ-স্মিত মুখ সহসাই সেই ঘনান্ধকারে তারই মত কালিমাখা হইয়া গেল।—মানসনেত্র তন্মুহূর্ত্তেই অপরাহ্নালোকে দৃষ্ট সুশীলের ভৎর্সনা-কঠোর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিল, সে দৃষ্টির অগ্নি-কণা নীলিমার চিত্তে দগ্ধ ক্ষত সৃষ্টি করিয়া যে ভিতরে ভিতরে অনির্ব্বাণ হইয়াই রহিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তখনই তাহা প্রমাণ হইয়া গেল! কেন যে সুশীল অস্পৃশ্যের মত তার হাতের ছোঁয়া বাঁচাইয়া তীব্র বিরাগে তার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই জটিল রহস্যের জাল আপনা আপনিই মুক্ত হইয়া গেল! উঃ—কোথায় স্বর্গ, কোথায় আনন্দলোক? জ্বালা—জ্বালা!—চারিদিক ব্যাপিয়া শুধু রাশি রাশি অগ্নিদাহ। অফুরন্ত আগুনের দাহকারী জ্বালা! সুশীল স্বেচ্ছায় তাকে গ্রহণ করিতেছে না।

নীলিমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া লুটাইতে লাগিল—সেই অকথ্য-ঘৃণা! তারই বিনিময়ে এই সুখাকাঙ্ক্ষা? কোথায় সুখ? পাগল—সে পাগল! যা'র চোখে ওই বিদ্বেষের লেখা—যা'র মনে ঐ ঘৃণার অবহেলা, তাকে চক্রান্তে চাপিয়া আত্মসাৎ করিলেই কি সে তার আপন হইবে? নীলিমার আশা যে অসম্ভব আশা—নীলিমার পিতার দুরভিসন্ধি তদপেক্ষাও অসঙ্গত—অকার্য্য! জোর করিয়া তিনি তাকে উহার গলায় ঝুলাইয়া দিবেন, কিন্তু সে ভার সে সহিবে?

সারারাত্রি ধরিয়া স্তব্ধ নিঝুম নিরালায় নিরালোকে একাকিনী বসিয়া সে ভাবিল—প্রখর ঝিল্লীরব ভিন্ন তার সেই অমীমাংসিত চিন্তার দ্বিতীয় কোন সাক্ষী ছিল না—তার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদনে কোথাও

হইতে কোন সাড়া আসিল না—অন্তরের সংশয়-দ্বন্দ্বেরও সমাধান হইল না—কখন দারুণ বিদ্রোহভরে মন দুরন্ত লোভকে দূরীভূত করিয়া দিয়া বলে, কি হইবে অমন হীনমূল্যে দস্যুর মত লুটিয়া লইয়া ?—তেমনি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া কেহ কি চিরদিন কাহাকেও আপন করিতে পারে ? আবার ঐ মনই বলে—দু'দিন দু'দিনই সই ! দু'দিনের স্মৃতিকেও ত চিরদিনের সম্বল করিয়া রাখিতে পারিবে ? স্বর্গ যখন মর্ত্ত্য দ্বারে আসিয়াছে, কেন না প্রবেশ করিব ?

পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া পীতাভ আলোর রেখা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তন্দ্রাভঙ্গবৎ নীলিমা সবেগে উঠিয়া আত্মগতই বলিল, "কাজ নেই, অমন সুখ আমি চাইনে, দুঃখই আমার প্রাণে থাক।"

সুশীলের দ্বারে আসিয়া সে মৃদু করাঘাত করিল। ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই, পূর্ব্বাকাশের প্রান্ত গোলাপের অর্দ্ধস্ফুট মুকুল-দলের মতই আধখোলা—নিদাঘতপ্ত নিশার তাপদাহ প্রশমিত করিয়া মিষ্ট বায়ু সবেমাত্র বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সশঙ্কনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া নীলিমা পুনশ্চ সেই রুদ্ধ দ্বারে অধীর করাঘাত করিল।—দ্বারের ফুটায় মুখ রাখিয়া ঈষদুচ্চ স্বরে বলিল, "এখনই ট্রেন ছাড়বে—দেরী করো না।"

ঘর নিঃসাড়া, সুশীল নিদ্রা যাইতেছে ! সে তবে মনের এই অবস্থাতেও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিয়াছে ?—তবে বৃথা কেন নীলিমার এ সঙ্কোচ ? এ সন্দেহ ? সুশীল তাকে ভালবাসে—তার হইতে তার আপত্তি নাই। আর ছিটেফোঁটা যদিই থাকে, তা' থাকুক, এ লোভ নীলিমা কিরূপে দমন করিবে ? নিজের সর্ব্বনাশ সে তো করিতে যাইতেছিল ?—এ বাধা কোন অদৃশ্য দেবতার আশীর্ব্বাদ নহে কি ?

# অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

তরুলতা পিত্রালয়ে আসিয়াছিল, প্রথম বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা, দ্বিতীয়তঃ তার ছোট দেবর শশিকান্তর সহিত বিনতার বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা করা। এ বিবাহের কথা অনেকদিন ধরিয়াই চলিতেছে, শুধু ছেলের ডাক্তারীর ফাইনাল পরীক্ষার জন্যই এতদিন হয় নাই, এইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শশিকান্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাউস সার্জ্জনের পদ পাইয়াছে, বিলাতে গিয়া কোন একটা বিষয়ে অধ্যয়নের ইচ্ছা আছে, তাড়াতাড়ি বিবাহ দিতে তাই পাত্রপক্ষের আগ্রহ, বিবাহের পর বিলাত যাইবে।

ভুবন বাবু শুনিয়া বলিলেন, "বেশ ত, তাই হোক, বিপ্রদাসও সুলেখার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্চেন, দু'জনকারই এক মাসে হয়ে যাক্!"

খবর শুনিয়া বাড়ীর লোক আনন্দ প্রকাশ করিল, করিল না বিনতা।

প্রথম আকারে ইঙ্গিতে, পরিশেষে স্পষ্টাক্ষরেই বিনতা পিসীমা'কে গিয়া জানাইল, দিদির দেবরকে সে বিবাহ করিবে না।

কারণ জিজ্ঞাসায় ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব দিল—"আহা যা ভূতের মত মূর্ত্তি! অন্ধকারে দেখলে খোক্কসের বাচ্চা ব'লে ভয় করবে না? আমি স্পষ্ট কথার মানুষ, বলে দিচ্চি—ওকে বিয়ে করা আমার কর্ম্ম নয়।"

পিসীমা মেয়েকে উপদেশ ভৎসনায়, এবং তোষামোদে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন, অকৃতকার্য্য হইয়া তরুকে জানাইলেন—তরু আসিয়া

বোনকে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিল; পরে বিরক্ত হইয়া বলিল—"ছোট-ঠাকুরপোর চেহারা এমনই কি মন্দ? রংটাই যা একটু শামলা।"

বিনতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"বা রে বাঃ! ওই তোমার 'একটু শামলা'!—তা তুমি আর তা' ছাড়া কি-ই বা বল্‌বে? তোমার বাড়ীতে যে বার মাস অমাবস্যা লেগেই আছে?—যা হোক্, তা' বলে তোমার শাশুড়ীর কিন্তু বাবু ওই ছেলের শশিকান্ত নাম না রেখে মসীকান্ত নাম রাখাই উচিত ছিল!—যাকে বলে কাণা-পুতের নাম পদ্মলোচন।"

তরু এ বিদ্রূপে রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ! আমার ঐ অমাবস্যাই ভাল, তোর মনে না ধরে, কোথায় তোর পূর্ণিমার চাঁদ আছে, সন্ধান ক'রে নি'গে যা।"

বিনতা কিছুমাত্র লজ্জা করিল না—অসঙ্কোচেই হাসিয়া কহিল—"সন্ধান তো করাই রয়েছে! ঘরেই তো আমাদের চির-পূর্ণিমা—তোমরা দেখতে পাও না?"

বিস্ময়োত্তেজিত মুখে সংশয়ের সহিত তরু জিজ্ঞাসা করিল—"ঘরে কে? না, না—শুভেন্দু নিশ্চয় নয়?"

বিনতা দীপ্ত মুখে উত্তর দিল—"হলেই বা দোষ কি?"

বোনের মুখের এই সুস্পষ্ট উত্তর শুনিয়া তরুলতার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তার এই স্বাধীন পতিনির্ব্বাচনকে সে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিল না, ইহার বিরুদ্ধে দুই দিন ধরিয়া সমানেই তর্ক চলিতে লাগিল। অবশেষে বিনতার পণ ভাঙ্গিবার যখন্ সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন খবরটা ভুবন বাবুকে দিতে হইল। শুনিয়া ভুবন বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনিও দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন, তাঁর সেদিনকার ডায়েরীর পাতায় লিখিত

ছিল—"সরোজের মুখে, তরুর মুখেও খবর পেলেম, বিনতা না কি শশীকে বিয়ে না ক'রে শুভেন্দুকে বিয়ে করতে চায়! ওরা অনেক বুঝিয়েছিল, কিছুতেই তার মত বদলায় নি। ওর মন্দ ভাগ্য! শশীর মত সুপাত্রকে তুচ্ছ ক'রে ঝোঁকের মাথায় শুধু রূপে মুগ্ধ হয়ে শুভেন্দুকে বিয়ে করা বিনতার নিতান্তই দুর্বুদ্ধি—নির্ব্বুদ্ধি তো বটেই, কিন্তু জোর করতেও তো পারি নে!—পারি কি? মেয়ে বড় হয়েছে, তা'র স্বাধীন মতামত জন্মেছে—অন্য দেশের শাস্ত্রে তো বটেই—হিন্দুশাস্ত্রেও এ বয়সে মেয়েকে অনূঢ়া রাখলে সে মেয়ের পতি-নির্ব্বাচনের অধিকার স্বতঃই জন্মে থাকে—এ ক্ষেত্রে সে আমাদের পছন্দকে ঠেলে নিজেই যদি পছন্দ ক'রে থাকে, আপত্তি করা চলে না। এক জনকে সে যখন পতিত্বে বরণ করেছে, তখন সুযোগের খাতিরে স্ত্রী হওয়া তা'র পক্ষে সঙ্গত নয়—একথা তার তো অযৌক্তিকও নয়, অথচ এ কি ভুল নির্ব্বাচনই সে কর্‌লে! চারু! তুমি নেই—তুমি থাকলে কি আমায় এ সমস্যা থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌তে না? এই জন্যই কি মেয়েদের বিবাহ কৈশোরের সীমাবদ্ধ রাখার নিয়মসৃষ্টি আমাদের সমাজে হয়েছিল? আমাদের এই জাতিভেদের শ্রেণীভেদের সমাজে অন্য সমাজের মত স্বাধীন নির্ব্বাচনের পথ ত মুক্ত নয়?"

তরু আরও একবার বোনকে ভয়মৈত্রী প্রদর্শনে বশীভূতা করিবার চেষ্টা করিল; বলিল—"রূপটাই কি সব? ছোট ঠাকুরপোর মত বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, মর্য্যাদা, পয়সা—সে সব কি শুভুর কিছু আছে? ওর কি দেখে তুই ভুল্‌লি? শুধু আলতাগোলা রং, শুকপাখীর মত নাক, চোখ দুটো পটলচেরা আর পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট? এ পৃথিবীতে এই কি সমস্ত?"

বিনতা ভ্রূকুটী করিয়া মুখ ফিরাইল, উথলিত ক্রোধকে ঈষদ্দমন করিয়া সবিরক্ত হাস্যে উত্তর দিল—"বলেছিই ত, রূপের তর্কে তোমার

অধিকার আমি স্বীকার কর্‌ব না! তোমার পক্ষে কটার চাইতে কালো চামড়াই ভাল লাগা সম্ভব এবং হয় ত সঙ্গতও, তাই ব'লে সব্বাইকেই যে এক খুরে মাথা মুড়তে হবে তাই বা কেন? তোমার ছোট ঠাকুরপোর চাইতে উনি বিদ্যের কম হ'তে পারেন, বুদ্ধিতে কম, তা আমি মনে করিনে—এত অল্প সময়ে এমন আত্মোন্নতি কর্‌তে ক'জন লোকে পেরেছে? ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলাত যদি যান—নিশ্চয়ই পাশ করে ফিরবেন এবং এমনও হ'তে পারে, তোমার ছোট ঠাকুরপো ওঁর চেয়ে ঢের নীচেই দাঁড়িয়ে থাকবেন! লোকটা যে 'জিনিয়াস্', তাতে সংশয় নেই।"

তরু মনে মনে বলিল—"জিনিয়াই'ও হ'তে পারেন! প্রকাশ্যে পুনশ্চ অন্য পথ ধরিল; বলিল—"বেশ ত, ছোট ঠাকুরপো ছাড়া কি আর পাত্র নেই? সুন্দর ছেলে শুভুর চাইতেও অনেক অনেক পাওয়া যায়—যাদের চাল চুলো আছে, নাম-খ্যাতি আছে, বিদ্যাও আছে। —বাবাকে বলি, তাই তিনি খুঁজে দেখুন।"

বিনতা বিরক্তি-বিরস কঠিন স্বরে কহিয়া উঠিল—"অত কথা আমি জানি না। আর কারুকে বিয়ে আমি কর্‌ব না—বুঝতে পারছো না কেন? কর্ব্বার উপায় নেই।"

তরু এবার বজ্র-স্তম্ভিত অবস্থায় নীরব হইয়া গেল, ভুবন বাবু ভগ্নচিত্তেই বিনতার পণই স্বীকার করিলেন। শুভেন্দু সবই জানে সে শুধু নিজ হইতে আসিয়া তার বাপকে আগে হইতে খবর দিতে নিষেধ করিল—বলিল, "আপনি তাঁকে সবটা জানেন না, এসে পড়লে এমন কাণ্ড করবেন, যাতে আপনি লজ্জায় মাথা তুলতে পার্ব্বেন না।" মর্ম্মাহত ভুবন বাবু অদৃষ্টের হাতে আজ নিরুপায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া বুক ভাঙ্গিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিলেন।

# ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রের অন্ধকারে যাহা অসম্ভব মনে হয়, দিবালোক তার অখণ্ডনীয়-তাকে সহজেই খণ্ডিত করে। সুশীলের যে সাহস গত কল্যকার অপ্রত্যাশিত মিথ্যা অপবাদের আঘাতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ দিবসাধিপের অভ্যুদয়ে তার কিছু অংশ যেন তার বিক্ষিপ্ত চিত্তে জাগিয়া উঠিল। নিদারুণ বাক্যশেলে বিদ্ধ আহত শোণিতাক্ত চিত্ত যেন সারা রাত্রির প্রলয়ান্ধকারের পর তরুণ ঊষার অভ্যুদয়ে আশারুণ রাগে অনুরঞ্জিত হইল। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, এত বড় অন্যায়ের মূল্যে সে কোনক্রমেই এদের হাতে আত্মবিক্রয় করিবে না। ভবিষ্যতে যা ঘটিবার ঘটুক! এই চিন্তার পর তার শ্রান্ত অবসন্ন শরীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল মনে নাই, যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা বাড়িয়া গিয়াছে, খোলা জানালা দিয়া তপ্ত হাওয়া এবং গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই গৃহে প্রবেশলাভ করিতেছে। জানালার বাহিরে ভাঙ্গা কার্ণিসের উপরে কয়েকটি কাক বসিয়া সাবধান-সূচক তীব্র স্বরে হয় ত বা তার এই অকাল-নিদ্রার জন্য তাহাকেই তিরস্কার করিতেছিল! ঘুম ভাঙ্গিতে সব কথা মনে পড়িয়া গেল, মনে পড়িতে নিজের এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মনে মনে সে নিজেকে ধিক্কার দিল—ট্রেনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে! কি আশ্চর্য্য—এমন বিপদ মাথায় লইয়াও মানুষের চক্ষে ঘুম আসে? উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি একটা জামা টানিয়া গায়ে দিল ও সুটকেস খুলিয়া মণিব্যাগটা ও ঘড়িটা পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল।

"এস, এস, হে বর! এতক্ষণে তোমার ঘুম ভাঙ্গলো? এ দিকে আভ্যুদিক করতে বসে পুরুত মশাই ছটফট করছেন!"—এই সুসংবাদের সঙ্গে পুরোহিত ঠাকুরের দিদি-ঠাকুরাণী চারটি সধবা সঙ্গে লইয়া সুশীলকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেন—হাতে তাঁদের হলুদ বাটা।

দিদি কহিলেন, "ওলো বউ! মেয়েটার পাতাচাপা কপাল লো! কেমন মদনমোহন বর জুটিয়েছে দেখ!"

পুরোহিত-গৃহিণী অর্দ্ধাবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া মুগ্ধ চোখে সুশীলের প্রভাতচন্দ্রের মতই দীপ্তিশূন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুলকিত স্বরে উত্তর করিলেন, "আহা, বেঁচে থেকে ভোগ করুক গো! স্বর্ণ ঠাকুরঝি আমাদের বড় দুঃখী গো! আর নীলি মেয়েটারও কখন কোন সুখ হয় নি, মা মঙ্গলচণ্ডী যদি কৃপা করে দিয়েইছেন, পাকা মাথায় সিঁদুর প'রে দুটিতে একটি হয়ে যেন সুখে থেকে ভোগ করে।"

আশীর্ব্বাদের ঘটা পাড়ার চণ্ডীদাসীর শুনিয়া সহ্য হইল না, সে পার্শ্ববর্ত্তিনীর কানের কাছে অনতিউচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন লো? ঘরে এনে পুযে রেখে—এখন দায়ে ঠেকেই না বিয়ে করছে! অমন বর জোটানর প্রবৃত্তি থাকলে আমাদেরও ঢের জুটতো, পোড়া কপাল!—পোড়া কপাল!"

কথাটা সুশীলের কানে গিয়া আবার তাহাকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল এবং সেই ফাঁকে নারীর দল তার কপালে হলুদ লেপিয়া দিয়া এক-সঙ্গে হুলু ও শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রোষক্ষুব্ধ সুশীল সকোপে কহিয়া উঠিল, "এ কি করছেন আপনারা?"

মহিলা মণ্ডলী উচ্চ হাস্যে ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে একটা সুমিষ্ট কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সুশীল বিস্তর আপত্তি করিয়াও ভদ্রতার সীমায় পা রাখিয়া তাদের হস্ত-মুক্তির উপায় না দেখিয়া নিরুপায়ে মন্ত্রনিরুদ্ধবীর্য্য

সর্প-শিশুর মতই দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিল।—নারীর নিকট পুরুষের পৌরুষকে পরিহার না করিয়া উপায় নাই—সে আর করিবে কি ?

বরপক্ষের আভ্যুদিক করিতে বসিয়া পুরোহিত মহাশয় আগাগোড়াই না হয় তাঁদের তিন কুলের জীবিত মৃত ব্যক্তিবর্গকে নির্ব্বিচারে যথা-নামগোত্র দিয়াই সারিয়া লইলেন ; কিন্তু যেখানে যেখানে অধিবাসার্থ বরকে প্রয়োজন, সেই সেই স্থলে তাঁহাকে ফাঁপরে পড়িতে হইল—বর গাত্র হরিদ্রার পর কন্যাকর্ত্তাকে ডাকিয়া তাঁর সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিয়া স্বর্ণলতার ঘরে আশ্রয় লইয়াছে, পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও সে সেখান হইতে এক পা নড়ে নাই !—প্রথমে ইহাকে উহাকে দিয়া, পরিশেষে অনুকূলচন্দ্র নিজে গিয়া তার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়াছেন, উঠাইতে পারেন নাই। শুধু সুশীলেরই আপত্তি নয়, স্বর্ণলতা দুই দুর্ব্বল বাহু দিয়া তাহাকে নিজের কাছে এমন করিয়া আগলাইয়া ধরিয়াছিলেন, ও যে কেহ তাহাকে ডাকিতে আসিতেছিল এমন জ্বলন্ত আগুনে ভরা ভৎ র্সনা-পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া তাহাকে আরও নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিতেছিলেন যে, এমন কি, ইচ্ছা থাকিলেও সে ইহার হাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না !

অনুকূল রাগে আগুন হইয়া মুমূর্ষু স্ত্রীকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিল, তাঁর হাত জোর করিয়া ছাড়াইতে গেল—কিন্তু শাবক অপহরণকারীর প্রতি ব্যাঘ্রী যে দৃষ্টিতে চাহিয়া শাবককে প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরে, তেমনই করিয়া যেন তাঁর মৃত্যুবলে বলীয়ান চিত্ত অসীম শক্তি সংগ্রহ করিয়া সুশীলকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। ইহা দেখিয়া সুশীল বলিল, "আপনার কি রক্তমাংসের দেহও নয় ?—মানুষটাকে মেরে ফেলবেন ?"

অনুকূল অস্পষ্ট তর্জ্জনে উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক অকথা কুকথা কহিতে কহিতে ফিরিয়া গিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, "মরুক গে, নেও অমন

অমনই সেরে নেও, মাগীর আজ মরণরোগে ধরেচে, জোর করতে গেলে পাছে ম'রে গিয়ে বিয়ে পণ্ড করে বসে, তাই শুধু পারলুম না—না হ'লে আজ একটা এস্পার ওস্পার হয়েই যেত।—দাঁড়াও না, গোত্রটা একবার বদলে যাক, তখন এর শোধ তুলবো কি না, দুজনকার ওপোরেই!"

পুরোহিত হতভম্ববৎ হাঁ করিয়া থাকিয়া আপত্তির স্বরে বলিলেন, "তা কেমন ক'রে হবে? বর না এলে কখন এ সকল কার্য্য হ'য়ে থাকে? তাঁকে একবার ত আসতেই হবে, যেমন করেই হোক—"

অনুকূল ভীষণভাবে চটিয়া মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন, "আরে নেও!—নেও!—হয় না ত কি হয়?—কুলীনদের ঘরে যে ঘাটের মড়া ধ'রে বিয়ে দিত, তারা কি উঠে ব'সে অধিবাস করতো না কি? এ'ও সেই মড়ার মতন করেই হয়ে যাক না—ভারী তুমি পণ্ডিতী করতে এসেছ আমার কাছে, আমার জানা আছে সব!"

অগত্যা সেই রকম করিয়াই সকল কর্ম্ম সমাধা হইল। কেবল অধিবাসের ফোঁটা এবং সূতায় বাঁধা দূর্ব্বা সুশীলকে সেইখানে বসিয়াই পরিতে হইল। স্বর্ণলতা সেই চিহ্নগুলি অতি করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে চোখ দিয়া জল পড়িল, সে অশ্রুতে আনন্দাশ্রুরও একটু মিশ্রণ ছিল হয়ত, অথচ বিরক্তির প্রাচুর্য্যও কম ছিল না।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সবশুদ্ধ জন দশেক লোক মিলিয়া বিবাহ বাড়ীটাকে সরগরম করিয়াছে, আর বাড়ীর ভিতরে সেই পাঁচ জন এয়ো, আর বিনা নিমন্ত্রণে অনাহূত ভাবেই আসিয়াছিল নীলিমার স্কুলের সঙ্গিনী সাবিত্রী। বিবাহে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" প্রভৃতির কোন জঞ্জাল নাই, বাজারের কিছু মিষ্টান্ন ও চিঁড়ে-দইএর সামান্য আয়োজন আছে, যাদের নেহাৎ পেটের জ্বালা, তারাই এ বাড়ীতে খাইবে!

লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী পরা, আ-ললাট হরিদ্রালিপ্ত, বাম হস্তে হলুদ-রঙ্গা সূতায় দূর্ব্বার রাশি বাঁধা আর দুই হাতে দুই গাছি রাঙ্গা শাঁখা—এই সাজে সাজিয়া বিয়ের কনে এতক্ষণে মাঙ্গলিক কার্য্যাবসরে সকল লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের অশান্ত হৃদয়কে ও অবাধ্য চরণকে শাসনের পাশে বাঁধিয়া মা'কে খাওয়াইতে ঘরে ঢুকিল। গত রাত্রি হইতে মায়ের যে তা'র খাওয়া হয় নাই, সে কথা সে একেবারে না ভুলিয়া গেলেও নিজের চিন্তা, অবসরহীনতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুশীলের উপস্থিতি এই সকলে মিলিয়া খাবার লইয়া আসা ঘটিয়া উঠে নাই, এখন নিজেকে কঠিন করিয়া এক হস্তে দুধের বাটি, অপর হস্তে সামান্য ফল ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ পূর্ব্বক কুণ্ঠিত পদে সে আসিয়া মাতৃ-মন্দিরে দেখা দিল।

মা শুষ্ক লতাবৎ শীর্ণ দুটি হাতে তখনও সুশীলের হাত দুখানি ধরিয়া ব্যাকুল মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে তার আতপতপ্ত কচি কিসলয়ের মত মুখের দিকে নিস্পলক চক্ষে চাহিয়া আছেন। নীলিমাও চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, সুশীলের মূর্ত্তি যেন একটি রাত্রিদিনের মধ্যে আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে! তার মুখের সেই শিশুসুলভ সরলতা, কমনীয়তা, সকরুণ স্নেহে ভরা উদার দৃষ্টি সে সব আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়া উহাকে রুক্ষ, শুষ্ক ও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল।—সে সুশীল যেন এ সুশীলই নয়! সেই আনন্দ-চপল সুশীল আজ তার বিবাহ-দিবসে কি অসীম ব্যথাকাতর চিত্তে স্তব্ধ মন বিমর্ষ মুখে নীরবে বসিয়া আছে! নীলিমার বুকের মধ্যে অবরুদ্ধ বেদনার রাশি উত্তাল হইয়া উঠিল।

আজ প্রথম প্রভাতের ব্যর্থ চেষ্টার পর এই অপ্রত্যাশিত বিবাহ-ব্যাপারের সকল অনুষ্ঠানপর্ব্ব যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, নীলিমার দ্বিধাগ্রস্ত মনের সংশয়-মেঘ ততই যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া আশা ও আনন্দের চন্দ্রালোক সৃজন করিতেছিল—গ্রীষ্মের গুমোট কাটিয়া যেন

শীতল বায়ু-প্রবাহ তার চিন্তাতপ্ত অন্তরকে স্নিগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তার কুণ্ঠিত চিত্ত এই বলিয়া আত্মসান্ত্বনা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সুশীলের যেমন প্রকৃতি, সে নিরপরাধে তার প্রতি একান্ত অবিচার করিতে পারিবে না! দু দিনের বিরাগ এক দিন অন্তর্হিত হইবেই—কিন্তু এখন দু জনের চোখে চোখে বারেকের মিলন হইতেই সুশীলের দৃষ্টি হইতে এমনই গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের কঠোর জ্বালা ঠিকরাইয়া পড়িল, যে সেই দৃষ্টি-বাণাহতা নীলিমার বুক খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সুশীল যখন স্বর্ণলতার হাত হইতে নিজের হাত টানিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল এবং নীলিমা মা'কে দুধটুকু খাওয়াইতে বসিল, তখন সুশীলের মনে পড়িল, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য সে তখন শরীর-মনে বল সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া গেল, কিন্তু অনুকূলের কাছাকাছি হইতেই তার বুকটা যেন ভারী হইয়া আসিল, কণ্ঠের কাছে অশ্রুনির্ঝর যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, কোন কথা না বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল, আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল এই লোকটার বাড়ীতে কেমন করিয়া সে এতদিন বাস করিয়াছিল।

অনুকূল মনে মনে হাসিয়া আত্মগতই বলিলেন, "বাবাজীবন আমার —একটু একটু ক'রে বাগে আস্‌চেন! কেমন দাওয়াইটী খাইয়েছি— হবে না?"

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সারা দিনের গুমোটের পর অপরাহ্ণে খুব মেঘ উঠিল। ঘোলাটে আকাশে স্তব্ধ গাছপালায় দেখিতে দেখিতে কাল-বৈশাখীর চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সন্ধ্যার পরেই মেঘের সেই ধোঁয়ার বর্ণ নিকষ কালো পাথরের পর্ব্বতশ্রেণীর রূপে রূপান্তরিত হইয়া গেল—দেখিতে দেখিতে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাকে আড়াল করিয়া অন্ধকারের রাশি জাগিয়া উঠিল। বড় বড় গাছগুলা সেই অন্ধকারে অসংখ্য প্রেতমূর্ত্তির মতই স্তব্ধ হইয়া রহিল। কোথাও বাদুড়ের ঝটাপট, কোথাও বিপদ্‌ভীত নীড়াশ্রয়ী পাখীর করুণ কিচিমিচি ভিন্ন আর কোন সাড়াই রহিল না। মনে হইল সমস্ত পৃথিবী যেন কোন আসন্নপ্রায় ভয়াবহ দৃশ্যে দ্রষ্টা হইবার ভয়ে সেই অসীম অন্ধকারে আত্মগোপন করিতে চাহিতেছিল!

সুশীল তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে শ্রান্ত শরীরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। দুই হাতে চোখ মুছিয়া সে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, বাহিরের অন্ধকারও সূচিভেদ্য, কালো মেঘে আকাশের সহিত ধরণীও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন! মেঘের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের লোল জিহ্বা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উন্মত্ত ভঙ্গীতে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। মেঘের গর্জ্জনে, ঝড়ের হুঙ্কারে নৈশ-প্রকৃতির বক্ষে যেন একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ডের মহা সূচনা চলিয়াছিল—সুশীলের নিজের বক্ষেও বোধ করি এর চেয়ে কিছু কম বিপ্লব-সংঘাত বাধে নাই! বাতাস যেমন রুদ্র তাণ্ডবে সংহার মূর্ত্তিতে সাজিয়া উঠিয়াছিল, তার মনের মধ্যেও তেমনিই ঝড়ের হাওয়া অসহায় গাছপালা-

দের মতই আছড়িপাছড়া করিতেছিল, মন বলিতেছিল, এমন অসহায় শিশুর মত অত্যাচারীর অন্যায়ের পাশে নিজেকে বাঁধিতে দিতেছ, ধিক তোমার ভীরুতায়! আবার অন্য দিক হইতে সংশয় বিপুল বলে তর্ক তুলিতেছিল—তা'র যুক্তি—দুর্নাম কলঙ্ক! সে যে কোন কিছুতেই ঢাকা পড়িবে না! না; না; উদ্ধার নাই—উদ্ধারের উপায় নাই!

গুরু গুরু গুরু গুরু রবে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে জীর্ণ বাড়ীর জীর্ণতর দ্বার-জানালাগুলা কাঁপিয়া উঠিল, সুশীলের রক্তও কম্পিত হইল। বাতাসে ঘরের পিছনে আমগাছের পাতা সর্ সর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল, ঝড় তার বিশাল দেহ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে অট্টহাসি হাসিয়া বলিতেছিল—সন্—সন্—শোন্ শোন্ শোন্ শোন্!—তার পর আবার মুহুর্ম্মুহুঃ মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে বৃষ্টির চড় চড় চড় চড় শব্দ আরম্ভ হইল। এই বিবিধ এবং বিচিত্র ঐক্যতানিক শব্দলহরী মিলিয়া সুশীলের পিষ্ট ও ক্লিষ্ট অন্তরটাকে যেন আর্ত্ততর করিয়া তুলিল, মনে পড়িল, আজ তার বিবাহ! এই সব তার বিবাহ বাদ্য! ঐ আকাশের মেঘ তার বিবাহ সভার চন্দ্রাতপ, ঐ মেঘের গর্জ্জন ব্যাণ্ডের বাজনা, ঐ ঝড়ের হুঙ্কার বরযাত্রীর কলরোল—ঐ গাছপালার সন্‌সনানি বিবাহের ব্যাগপাইপ!—আর ঐ জলের ধারা দিয়া বুঝি তাহাকে বিদ্যুতের রোস্‌নীতে বরণ করিতে আরম্ভ করিল?—এই সঙ্গে মনে পড়িল, শত সুখ এবং সহস্র ঐশ্বর্য্যে সমাকীর্ণ তার নিজ গৃহ—সেই ইন্দ্রালয়ের অধিপতি সে, আজ তার এই বিবাহসজ্জা? এই সমারোহ? সুশীলের বুক চিরিয়া চিরিয়া চোখ ফাটিয়া অশ্রুপ্রবাহ উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল, সেই আর্দ্র অন্ধকারে নির্ব্বান্ধব সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে একান্ত অনভ্যস্ত, নিঃসহায়, কলঙ্কভীত—আর্ত্ত বালক মর্ম্মন্তুদ ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিল, তার

চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উৎস ছুটিতে লাগিল। সেই অশ্রুবাষ্পমধ্যে দুইখানি উজ্জ্বল মুখ নিমেষে নিমেষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং সে অনিমেষে ব্যাকুল নেত্রে সেই মুখ দুইখানির দিকে চাহিয়া যন্ত্রণার্ত্ত বুকের মধ্যে যেন তাদের সবলে চাপিয়া ধরিতে গেল! তার মনে হইল, আর যাই হোক, শুধু এই দুটি মুখ—এই একান্ত প্রিয়—প্রিয়তম—প্রাণতম এই দুই জনই শুধু তার জীবন হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে দূরে—দূরে—বহুদূরে অপসৃত হইয়া যাইতেছে। এই কালরাত্রির অবসানের পর এদের কাছে এ জীবনে সে আর কোন দিনই পৌঁছিতে পারিবে না! তারা তার পিতা আর সুলেখা—সুশীল কাতর মৃদু স্বরে আত্মগতই উচ্চারণ করিল, "সুলেখা!—সুলেখা!"

ঝড়ের প্রচণ্ড একটা দমকা হাওয়া হাহা শব্দে সারা বিশ্বে প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া এই অন্ধকার ঘরের মধ্যেও ছুটিয়া আসিয়াছিল, সঙ্গে ছিল ধূলার রাশি। সুশীলের অশ্রুসিক্ত চক্ষে সেই ধূলিবৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য একটা বেদনার সৃষ্টি করাতে তার ব্যথাবিহ্বল চিত্ত মুহূর্ত্তের জন্য বাহিরের দিকে ফিরিল, সহসা বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে চোখে পড়িল শুধু ঝড় নয়, তাহারই সহিত তেমনই চঞ্চল, তেমনই বিস্রস্ত কেশবাস, তেমনই উদ্বেগাকুল মূর্ত্তি লইয়া আরও কেহ সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল! বিদ্যুতের মুহুর্ম্মুহুঃ আলোক সম্পাতে সুশীল চিনিল—সে নীলিমা।

নীলিমা ত্বরিত পদে সুশীলের নিকটবর্ত্তী হইল, বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়াও তার ঘনশ্বাস স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, একটুও দ্বিধা না করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "আপনি যেতে চান?"

সুশীল চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রাণের মধ্যে নিবন্ত আশার আলো একটি ক্ষুদ্র দীপশলাকার সাহায্যেই যেন জ্বলিয়া উঠিল! কে' এ কথা বলিতেছে, সে বিচার না করিয়াই বন্দীর কাছে কারাগৃহত্যাগের প্রস্তাবের

মতই তৎক্ষণাৎ উগ্র ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উত্তর করিল, “যাবার কোন উপায় আছে ?”

নীলিমার মনের শেষ আশারশ্মিটুকু এক নিমেষে নির্ব্বাপিত ও অন্তর তার বাহিরের মতই গাঢ় তমসাবৃত হইয়া গেল, কিন্তু তখনই প্রচণ্ড বেদনার নিদারুণ আঘাত কষ্টে সংবরণ করিয়া লইয়া উত্তর করিল—“খিড়কির দিকে এখন কেউ নেই, এই বেলা এই পথে চ’লে গিয়ে নটার গাড়ীতে উঠে চেঞ্জ করে যেতে পারবেন।”

সুশীলের নিরাশ চিত্ত আগুনঠেকা তুব্‌ড়ীর মত মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে লাফাইয়া উঠিয়া আসিল।

—তা’হলে এক্ষণই চল্লেম !”

বলিয়াই ঈষৎ ভগ্নোৎসাহে সন্দিগ্ধ স্বরে থামিয়া থামিয়া কহিল, “কিন্তু—”

নীলিমা ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিল—“আর কিন্তু দেরী করলে হবে না, কে কখন্ এসে পড়তে পারে।”

সুশীল নিজের বিপন্নাবস্থা বুঝিয়া জোর করিয়া লজ্জা সংবরণ পূর্ব্বক এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করিল—“কিন্তু আমি চ’লে গেলে যদি তোমার বাবা আমার নামে নালিশ করেন ?—যদি—যদি—”

নীলিমা নিঃসঙ্কোচে সহজ স্বরে কহিল—“আপনি জানেন—আপনি নির্দ্দোষ।”

সুশীল রুদ্ধপ্রায় নিশ্বাসটা সজোরে টানিয়া লইল—“সে ত আমি আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ কর্‌তে পারবো না !—আর এ সকল কুৎসিত জিনিষ একবার বেরিয়ে গেলে—উঃ !—তার চেয়ে মৃত্যু ভাল !—নাঃ—আমার বাঁচবার উপায় নেই !”

এ পরিতাপে নীলিমার বুকে বজ্র-সূচি বিদ্ধ হইল ! সে একটুক্ষণ-মাত্র

নিঃশব্দে সেই নির্ম্মম আঘাত-ব্যথা সহ্য করিয়া দৃঢ় বলে আত্ম দমন পূর্ব্বক স্থির স্বরেই উত্তর দিল—"সে ভাবনা নেই—আমি যদি অস্বীকার করি, আমার বাবা কোন ক্ষতিই কর্‌তে পারেন না!"

এবার সুশীলের চলচ্চিত্ততা প্রশমিত হইয়া আসিল, একটা স্বস্তির নিশ্বাস জোর করিয়া মোচন পূর্ব্বক সে কহিল—"তবে যাই"—বলিয়া সে সেই সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে অগ্রসর হইল।

নীলিমাও তার সঙ্গ লইল, কাছে আসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল—"আসুন দোর খুলে দিয়ে আসি।"

দুজনে অন্ধকারের পুঞ্জ ভেদ করিয়া চলিল, দুজনেই চিন্তাকুল—নীরব।

তড়িতের অচিরস্থায়ী শিখা মধ্যে মধ্যে তাদের চলার পথে যেটুকু সাহায্য করিতেছিল, নীচে নামিতে সেও ফুরাইয়া গেল, এই পরিত্যক্ত ভিতর মহলটা যেমন অন্ধকার, তেমনই ভাঙ্গাচোরা। একটা অর্দ্ধভগ্ন পৈঠায় পা বাধিয়া সুশীল পতনোন্মুখ হইয়া কষ্টে সামলাইয়া লইল, নীলিমা আপনার চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া ছিল; তার মনের তারে তখনও দুটী সুরের রেষ ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল, ব্যথায় ও আনন্দে বক্ষে তার দুটি তরঙ্গ সমতালে উঠা নামা করিতেছিল—সুশীলের পদস্খলন শব্দে চকিত হইয়া ভাবনা সমুদ্রে তলায়িত চিত্তকে টানিয়া তুলিয়া কাছে আসিল। —"দেখবেন, প'ড়ে গিয়ে মাটী করবেন না—আমার হাত ধরুন।"

সুশীল নিরাপত্তিতে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। তার মনেও ধরা পড়ার ভয় প্রচুরতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাই অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে নীলিমার হাত বেশ দৃঢ় করিয়াই ধরিল। সুশীলের যদি নিজের বক্ষের কম্পন তখন কম থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত, নীলিমার সেই কর্ম্ম-কঠিন হাত কি শীতল—ঘর্ম্মাপ্লুত ও থর কম্পিত!

অল্পদূর আসিয়াই নীলিমা মৃদু স্বরে কথা কহিয়া বলিল—"জুতোর শব্দ হচ্ছে খুলে আমার হাতে দিন।"

সুশীল তৎক্ষণাৎ জুতা খুলিয়া হাতে লইল, বলিল—"সে হয় না—আমিই নিচ্ছি।"

নীলিমা আন্দাজে হাত বাড়াইয়া জুতা ধরিল—মিনতির নহে—হুকুমের সুরে বলিল—"দিন।"

সুশীলের মনে দারুণ অস্বস্তি জাগিলেও সে জুতা দিতে আপত্তি করিতে পারিল না।

বাহিরে আসিয়াই সুশীল সহসা বলিয়া উঠিল—"ঐ যাঃ! টাকা তো আনা হয়নি!—কি হ'বে?

এই অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষটাকে এত বিলম্বে মনে হওয়ায় নীলিমা মনে মনে দু'জনের উপরেই অত্যন্ত রাগ করিল, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিল—"টাকা কি আপনার স্যুটকেসে আছে?"

সুশীল তখন নিজেকে একান্ত বিপন্ন বোধ করিতেছিল। সে প্রায় হতাশার শেষ সীমায় পৌছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল—"সে আর আমি পেয়েছি! আমার কোটের পকেটে মণিব্যাগ রেখেছিলুম; সকালবেলা সেই যে কারা—সেটা খুলে নিলেন, কোথায় আছে কি করে বলবো? সব টাকাই তা'তে ছিল।"

নীলিমার মনের তারে আশার রাগিণী বিপুল ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। মাথার উপর প্রবল বৃষ্টির ধারা ঝমা ঝম্ শব্দে যেন সেই সুরেরই তাল দিতে লাগিল, দুরন্ত ঝড়ের হাওয়া ইহারই পোষকতা করিয়া কানের কাছে বলিতে লাগিল—"তবে আর উপায় কি?—আকাশের দীপ্ত বিদ্যুতের শিখা নীলিমার চিত্তে আবার একটা লোভের আগুন ধরাইয়া দিল, সে নীরব নিশ্চল রহিল।

"নীলু!"

নীলিমা তড়িতাহতের মতই সর্ব্ব দেহে-মনে চমকিয়া অনুভব করিল, সুশীলের হাত তার কাঁধের উপর, সে তাকে নাড়া দিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে ডাকিতেছে—"নীলু! ঘাটে এসে নৌকা আমার ডুবে যাবে? আজকের মতন অন্ততঃ দশটা টাকা আমায় এনে দাও, গিয়েই আমি পাঠিয়ে দেব। এত করলে যদি—এই সামান্য কাজটাও—

নীলিমার গলা বুজিয়া শব্দ আর বাহির হইবার পথ পাইল না—কি একটা অস্পষ্টভাবে বলিয়াই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সেটাকে আশারই বাণী বুঝিয়া সুশীল সেই ঝটিকা তাড়িত বৃষ্টি অধ্যুষিত, ঘোর অন্ধকার মধ্যে অনাবৃত আকাশ তলে মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ের মধ্যে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ বক্ষে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃষ্টির বেগ ক্রমে অসহনীয় হইতেছিল, বৃষ্টিপাত শব্দে, ঝড়ের গর্জ্জনে, ক্ষণে ক্ষণে মেঘের হুহুঙ্কারে, বজ্রাগ্নির ক্ষণিকোদ্ভবে—নৈশ প্রকৃতি ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিলেন। সুশীলের মনে হইল, দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশের জন্য স্বয়ং রুদ্র আজ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—অমনই চমকিয়া চকিতে তার সতীর কথাও স্মরণ হইল—সেই পিতৃনির্য্যাতিতা সতীর মতনই যদি—

"নিন।"

"কৈ? কোথায়—পেয়েছ? আঃ! আমার ভয় হচ্ছিল হয়ত ধরা প'ড়ে যাবে—কত পেলে? এতেই হবে—এ উপকার আমি কখন ভুলতে পারবো না। জ্যেঠাইমাকে আমার প্রণাম দিও—তিনি আমায় বড্ড ভালবেসেছিলেন! যাই।"

জ্যেঠাইমা শুধু তোমায় ভালবাসিয়াছিলেন?—আর কি কেহই বাসে নাই?—হায় নিষ্ঠুর!

সুশীল অগ্রসর হইল। অবিরল জলধারা ঠেলিয়া, বাতাসের ঝাপ্‌টা

ভেদ করিয়া, ঘনতমসাবৃত ধরণীর অদৃশ্য পথরেখায় দিশাহারা হইয়াও সে কোনমতে অগ্রসর হইয়াছিল, আবার কি ভাবিয়া ফিরিল।

"নীলিমা! আছ কি?"

বাতাসের হুহুঙ্কারে প্রথমতঃ সে ডাক নীলিমার কানে পৌছায় নাই, সে তখনও গতিহারা হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, দ্বিতীয় আহ্বানে বুক তার উল্লাসে উদাস হইয়া উঠিল—সুশীল ফিরিয়া আসিয়াছে! সে তাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই!

বিদ্যুতের আলোকে সুশীল দেখিল, নীলিমা ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া। সে দ্রুতপদে কাছে আসিয়া অস্থির স্বরে কহিয়া উঠিল— "কিন্তু তোমার বাবা যদি তোমায় পীড়ন ক'রে সাক্ষী দেওয়ান? তিনি জোর করলে তুমি কি বাধা দিতে পারবে?"

—হরি! হরি! এই তার এত বড় আত্মত্যাগের শেষ পুরস্কার? সর্ব্বস্বদানের সমস্ত পরিণাম! এখনও সেই স্বার্থচিন্তা!—আত্মরক্ষার সেই ক্ষুদ্রতম সতর্কতা! নীলিমার জন্যে প্রাণের কোণেও এতটুকু সহানুভূতি—করুণা—কৃপা—বিন্দুমাত্র—কণামাত্রও জাগে নাই!—নীলিমা এখনও—সেই তুচ্ছতম, ক্ষুদ্রতম, হীনতম গরীবের মেয়ে, আর তাই-ই সে এতখানি দানের পরেও রহিয়া গেল?—এই তার এ জন্মের চিরস্থায়ী পরিচয়? কোন মূল্যেই সে এ পরিচয় বিস্মৃত করাইতে পারিল না?

নীলিমাকে বাক্যহারা দেখিয়া সুশীল অধীর হইয়া উঠিল—"তা'হলে কি হবে, নীলু? তোমার উপরেই যে, সমস্ত নির্ভর করচে! তুমি নিজেকে কঠিন রাখতে পারবে ত?"

নীলিমার একবার মনে হইল, উচ্চ আর্ত্তনাদে এই ঝড়ের তাণ্ডব, বৃষ্টির উন্মত্ত চীৎকার অশনির কড়া কড় নিনাদ এই সমস্তকেই ডুবাইয়া দিয়া, বিশ্ব-প্রকৃতির কর্ণ পটহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়া সে তার ফাটান

বুকে রক্তঝরা আর্ত্তরবটাকে বাহির করিয়া দিয়া বলে—"ওগো নিষ্ঠুর! ওগো কঠিন! ওগো পাষাণ! আর নয়—আর নয়—সাঙ্গ কর—সাঙ্গ কর, সাঙ্গ কর, তোমার এই ক্ষুদ্র স্বার্থের খেলা সাঙ্গ কর—নহিলে হয় ত প্রাণপণে বাঁধা মনো-বীণার এত উচ্চস্বরে চড়ানো তার কাটিয়া খান খান হইয়া পড়িয়া যাইবে! হয় ত কোন্ সময় সে বলিয়া ফেলিবে, 'না, পারিব না।'—আমিও মানুষ—রক্তমাংসে আমারও এই শরীর একদিন একই ঈশ্বরের হাতে গঠিত হইয়াছিল, বুকে আমারও ঐ রকম অজস্র বাসনা-কামনার রাশি, বরং সবই তার অতৃপ্ত ও অভুক্ত!—লোভকে আমি জয় করিতেছি—বলিয়াই সে যে আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে, এমন ভরসা আমার বেশী নাই, হয় ত কোন্ সময় সে প্রবল প্রতাপে জাগিয়া উঠিয়া, আমার সকল ত্যাগের মূল শুদ্ধ কাটিয়া, চিত্তে আমার জয়ের আসন পাতিবে!—তুমি যাও, তুমি যাও—আর কেন?—যাও—যাও—স্থলেখার স্বর্ণমন্দিরের মরকত-আসনে তোমার বিরাম শয্যা তো বিস্তৃতই আছে!—তবে আর কি? তবে আর বিলম্ব কিসের জন্য? কেন এ ফিরে আসা? হে পথিক! তোমার এই শ্রান্ত ক্লান্ত সংগ্রাম-পথের যাত্রা শেষ করিয়া ইহার লজ্জা-ক্লিন্ন হেয় স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া তুমি নিঃশেষেই ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে অনায়াসেই পারিবে—তাই দিও।—হে ক্ষণিকের অতিথি! অভাগীর দৈন্যে পূর্ণ দুর্দ্দিনের আতিথ্যকে দুঃস্বপ্ন বলিয়াই—যদিই কখন মনে পড়ে, সুদূরে ঠেলিয়া দিতে দ্বিধা করিবে না, তাও জানি—তবে আর কেন?—যাবেই যখন যাও।—এখনও কি লোভীকে—দরিদ্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? দোষ নাই—লোভ যে দারিদ্র্যের ধর্ম্ম!

বৃষ্টির শিলা-কঠিন ধারা মাথার উপর মুহুর্ম্মুহুঃ মুষলাঘাত করিতেছিল, ভয়ানক শব্দে জল, স্থল, আকাশ, পৃথিবী কাঁপাইয়া অদূরে বজ্রপাত

হইল, ক্ষণকালের জন্য তার বহু লক্ষ বৈদ্যুতিক আলোকপ্রবাহ সেই লণ্ডভণ্ড দীর্ণ বিদীর্ণ বিপর্য্যস্ত পৃথিবীর আর্ত্ত-মূর্ত্তি প্রকটিত করিল। সুশীল সে আলোতে নীলিমাকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া যেন সে চমকিয়া উঠিল—সে মুখ মৃত্যুপাণ্ডুরতায় ভরা স্বর্ণলতার মুখ!

"নীলিমা!"

"ভয় নেই! আমি ত বলেছি, তবু বিশ্বাস হচ্চে না? যান যান—কেন সময় নষ্ট করছেন? ট্রেণ ফেল করলে বিপদে পড়বেন—এখনই যান—এখনই যান।"—নীলিমা ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

সুশীল সেই দুর্য্যোগে ভরা মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অনিশ্চিত পদক্ষেপে যাত্রারম্ভ করিয়া মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিল, কোন কিছু ভাবিবার সামর্থ্য তার ছিল না।

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হয়; আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎও চমকিতেছে, সেই অন্ধকার আকাশে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভ্রূকুঞ্চন সহকারে অনুকূল বলিলেন, "দিনটে আজ শুভদিনই বটে!—দিব্যি একটি ঝড়-বৃষ্টি হ'বারই লক্ষণ!"

বিবাহে উপকরণ-দক্ষিণাদির অপ্রাচুর্য্য বশতঃ, বিশেষতঃ বিবাহবিধির আগাগোড়াই অব্যবস্থায় বিরক্তচিত্ত পুরোহিত কন্যা-কর্ত্তার এই অদ্ভুত মন্তব্যে শ্লেষ-গম্ভীর মুখে কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, আপনার মেয়ের বিবাহে

দেবতারাই বর-যাত্রী হবেন দেখছি ! মানুষকে ত আর নিমন্ত্রণ করা হল না—অগত্যা !”

কথাটার মধ্যে বিদ্রূপের তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া অনুকূল ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, গম্ভীর মুখে কহিলেন, “না হে, ঠাট্টা নয় ! এই ঝড়-জল হওয়াটা বড়ই সুলক্ষণ ! দেখ, আমি নেমন্তন্ন করলেও এই কাল-বৈশাখী মাথায় নিয়ে কেউ কি আমার বাড়ী পেট টালতে আসত ? ভাগ্যে ভাগ্যে উয্যুগটি করিনি, নইলে দেখতে দাঁড়িয়ে লোকসান হয়ে যেত।”

সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত আকাশে বাতাসে মিলিয়া যতই মাতামাতি করিল, অনুকূলের মনের ভিতর নিশ্চিন্ততার শান্তি ততই নিবিড়তর হইল। সারাদিন ধরিয়া তাঁকে যে সুশীলের উপর নজর রাখিতে হইয়াছিল, এখন আর প্রয়োজন নাই বুঝিয়া শান্ত-চিত্তে কলিকাটা ঢালিয়া সাজিলেন এবং পরম আনন্দে উহা উপভোগান্তে সম্প্রদান ঘরেরই এক পাশে একটা মাদুর বিছাইয়া একটু আরাম করিতে শুইবামাত্র ঘোররবে নাসিকা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিবাহবাড়ী বৃষ্টির সমতালের সহিত ঐক্যতানিক হইয়া উঠিল, দিকে দিকে নানা সুরের নানাবিধ উচ্চ হ্রস্ব নাসিকা-ধ্বনি !

যখন বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত ও ঝড়ের দাপাদাপি প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন বিবাহলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হইল পুরোহিত বেণী ভট্টচায্যের। তিনি চোখ রগড়াইয়া, এক টিপ নস্য লইয়া, প্রথমে শুধু গলায়—তার পর গা ঠেলিয়া অনুকূলকে জাগাইলেন।

“কত্তা ! বলি ও কত্তা ! মেয়ের বিয়ে কি কাল সকালে দেবেন ? রাত যে ভোর হয়ে গেল।”

চোখ মুছিতে মুছিতে অনুকূল তাড়াতাড়ি বর কনে আনিতে উপরে ছুটিলেন।

কনে খাটো চেলী পরিয়া, চণ্ডীর পুথি কোলে পিঁড়ির উপর বসিয়াছে, স্বল্প পূর্ব্বে বেণী ভট্‌চায্যের বোন ও গৃহিণী তন্দ্রা ছাড়াইয়া কন্যা-সজ্জায় মন দিয়াছেন। অনুকূলকে দেখিয়া ভট্‌চায্য-গৃহিণী মাথার কাপড় বাড়াইয়া দিলেন, ভগিনী আধা ঘোমটার মধ্য হইতে মৃদুস্বরে কহিলেন, "বর তুমি নিয়ে যাও, কনেকে চন্দনটুকু পরিয়ে আর পায়ে একটু আলতা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে।"

শয্যালীনা স্বর্ণলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সোনা-রূপোর আঁচড় ত আর কোথাও পড়বে না?"

তাঁর মৌন দৃষ্টিতে ভাষা না পাইয়া আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, "না হোক, ভাগ্যে থাকে, ঢের পরবে—এই নে'নীলি! এই 'গো'টা (গুয়া) গালে দিয়ে রাখ, বাসরঘরে বরকে কেটে খাওয়াতে হবে।—বউ! দেখ ভাই—চিতের-কাঠি, ধূঁতরো—পীদিম, ঠিক আছে ত?—তালা-চাবিটে দিস্ বাপু—ভুলিসনে যেন ওটা—মায়ের মতন মেয়েকে যেন চিরকালটা মুখ বন্ধ ক'রেই না কাটাতে হয়? এবার একটু বদল হোক্।"

অনুকূল সুশীলের অনুসন্ধান করিতে কোথাও আর বাকী রাখিলেন না, যখন কোনখানেই তার দেখা পাওয়া গেল না, তখন তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা খুঁজিয়া পাইলেন না!—এত বড় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া যে সুশীলের মতন সুশীল ছেলে এই মধ্য রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে পারে, এ যেন বিশ্বাস হয় না! আবার একবার এ ঘর সে ঘর খুঁজিয়া দেখা হইল—নাঃ, সে এ বাড়ীতে ত নাই!—কখন গেল? চামড়ার ব্যাগ দুইটাই পড়িয়া আছে, মণিব্যাগ? নাঃ, সে-ও ত আজ সকালেই শতাধিক মুদ্রা সমেত তাঁরই হস্তগত হইয়াছিল—সেটা —হ্যাঁ, এই ত রহিয়াছে!—তবে কি লইয়া গেল সে?

বিস্ময়-বিমূঢ়বৎ ফিরিয়া আসিয়া মেয়েকেই প্রশ্ন করিলেন, "সুশীল কোথা ?"

নীলিমার ততক্ষণে আলতা-চন্দনের সাজ শেষ হইয়াছিল। সলিলার্দ্র কেশের রাশি হইতে তখনও জল ঝরিতেছে বলিয়া বাঁধা হয় নাই। আর সকলে কার্য্যান্তরে গিয়াছে, একা ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পিছনে বসিয়া শুষ্ক বস্ত্রে সেই রাশি করা ভিজা চুল ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া দিতে-ছিলেন। বাপের প্রশ্নে আসন্ন-বিপদের ছায়া নীলিমার মুখে অন্ধকার ঘনীভূত করিল, কিন্তু প্রথম প্রশ্নের উত্তর সে নিরুত্তরে এড়াইয়া গেল।

তখন মুখ খিঁচাইয়া রোষতীব্র কণ্ঠে অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, "আবার লজ্জা করা হচ্চে!—ঝাঁটা মার অমন লজ্জার মুখে!—যা' জিজ্ঞেস কর্‌চি, সোজা কথায় জবাব দে, এর পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যত পারিস লজ্জা করিস!—বলি সেই নবাবপুত্তুর গেলেন কোথা ? এ দিকে যে লগ্ন-টগ্ন সব ভস্ম হয়ে গেল, তা'র খোঁজ রাখো কিছু ? আমিই না হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—তোমরা ত আর মর নি! গেলেন কোথা ?"

নীলিমা মুখ তুলিয়া দ্রুতস্বরে বলিল, "চ'লে গেলেন।"—বলিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইল। স্বর্ণলতা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু এই কথাটি এমনই আকস্মিকভাবে শ্রুত হইল যে, অনুকূল প্রথমটা যেন বাক্যার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না, বিস্ময়বিহ্বলবৎ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রাইলেন, নীলিমা সে দৃষ্টিতে অস্বস্থ হইয়া উঠিল।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা দমনে আসিলেও তার রেষ ফুরায় নাই, তাই অনুকূলের কণ্ঠ হইতে যেন আপনা আপনিই স্খলিত হইয়া পড়িল, "চ'লে গেছেন! কোথা ?"

নীলিমা পরিষ্কার স্বরে প্রত্যুত্তর দিল—"বাড়ী।"

অনুকূলের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল।—আহত শার্দ্দূলের ন্যায় ক্রোধারক্ত নেত্রে তিনি নীলিমার মুখের দিকে চাহিলেন—চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হইল যেন, তাঁর সেই আগুনের ভাঁটার মত চোখ দুইটা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া গিয়া এইবার নীলিমাকে বিদ্ধ করিবে! রোষগম্ভীর তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার হাতে টাকা ছিল না, বাড়ী যাবার টাকা পেলে কোথায়? তুই দিয়েছিস্।"

সেই রোষকঠোর দৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নীলিমা উত্তর দিল, "হ্যাঁ দিয়েছি।"

"আমার টাকা চুরি ক'রে তাকে দিয়েছিস্?"

নীলিমা নীরবে রহিল। অনুকূলের সিংহনাদ ও পদপ্রহারে সমস্ত ঘরখানা অকস্মাৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। নিজে নিজেও প্রচণ্ড ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সয়তানি! বেইমানি! যা'র জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর! তোর ভাল কর্‌তে গেলুম, আর তু-ই কি না আমার এই কর্‌লি? কি হ'ল তোর এ কাজ ক'রে? বল্ শীগ্‌গির, কিসের জন্যে তুই এত বড় আহাম্মুকী কর্‌লি? বল্ শীগ্‌গির—না' হ'লে আজ তোকে পাঁটা কাটা ক'রেই ফেল্‌বো!—বল্ শীগ্‌গির বল্—"

বাঘের মত গর্জ্জন করিতে করিতে মেয়ের ঘাড়ের উপর পড়িয়া লাথি চড় কিল দুহাতে দুপায়ে অজস্রধারে বর্ষণ করিতে করিতে অনুকূল এই কথা বলিতে লাগিলেন। নীলিমা প্রতিবাদে একটা কথাও কহিল না অথবা তাঁহাকে বাধাও দিল না, নিঃশব্দে রহিল—আর ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীও সেই ভাবে গামছা হাতে কাঠের মতই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁর এতটুকু প্রতিবাদের ভরসা হইল না।

এদিকে ক্রুদ্ধ-গর্জ্জনে অনুকূল চেঁচাইতে লাগিলেন—"মুখে আজ তোর রক্ত তুলে তবে ছাড়বো কি!—এখনই তোর হয়েছে কি! মিশনরী ইস্কুলে লেখাপড়া শিখে বিবি হয়েছেন! বরের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছিলেন, জানতে পেরে বিয়ে দিতে গেছি, এই আমার অপরাধ! শেষে আমারই পয়সা ভেঙ্গে ছোঁড়াটাকে পালিয়ে যেতে দিলি? অ্যাঁ!—কেন এ কাজ কর্‌লি?—কেন কর্‌লি? এর মানে আমি বুঝতে পারচিনে!—অ্যাঁ?—বল্ রাক্ষুসি! শীগ্‌গির—কেন কর্‌লি? কি তোর লাভ হলো সয়তানী!"

"ওগো! স্বর্ণদিদি যে মূর্চ্ছো গেছে, তোমরা ও করচো কি?" ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর সভয় চীৎকারে অনুকূল অর্দ্ধমৃতা নীলিমাকে ছাড়িয়া দিলেন।

বেণী ভট্টাচার্য্য একটু কাসিয়া মাথাটাকে বারকতক কণ্ডুয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, "তা'হলে চক্রবর্ত্তী মশাই! এই রাত্রেই ত অন্য বর আমাদের খোঁজ করতে হবে, এ মেয়ের ত আর রাত পোয়ালে বিয়ে হ'বে না, আর আপনারও তা'তে জাত যাবে।"

মন্তব্য শুনিয়া অনুকূল দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ক্রোধ-পরুষ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ও মেয়ের বিয়ে আবার দেবে কে? ও হারামজাদী মরুক গে, চুলোয় যাক্ গে, ওর কথায় আর আমি নেই।—এত বড় ছোটলোকের মেয়ে, আমার টাকা চুরি ক'রে ক'রে সেটাকে এত দিন ধরে খাইয়ে দাইয়ে আবার আমারই টাকা চুরি ক'রে কি না পালিয়ে যেতে দিলে? —কলিকাল বটে!

ভট্টাচার্য্য এক টিপ নস্য লইয়া বিস্ময় গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "সমাজ ত তা' শুনবে না, ভায়া! রাত পোহাবার পূর্ব্বেই কন্যাসম্প্রদানটি করবার ব্যবস্থা হওয়া চাই-ই চাই। তা আপনার যদি সম্মতি থাকে, বরের

জোগাড় কোন রকমে করে দিতে পারি, আপনারই ঘর, আমার ভগ্নীর ভাসুর হন, সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে—এই আপনারই বয়সী হবেন আর কি!—বিবাহে একান্তই ইচ্ছা, পুত্র কন্যা আর পুত্রবধূদের ভয়ে পারেন নাই—এ রকম অবস্থায় নিশ্চয়ই সানন্দে সম্মত হবেন, একটু কৌশল করে আনিয়ে নিলে ঘরের লোকেরাও জান্‌তে পার্‌বে না, দেখুন যদি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, তা' হ'লে চেষ্টা করি, সময় অতি সংক্ষেপ।"

অনুকূলের মনের মধ্যে ক্রোধের বহ্নি তখনও ঊর্দ্ধশীর্ষে জ্বলিতেছিল, এবং ক্রোধের সঙ্গে প্রচণ্ড বিদ্বেষের একটা তীব্র জ্বালা মিশ্রিত ছিল; জাতি হারাইবার ভয়ে নয়, নীলিমাকে জব্দ করিবার লোভে তিনি এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, একই সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়িতে ত্রস্তে উঠিয়া গেলেন।

এদিকে ততক্ষণে স্বর্ণলতার হৃত-সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য পরিবার তাঁহাকে বেড়িয়া নানা আক্ষেপোক্তি শুনাইয়া মড়ার উপর খাঁড়া চালাইতেছিলেন এবং নীলিমা নীরব নতমুখে মা'কে পাখার বাতাস করিতেছিল। মুখে মাথায় ধূলা ও বহু স্থানে শোণিত চিহ্ন থাকিলেও তাকে ঝড়ের আকাশের মতই স্তব্ধ দেখাইতেছিল।

অনুকূল আসিয়া এয়োদের উদ্দেশে বলিলেন, "আপনারা স্ত্রী-আচারের জোগাড় করুন গিয়ে—পুরুতদা' বর নিয়ে এলেন ব'লে—"

মেয়েরা বিস্ময়-চমকিত ভাবে ত্রস্তে উঠিয়া গেলেন, বর কে? জানিবার সমান আগ্রহ সকলেরই থাকিলেও জিজ্ঞাসা করিতে কেহ ভরসা করিলেন না।

সবাই উঠিয়া গেলে অনুকূল ডাকিলেন—"নীলি!"

নীলিমা বাপের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, চক্ষে তার ভয় ভাবনার চিহ্নও ছিল না।

পিতা কহিলেন, "তোমার সামনে ছুটো পথ, এক কাল সকালে সুশীলের নামে ফৌজদারীতে নালিশ দায়ের করা—যে—সে তোমার সঙ্গে অবৈধ-ব্যবহার ক'রে—তোমায় বিয়ে করতে রাজী হ'য়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে—এ মোকদ্দমা হ'লে খুব সম্ভব ভুবন রায় তোমায় বউ করবে, না হয় টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করবে—শেষেরটা বেশী সম্ভব! তারপর যদি সে বলে, তুমিই তা'কে যেতে দিয়েছ—তা' হ'লে তোমায় বলতে হবে, তোমায় মেরে ফেলবার ভয় দেখিয়ে তোমার হাত থেকে জোর ক'রে সে টাকা কেড়ে নিয়েছিল। রাজী আছ? এতে ঢের টাকা পাবে অন্ততঃ পাঁচ হাজারের কম তো নয়ই, চাই কি জোর করলে দশ হাজারও হ'তে পারে—কেমন? রাজী?"

নীলিমা নির্ভিক দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মাথা নাড়িল—"না।"

অনুকূলের মুখ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, শ্লেষ-পরুষ কণ্ঠে পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "আর এক পথ—নিমাই ভট্চায—আমাদের ভট্চাযের ভগ্নীপতির বড় ভাই, তা'কে বিয়ে করা—বর ওরা আনতে গেছে—এখনই এলো ব'লে—কেমন? রাজী আছ ত?—যেমন তোমার বরাত। অমন সোনার চাঁদ বর তোমার মনে ধরলো না!—বল্ছি, নালিশ ক'রে না হয় টাকাটাই নিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে চিরজন্ম কাটা, তা-ও শুনবিনে!—তা' হ'লে আমি আর কি করবো? মর তুই নিমাই ভট্চাযকে বিয়ে ক'রে তার ছেরাদ্দর পিণ্ডি রেঁধে—"

নীলিমা অবিচলিত দৃষ্টিতে যথাপূর্ব্ব চাহিয়া রহিল।

এমন সময় [illegible] মধ্যে যেন অকস্মাৎ প্রবল ভূমিকম্প হইল! সহসা রোগীর খাটখানা মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া উঠিল, পিতা ও কন্যা উভয়েই একসঙ্গে সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সেই মাসাধিক কালের অনড় রোগী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছেন—তাঁর ঠিকরিয়া পড়ার মতন দুইটি বিস্ফারিত নেত্রে অকথ্য ভীতি।

অনুকূল সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই নিজ বক্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন—"কি বলিস্? কর্‌বি নালিশ? আমি যা' যা' শিখিয়ে দেব, তুই শুধু সেই কথাগুলো আউড়ে যাবি—আর কিচ্ছুই তোকে কর্‌তে হবে না—দেখ্!—এখনও বল্ কর্‌বি?—নিমাই ভট্‌চাযের বয়েস কত জানিস্?—ছাপ্পান্ন বছর! দেখ্—আমার পরামর্শ নে', তোরই ভাল হবে, দশ হাজার টাকা কি সোজা টাকা! মনে করে দেখ্ দেখি একটীবার, সুদ গুনবি মাসে মাসে কতটী করে! হুহু করে ঐ টাকা বাড়িয়ে পাঁচ বছরে ডবল করে দে'বো।"

নীলিমা নিঃশব্দে দৃঢ়পদে উঠিয়া মা'কে ধরিয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, বাপের কথার জবাব দিল না।

"কি বলিস্—কর্‌বি? বল্!—কথা ক'!"

"না।"

এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে বেণী ভট্‌চায উৎসাহ-প্রফুল্ল মুখে ডাক দিয়া বলিলেন, "ওহে ভায়া! বর এনেছি, কনে নিয়ে চট্ ক'রে চ'লে এসে মন্ত্র দুটো প'ড়ে নাও, স্ত্রীআচার-টাচারের আর সময় নেই—আর কি জানো, ওগুলো শাস্ত্রীয় নয়—না হলেও কিছু আসে যায় না, চট্ করে এস, সূর্য্যি উঠলো বলে, এর পর মেয়ে যে দোপড়া হ'য়ে যাবে, বিয়ে সিদ্ধ হবে না।"

সহসা বাক্‌শক্তিহারা স্বর্ণলতা উদ্ধ্বস্বরে বুকফাটা হাহাকারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"নীলা! মা আমার! বাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তুই যে পুণ্য আজ সঞ্চয় করেছিস, তা'র পুরস্কার—[illegible] বাপ তোকে ভাল মতেই দিচ্ছেন! আমি তোর মা হয়ে বল্‌ছি, তুই ম'রে যা—ম'রে যা—ম'রে যা—কোন দিন বুক ভ'রে তোদের কিছুই দিতে পারিনি, আজ অন্তিমকালের বুকভরা আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিয়ে গেলুম—কসাইয়ের হাতে

বিক্রী হয়ে চিরজন্ম জ্বলে মরার চেয়ে যেমন করে পারিস মরে জুড়ো—ভগবান তোকে ক্ষমা করবেন !”

” বাতাহত কাণ্ডের মতই অকস্মাৎ তাঁর প্রাণহীন দেহ খাটের উপর হইতে গড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতের কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্রোতস্বিনীর ক্ষুদ্র ধারা যখন প্রবাহিত হয়, তখন পর্ব্বত যেমন কঠোর হস্তে তাকে রুদ্ধ রাখিতে পারে না বাধা দিলে ক্ষুদ্র ধারা স্ফীতবক্ষে প্রস্তরকারা ভাঙিয়া সগর্জ্জনে ধরণীবক্ষে আছড়াইয়া পড়ে ও বিশালকায় নদীরূপ ধারণ করে, সুশীলের অন্তরে নীলিমার স্মৃতিও তেমনই যতই বাধা পাইল, ততই বর্ষাবারিপুষ্ট তটিনীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইল। অবশ্য সে রাত্রে একটা আপ্ প্যাসেঞ্জারের থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে চাপিয়া ছিল, তখন শরীর মনে তার কিছুই চিন্তা করিবার সামর্থ্য ছিল না। ভিজা সার্ট খুলিয়া আদ্র বস্ত্র নিংড়াইয়া একখানা গদিশূন্য ধূলি-ধূসরিত বেঞ্চের উপর বাহুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিদ্রাহীন, চিন্তাহীন অর্দ্ধ মুদিত অবস্থায় কাটাইল। অতি অপ্রত্যাশিত জটিল ও ভয়াবহ ঘটনাচক্রের আকস্মিক ঘাত-প্রতিঘাত, অনাহার, দুর্ভাবনা, আতঙ্ক ও পরিশ্রম মিলিয়া তার সুখ-লালিত কোমল দেহ মনকে সুতীব্র ক্লান্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—প্রবল উত্তেজনার পরেই বিষম অবসাদের আক্রমণ অনিবার্য্য! সুশীলের অন্তরাত্মা তার দেহের সহিত সমভাবেই যেন অবসাদের মহাভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

অল্প-স্বল্প অনুভব করিতে পারিল সে * * * ছাড়াইয়া, তখন ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—অথবা এত দূরপথে তারা তার সঙ্গ লয় নাই? জানালা দিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা যাইতেছিল; কালো মখমলের মত আকাশের গায়ে উজ্জ্বল তারকাগুলা শতনরী হীরাহারের মত ঝলমল করিতেছিল—মাঝে মাঝে কেন্দ্রভ্রষ্ট এক একটা উল্কা অন্ধকার ব্যোমপথ প্রদীপ্ত করিয়া দেবরোষাগ্নির রূপে ধরণীর পানে ছুটিয়া আসিতেছিল। মুক্ত গবাক্ষপথে দৃষ্টি মেলিয়া সুশীল স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল। নৈশ শীতল বায়ু ধীরে ধীরে আসিয়া তার উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল, সে স্নিগ্ধ স্পর্শে সুশীলের ক্লান্ত চক্ষু ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া আসিল, নামিবার কথা মনে থাকিল না।

একটু বেলায় তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, সুশীল দেখিল, ট্রেনখানা * * * পৌঁছিয়া থামিয়াছে, রাত্রির নিবিড় অন্ধকার তখন দিবসের স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। জাগিয়া উঠিয়া গত রজনীর সেই দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতি এবং দুর্য্যোগপূর্ণ জীবনের স্মৃতি সহসা দুঃস্বপ্ন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তার পর একে একে ক্রমে ক্রমে সকল কথাই বিস্ময়-বিকল চিত্তে উদিত হইতে লাগিল এবং এদের সত্যতার সাক্ষ্য দিল—নিজের এই অনির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রা এবং কর্দ্দমাক্ত জুতা কাপড়!—তাড়াতাড়ি সে ট্রেন ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। যে ষ্টেশনের টিকিট কেনা হইয়াছিল সেখান হইতে সে আরও কয়েকটা ষ্টেশন বেশী আসিয়া পড়িয়াছে, এর জন্য দণ্ড দিতে হইবে, তার পর কলিকাতা ফিরিবার মত সম্বল ত তার হাতে থাকে না। সুশীলের মাথা টিপটিপ করিয়া উঠিল, এ'কি বে-হিসাবী কাণ্ড করিয়া সে আবার একটা জটিলতার মধ্যে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিল! একেই ত মাথার উপর বিপদ এখনও উদ্যত হইয়াই রহিয়াছে; তার বীভৎস কুৎসিত-মূর্ত্তি স্মরণে

আসিতে সমুদয় হৃদয়-শোণিত শীতল হইয়া উঠিতেছিল—আবারও এই একটা ছোট ব্যাপার লইয়া না জানি কত ভোগই বা ভুগিতে হয়! ক্ষোভে ও লজ্জায় তার কান্না পাইতে লাগিল। কিন্তু এখন উপায় কি? একটা উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু সেটাকে অবলম্বন করিবার কথা মনে পড়িতেই সুশীলের সমুদয় মনুষ্যত্ব যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ছি ছি, মন তার এমনও হীনতার কথা ভাবিতে পারিল?—এ'কি তবে সেই হীন-সংস্রবের ফল?

এই হীন-সংস্রবের কথা স্মরণে আসিতেই একসঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া স্মৃতিপথে অজস্র বিভিন্ন চিন্তা-তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল!—পিতার কথা, নিজের সুখময় স্মৃতিময় গৃহের কথা, বিপ্রদাস ও সুলেখার কথা—বিপ্রদাসের কথা মনে পড়িতেই আকপোল-কণ্ঠ লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, স্বতঃই মনে মনে একটা তুলনা-মূলক সমালোচনা দেখা দিল, অনুকূলের সঙ্গে। তখন তার বিশুষ্ক ওষ্ঠাধরে একটুখানি পরিতাপের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল—শ্বশুরভাগ্যটাই কি তার এই রকমই! সেবারেও বেত্রাঘাতে আরম্ভ, আর এবারে?—তার পর ভাবিল সুলেখাকে—নির্জ্জন সান্ধ্য অন্ধকারে লাঞ্ছিত বালকের ভয়ার্ত্ত অন্তরে কোন্ ছদ্মবেশী দেববালার মতই তার আকস্মিক আবির্ভাব! সে দিনের স্মৃতি-কথা সুশীলের হৃদয়ে সুবর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া আছে, কালের ধূলিজাল সময়ের বিস্মৃতি-হস্ত তাহাকে অস্পষ্ট করিতে অপারগ। স্নেহে, শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে কণ্টকিত হইয়া মানসপ্রতিমাকে মনের মধ্যে স্মরণ করিল। বিপ্রদাসের [illegible]কল কলঙ্ক ঐ অকলঙ্ক পূর্ণিমা-চন্দ্রের অম্লান জ্যোতিস্তরঙ্গে বিধৌত [illegible] গিয়াছে—বিপ্রদাস নিষ্ঠুর ও গর্ব্বান্ধ হইলেও সুলেখা দেবী!

সুশীলের একটানা চিন্তাস্রোতে একটা বিরুদ্ধ তরঙ্গ কোথা হইতে

আসিয়া আঘাত করিল! সুলেখার অনিন্দ্য মুখখানাকে আড়াল করিয়া আর একটা—অতি পরিচিত মূর্ত্তি অমনই সুস্পষ্টভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিল!—সবিস্ময়ে সুশীল দেখিল, সে মুখ সরমকুণ্ঠিতা নীলিমার, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ তার পূর্ব্বেকার সেই কুণ্ঠিত মূর্ত্তি নহে, এর কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, এ যেন নিজের অধিকার বলে আজ দৃঢ়পদে আসিয়া তার মুখের সাম্‌নে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। সুশীল এর সমুজ্জ্বল স্থিরদৃষ্টির আঘাতে যেন অস্বস্থ হইয়া দৃষ্টি নত করিল—তার মনে হইল, যদি বিপ্রদাসের আচরণ সুলেখাকে কলঙ্কিত না করে, তবে অনুকূলের পাপেই বা নীলিমা পাপী হইবে কেন? তখন সুশীলের চিত্তে চিন্তাস্রোত উল্টা হাওয়ায় বিপরীত মুখেই বহিতে লাগিল। বিগত রাত্রির বিচিত্র ঘটনাটা এতক্ষণ তার আধ-জাগ্রত চিত্তে যেন বৈচিত্র্যে ভরা স্বপ্নজালের মতই একটা বিহ্বলতার সৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু এখন সেটা স্ফুটতর হইয়া উঠিল এবং সেই অপূর্ব্ব ঘটনাজালের জটিল গ্রন্থিগুলি আপনা হইতেই খুলিয়া খুলিয়া তার মধ্য হইতে ঐ একটি মুখই তার মনের চোখে ভাস্বর হইয়া উঠিল। সুশীলের এতক্ষণকার আত্ম-চিন্তার স্থল অতি সহসাই সেই পরার্থপরতার অতি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তটা অধিকার করিয়া লইল! তখন বিস্ময়ে অভিভূত প্রায় হইয়া গিয়া মনে পড়িল, নীলিমা কাল নিজেকে কতখানি বঞ্চিত করিয়াই তাকে এই মুক্তিদান করিয়াছে!

সুশীল সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস সজোরে টানিয়া ফেলিল, যে কথাটা অতর্কিত বিপদের পরিবেষ্টনীর মধ্যে একবারও মনে পড়ে নাই, এখন নিরালায় বসিয়া অতীত কথা স্মরণ করিতে গিয়া তাহাই হৃদয়কে অধিকার করিল—সে নীলিমার বিপন্নাবস্থা! আত্মগ্লানির মত একটা বস্তু তাকে এই বলিয়া পীড়িত করিতে লাগিল, তুমি ত বাঁচিলে—সেই দুর্ভাগা মেয়েটীর বাপ কি করিবে!—সে সুশীলের পলায়নের সহায়

হইয়াছিল, একথা জানিতে পারিলে, চাই কি মেয়েকে সে খুনও করিতে পারে!

এ চিন্তায় সুশীলের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। যদি তাই হয়, সত্যই যদি সুশীলকে বাঁচাইতে গিয়া নীলিমাকে প্রাণ দিতে হয়? কেন সে এই কথাটা কাল রাত্রে একবারও ভাবিয়া দেখিল না? কি নিশ্চিন্ত মনেই চলিয়া আসিল—উঃ কত বড় অন্যায় হইয়াছে!

বহুক্ষণ ধরিয়া সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনের ক্ষুদ্র প্ল্যাটফরমের একটা ধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সুশীল এই রকম কত কিই ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু এ সব পরস্পরবিরোধী চিন্তার সে কূল খুঁজিয়া পাইল না! নীলিমার অদৃষ্টে এতক্ষণ না জানি কি হইয়াছে? ভাবিয়া মন তার ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল—নিজের স্বার্থে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া পুনশ্চ সেখানে ফিরিয়া গিয়া অনুকূল-প্রদত্ত অত্যাচারের অংশগ্রহণে এই কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের কথাও মনে হইয়াছিল, কিন্তু মানুষ নিজের মায়াটাকে বড় সহজে কাটাইতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গেই বিপরীত যুক্তি দেখাইয়া মন বলিল—নিশ্চয়ই নীলিমা সাহায্য করার কথা স্বীকার করে নাই এবং তাকে সন্দেহ করিবার কথাও নহে, অতএব বৃথা আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন কি?

এই চিন্তায় গুরুভারাতুর চিত্ত ঈষৎমাত্র লঘু হইলেও একটা সূক্ষ্ম অথচ অতি-তীব্র অনুতাপের জ্বালা তাকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিয়াই রাখিল এবং নীলিমার নিকট হইতে সে আগাগোড়াই যে নির্ব্বাক ও নিঃস্বার্থ সেবা পাইয়াছে, সেই সেবাকুশলতার, স্বার্থশূন্যতার, কর্ম্মশক্তির ধৈর্য্যের যে সকল পরিচয় সে এ যাবৎ পাইয়া আসিয়াছে, আর তারই উপর সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া নিজেকে কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরেই এই যে এত বড় বলিদানটা সে করিল, এই সকল একত্র মিলিত হইয়া

তার কৃতজ্ঞ হৃদয়কে তার প্রতি সুগভীর স্নেহে, শ্রদ্ধায় এবং হয়ত তদপেক্ষাও সমধিক বেগবান্ আরও কোন কিছুতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল! সুলেখার উজ্জ্বল মূর্ত্তি এর পাশে আজ নিষ্প্রভ বোধ হইতেছিল! দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে হইল যদি এই সুলেখাকে তার বাপ বাগ্দত্তা বধূরূপে নির্ব্বাচন না করিতেন হয়ত ভালই হইত—নীলিমার প্রতি এরূপ অমানুষিক নির্ম্মমতা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজনই হইত না!

# ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিতে সুশীলের প্রায় সপ্তাহকাল বিলম্ব ঘটিল। সেই দিন-সাতেকের ইতিহাসটা মোটামুটি এই ;—

ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের যাত্রীরা চলিয়া গেল, দু'খানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন গতায়াত করিল, সুশীল কিন্তু ঠিক সেই একভাবে চিন্তাভারাতুর আচ্ছন্নবৎ বসিয়াই রহিল! মাথার উপর রুদ্র বৈশাখের খর-তপ্ত রৌদ্র লইয়া ঘর্ম্মাক্ত শরীরে, শুষ্ক কণ্ঠে, কর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্তে আকাশ পাতাল ভাবিয়া সে অস্থির হইল।

ষ্টেশন-মাষ্টার নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া নিকটবর্ত্তী বাসাবাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য যাইতেছিলেন, দৃষ্টি সুশীলের প্রতি নিবদ্ধ হইল। তার কর্দ্দমাক্ত জুতা, কাদা-মাখা ধুতী-পিরাণ, রুক্ষ ও বিপর্য্যস্ত কেশ, এ সকলে দেখিবার কিছুই ছিল না, ছিল শুধু তার দক্ষিণ হস্তের কব্জিতে বাঁধা হল্‌দে সূতায় শুষ্ক কয়েকটি দূর্ব্বাদল!—বিস্মিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কে' হে তুমি? সেই ভোর থেকে ব'সে আছ? যাবে কোথা?"

সুশীল অতর্কিত সম্বোধনে চম্‌কাইয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া উত্তর দিল, "কল্‌কাতা।"

"কল্‌কাতা যাবে? তবে ঐ ৯টার প্যাসেঞ্জারটায় গেলে না কেন? ওটার চাইতে সুবিধার ট্রেণ ত আর নেই।"

সুশীল শুষ্কমুখে চাহিয়া রহিল।

ষ্টেশন-মাষ্টারের কৌতূহল বাধা মানিল না, সুশীলের সেই সূতাবাঁধা হাতটার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক সকৌতুকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার হাতে বিয়ের সুতো বাঁধা দেখছি, কিন্তু"—বাক্যের পাদপূরণ করিলেন অদৃশ্য বধূর বৃথান্বেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক?—পরে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে বউ ত দেখছিনে?"

সুশীলের শ্রান্ত-মলিন মুখ এই কথায় রাঙা হইয়া উঠিল, সে নিরুত্তরে স্তব্ধ রহিল—তা' দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের সন্দেহ হইল, হয়ত লোকটা পাগল, মা-বাপ ছেলের পাগলত্ব গোপন করিয়া কোন নিরীহ বালিকার সর্ব্বনাশ করিতেছিল, কিন্তু ভাগ্যের জোরে ভগবান্ এর মাথায় পলাইবার খেয়াল চাপাইয়া দিয়া থাকিবেন!—এই কথা ভাবিয়া মনটা প্রসন্ন হইল এবং কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খেয়েছ?"

আবার একটা ত্বরিৎ রক্তোচ্ছ্বাস তড়িৎবেগে সুশীলের কণ্ঠ, কপোল ও কর্ণমূল রক্তিম করিয়া দিল, কিন্তু অকস্মাৎ কি ভাবিয়া সেও যেন আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল—"না।"

"খাবি কিছু?"

সুশীল মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া হাসিয়া মাথা হেলাইল—খাইবে।

বাস্তবিকই তখন তার জঠরানল যেরূপ প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহার অপেক্ষাও তুচ্ছভাবে কেহ তাহাকে এই প্রস্তাব জানাইলে তাতেও হয়ত সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণে সে দ্বিধা মাত্র করিত না।

"আয় তবে আমার সঙ্গে"—বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার অগ্রসর হইলেন এবং সুশীলও তাঁর সঙ্গ লইল। তিনি যে উহাকে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন, ইহাতে সে অনেকখানি আশ্বস্ত এবং বেশ একটু কৌতুক বোধও করিতেছিল, পথে সে হাতের সূতাটা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। খুলিবার ও ফেলিবার সময় আর একবার নীলিমার মুখ তার মনের আকাশে তড়িৎস্ফূর্ত্তির মতই চকিতে উঠিয়া মিলাইয়া গেল—অন্তরের মধ্য হইতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া আসিল—আহা বেচারা !

ষ্টেশন-মাষ্টারের গৃহে আসিয়া আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল! এত বেলায় এক পূর্ণবয়স্ক অতিথি সঙ্গে আনিতে দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার-গৃহিণী স্বামীর প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় যা মুখে আসিল তাই বলিয়া অবশেষে উঁচু গলায় শেষ রায় প্রদান করিলেন, "এনেছ সখ ক'রে, নিজের ভাতগুলো ধ'রে দিয়ে এক থালা ছাই বেড়ে এনে দিচ্চি—তাই খাও !"

স্বামী মিনতির সুরে অনেক স্তুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, বাহিরে থাকিয়া সে-সকলের ভাষাগত অর্থবোধ না হইলেও ভাবার্থ বুঝিতে সুশীলের বাধা ঘটিল না, তারই সঙ্গে আরও একটা শব্দ অকস্মাৎ তার কানে আসিয়া বাজিতে সে যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও সেই সঙ্গে অপরিমিত কৌতুকও বোধ করিল। শুনিতে পাইল, ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁর কুপিত প্রিয়ার মনস্তুষ্টির জন্য নানা কথার মাঝখানে বলিয়া বসিলেন, "ওকে কি আর শুধুই এনেছি? তুমি যে সে দিন এক জন রাঁধুনীর খোঁজ করতে বলেছিলে না, তারই জন্যেই না এনেছি।"

এ কথায় গৃহিণী সহসা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "আহা, তাই বল! তা' এতক্ষণ বলনি কেন ছাই?—আচ্ছা, আচ্ছা, ন্যাও,

মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসো—ওলো বিমল ! নে' চট করে, তোর বাবাকে একটা ঠাঁই ক'রে দে—বলি গেলে কোথা ? আছ না মরেছ ?”

“যাই মা !” বলিয়া একটি বছর পনেরো যোলর মেয়ে আধখোলা রুক্ষ চুলের বেণী দুলাইয়া ছুটিয়া আসিল, সে তখন পাড়ার দুটি হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়ের সঙ্গে কড়ি খেলিতে ব্যস্ত ছিল, মা বলিলেন, “ধেড়ে মেয়ের দিনরাত কেবল কড়ি খেলা ! যা, শীগ্‌গির ঠাঁই ক'রে দিয়ে, একখানা থাল ধুয়ে দে—ভাতটা বেড়ে ফেলি, তা' হাঁগা ! তোমার ঐ রাঁধুনী-টাকে দুটো ছাতু-টাতু দিলে এ বেলাটা চলবে না ? ভাত ত আর রাঁধা হয় নি ওঁর জন্যে।”

সুশীলের মনটা একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল—ছাতু !—সে আবার কেমন লাগিবে ?—তার পর মনকে সহজ করিয়া লইল—তাই বা মন্দ কি ? সেইটাই বরং তার এই রাঁধুনী-জীবনের সহিত সমধিক খাপ খাইবে ! ছাতু খাইবার জন্যই সে প্রস্তুত ও উৎসুক হইয়া রহিল। মনে হইতেছিল, ছাতু ছাড়িয়া আস্ত ঘোড়ার দানা পাইলেও সে এখন খাইতে পারে ! ক্ষুধার জ্বালা ও তৃষ্ণার কষ্ট ক্রমেই অসহ্যতর হইয়া উঠিতেছিল।

অবশেষে একমুঠা হাঁড়িচাঁচা ভাতের সঙ্গে চারিটি ছাতু, একটু গুড়, এক ঘটী ঠাণ্ডা জল সে খাইতে পাইল। সেই ‘বিমল’ নাম-ধারিণী অনূঢ়া কন্যাটি এই সকল ভোজ্যবস্তু আনিয়া দিয়া আদেশ করিয়া গেল, “খেয়ে উঠে বেশ করে গোবর দিয়ে ‘ঝুটা’ মুক্ত করো, আর বাসন-মাজা নোংরা হয় না যেন দেখ ! তা'হলে ‘দোহরায়কে’ ফিন মল্‌তে হবে।”

গোবরে হাত দিতে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করিলেও আলগোছ ভাবে সুশীল সে আদেশও কোনমতে পালন করিল।

ষ্টেশন-মাষ্টারের ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীতে দুখানি ঘর। একখানি কর্ত্তার

শয়নগৃহ, অপরখানি প্রয়োজন মত বাহিরের ঘর হয়, আবার রাত্রে ছেলেমেয়েদেরও কেহ কেহ শয়ন করে, এরই এক প্রান্তে খালি মেঝের উপর হাতে মাথা দিয়া সুশীল শুইয়া পড়িল এবং সম্পূর্ণ নূতন এই কৌতুকপ্রদ অবস্থার কথা সকৌতুকে মনে করিতে করিতে সত্বরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। বিছাইবার জন্য একটা মাদুর চাহিয়া পাঠাইতে উত্তর পাইয়াছিল যে, রাঁধুনী মানুষের অত আদিখ্যেতা কেন? নবাবের বেটা ত আর এ বাড়ীতে রাঁধিতে আসে নাই!

সন্ধ্যার পরে যখন সুশীলের ঘুম ভাঙ্গিল, সে বুঝিল বাড়ীর মধ্যে খুব একটা সোরগোল চলিতেছে, একটুক্ষণ পরেই জানা গেল সেটা তারই উদ্দেশ্যে! গৃহিনী সপ্তমে গলা চড়াইয়া চীৎকার করিতেছিলেন, "ও মা! এ কেমন রাঁধুনী নিয়ে এল গো! এ যে দেখি কুম্ভকর্ণের ব্যাটা! কানের কাছে ঢাক পিটোলেও সাড়া দেয় না যে! ছোঁড়া ম'রে গেল নাকি? ওলো ও বিমল! এক ঘটী জল এনে ছোঁড়াটার মাথায় ঢেলে দে'ত দেখি, জাগে কি না জাগে! এ সব ভিটকিলিমী আমার ঢের দেখা আছে।"

এই মন্তব্য কানে ঢুকিতেই ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া সুশীল বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল তার চারি পাশে জমা হওয়া একপাল ছেলেমেয়ে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং জলের ঘটী হাতে সদ্য-প্রবিষ্টা বিমলা আকস্মিক রসভঙ্গে সকোপ তীক্ষ্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল, "মা যে অত চেঁচিয়ে মরছিল, তুমি তা হলে 'কল্লা' ক'রে প'ড়ে ছিলে?—'ঝুটো'কে আমায় জল তোলালে? ভারি বদ মানুষ তো তুমি দেখছি!"

সুশীল প্রথমে বিরক্ত ভ্রূকুটি করিল, পরে এই অপবাদকেও শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

সর্ব্বাপেক্ষা বিপদে পড়িল কিন্তু রাঁধিতে বসিয়া!—মনে ভাবিয়াছিল

রান্না আর এমন শক্ত কাজ কি? যখন অবস্থা এই রকমই ঘটিল, তখন আর কি করা যাইবে? দুদিন রাঁধিয়া দু' টাকা পাইলে বাড়ী ফিরিবার একটু সুবিধা হইবে ত!—কিন্তু কাজটাকে বাহিরে যতটা সহজ দেখায়, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটা সে রকমই নয়! সবের চাইতে অসুবিধা ঘটিল ভাত রাঁধায়। ভাত সিদ্ধ করিতে কি আন্দাজ জল ঢালিতে হয়, সুশীলের সে অভিজ্ঞতাই নাই, সিদ্ধ হইল কি না, বুঝিবারই বা উপায় কি? তার পর ফেন গড়ান? অশেষ চেষ্টার পর সে যখন পাক-পিণ্ডবৎ ভাতের হাঁড়িটা জ্বলন্ত চুল্লী হইতে কোনমতে ভূমে নামাইল, তখন পোড়া ভাতের দুর্গন্ধে পাড়া মাতিয়া উঠিয়াছে এবং হাঁড়ি উল্টাইবার বৃথা শ্রম তার যে উপায়ে বাঁচিয়া গেল, ফলে তাকে চির-অনর্ভ্যস্ত এতই কঠিন কথা শুনিতে হইল যে, ধৈর্য্য রাখা দায় হইল! সেই চৌচির হওয়া ভাতের হাঁড়ি, গরম ফেনের স্রোত এবং পোড়া ভাতের দুর্গন্ধের মধ্যে হেঁটমুখে লজ্জাক্ষুণ্ণ চিত্তে বসিয়া সুশীল নূতন অবস্থার কৌতুক প্রলোভন হইতে মনকে মুক্ত করিয়া লইল। না, নিশ্চয়ই তাকে উপায়ান্তর খুঁজিতে হইবে!

ষ্টেশন-মাষ্টার ষ্টেশনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিমগ্ন ছিলেন, সুশীল গিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

"কিরে? রান্না শেষ হয়েছে? খেতে ডাকতে এলি না কি?" বলিয়া কৌতুক স্মিতমুখে ভদ্রলোকটি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

সুশীল বিষণ্ণ হাসি হাসিল—ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, "আজ্ঞে মাপ করবেন, রান্না আমি করতে পারলেম না।"

অ্যাঁ, পারলি নে? কেন রে?—ওরা দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়নি বুঝি? দুটো দিন দেখে নিলেই খাসা শিখে নিবি—বকুনি খেয়ে পালিয়ে এসেছিস্? তা' দেখ্, আমার বাড়ীর ভিতরের ওরা একটু বকতে

ভালবাসে, তা বকলেই বা?—বকুনি খেলে ত কারু গায়ে ফোস্কা পড়ে না?—কি বলিস্?—এই দেখ্‌না কেন, আমাকেই ত কত বকে, আমি চুপটি কোরে শুনে যাই—কথাটি কই নে', মারবে না ত! বকে বকে মুখ ব্যথা হয়ে গেলে নিজেই থামে। তুইও—তাই কর্‌বি, বুঝলি? আয় আমি দেখে আসি, কি হয়েছে—আয় আমার সঙ্গে।"

সুশীলের আশ্রয়হীন চিত্ত এই সরল নিরীহ লোকটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করিল, সে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নয় বুঝিয়াও 'না' বলিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া মনিব-ভৃত্যের সৎকারটা যে কিরূপ সাদরে ও সাড়ম্বরে হইল, তাহা অনুমেয়!

প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া সুশীলের মনটা আজ প্রথমেই নিরানন্দে ভরিয়া উঠিল—আবার সারাদিন সেই দীনতার ছদ্মবেশে হীনাভিনয় করিতে হইবে? নিজের প্রতি একান্ত বিরক্তি ধরিল, মনে হইল, টেলিগ্রামে টাকা পাঠাইবার জন্য বাড়ীতে আরজেণ্ট তার দিই—আবার মনটা গুটাইয়া আসিল—বাড়ীতে তার সম্বন্ধে কি কথাই না রটিয়াছে—কি সংবাদই না পৌঁছিয়াছে, সঠিক খবর না জানিয়া তুচ্ছ কয়টা টাকার জন্য হাত পাতিতে যাইবে না। যদি অনুকূল তার বাপকে তার চক্রান্তের হীনতম কথা সত্য সত্যই লিখিয়া থাকে?—ওঃ ভগবান! তাঁকে সে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া?

সুশীলের বুকে দারুণ অশান্তি তুমুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদি পিতা সে সব কথা বিশ্বাস করিয়া থাকেন? যদি তিনি সুশীলকে দোষী মনে করেন? যদি তাকে ক্ষমা না করেন? তবে সে বাঁচিবে কিরূপে? পিতা যে তার চিরজীবনের একমাত্র অবলম্বন ও আদর্শ, পিতা যে শুধু তার পিতা নহেন, একাধারে পিতামাতা দুই-ই—যদি এত বড় কঠিন

আঘাতে সেই অগাধ পিতৃ-স্নেহ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে? সুশীল সে ক্ষতি সহিতে পারিবে না। বাড়ী ফিরিতে ভয় ও সঙ্কোচের সহিত ফিরিবার আগ্রহ যেন সীমাতিক্রম করিতে লাগিল—অথচ ফিরিবেই বা সে কেমন করিয়া?

এই আশঙ্কা-উদ্বেলিত, দুশ্চিন্তা-পীড়িত, উত্তেজিত শরীর মন লইয়া কোনমতে দুইটা দিন কাটাইয়া তৃতীয় দিবসারম্ভে শরীর মন দুই-ই বিষম বিদ্রোহ করিয়া বসিল, এই অনভ্যস্ত অক্ষম দাসত্বের বন্ধন অসহনীয় বোধ হইল; সেই সঙ্গে মনে পড়িল, এই ক্ষুদ্র কার্য্যের ক্ষুদ্র বেতনের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতে গেলে কত দিনই যে এই দুরবস্থা ভোগ করিতে হইবে, তাও বলা যায় না, মনটা দারুণ বিষাদে ভরিয়া উঠিল। প্রথম সে একটু কৌতুকবোধও এই চাকরী স্বীকারের মধ্যে অনুভব করিতেছিল; কিন্তু সেটুকু দিনে দিনেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, আজ আর কোনমতেই গৃহাভিমুখী চিত্তকে ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইল না, একবার মরিয়া হইয়া মনে করিল, বিনা টিকিটেই না হয় চলিয়া যাই—কিন্তু অন্যায় কার্য্যে অনভ্যস্ত বিবেক সায় দিল না।

বিমলা আসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—"এই পাগ্‌লা! হাঁ ক'রে ব'সে ব'সে কি ধ্যান কর্‌ছিস্? রান্না চড়বে কখন শুনি? তোর মত সবারই ত আর হাওয়া খেয়ে পেট ভরবে না? ভাল একটা খ্যাপা জুটেছে!"

সুশীল অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সবিস্ময়ে ভাবিল—"এই সব মেয়ে ভদ্রসংসারেরই, পড়িবেও কোন ভদ্রঘরে; কিন্তু এদের শিক্ষা-সহবতের কোন বালাই নাই!—এর তুলনায় নীলিমা কত ভাল!—অথচ এর বাপ কত ভদ্র!"

তখন মনে পড়িল স্বর্ণলতাকে—আহা—নিরীহ বেচারা! সুশীলের

বুকটা টন টন করিয়া উঠিল।—কত মহৎ মন তাঁর! নীলিমা মায়ের সেই মহত্ত্বের অংশ কি' না পাইতে পারে! নীলিমার মহত্ত্বের কথায় নিজের অনুদারতা স্মরণে মন যেন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সুশীলকে নিরুত্তর দেখিয়া বিমলা বিষম রাগিয়া গেল, ক্রুদ্ধ তর্জ্জনে মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "বলি, কানের মাথা খেয়েছ?—শীগ্‌গির ওঠ্ বল্‌ছি, না হ'লে ছিপটী মেরে তুল্‌বো!"

সুশীল ক্ষুণ্ণ স্বরে জবাব দিল—"আমার ভাল লাগ্‌ছে না, আমি রাঁধবো না।"

বিমলার মুখ ক্রোধে পরুষ হইয়া উঠিল, "কত আব্দার!—ম'রে যাই আর কি!—রাঁধবেন না—ওঁর ভাল লাগছে না, লাট সাহেব এয়েছেন—আস্পর্দ্ধা ত কম নয়!—মা! ও—মা! শুন্‌তে পাচ্ছো—তোমার আদুরে গোপাল আজ রাঁধতে পারবেন না, ওঁর মন ভাল নেই।"

গৃহান্তর হইতে গৃহিণীর ক্রোধ-গম্ভীর কণ্ঠের সাড়া আসিল—"যাচ্ছি কি না চ্যালা কাঠ নিয়ে, মন ভাল কর্ব্বার দাওয়াই দিচ্চি।—হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার সকলই বায়নাক্কা!"

রাত্রি ৯টার মধ্যেই এ বাড়ীর রান্না খাওয়া চুকিয়া যায়। ডাউন প্যাসেঞ্জার প্রায় মধ্য রাত্রে ষ্টেশন ছাড়ে। আহার সমাধা করিয়া আসিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার নিদ্রা-বিজড়িত নেত্রে টেবলের সাম্‌নে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ ঘড়িটার প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি পড়িতেছিল। সুশীল বিজড়িত ভাবে দাঁড়াইল।

"কি রে? এত রাত্রে কি কর্‌তে এলি?"—বলিয়া নন্দ বাবু সস্নেহ-কণ্ঠে সম্বোধন করিলেন। তার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিতেই মনটা যেন করুণামথিত হইয়া গেল। এই নিরাশ্রয় তরুণ ও সুন্দর

ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়া তাকে তিনি যে একান্ত পীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন, সে তাঁর অজ্ঞাত ছিল না, আজ যে একটা বড় রকম ঝাপ্‌টা ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, ইহাও তাঁকে জানিতে হইয়াছিল—তিনিই ত গৃহিণীর উপর শত্রুতা সাধনের বদ মতলবেই এটাকে জুটাইয়াছেন !

সুশীল আজ সকল দ্বিধাকে পরাস্ত করিয়া স্থির সঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছিল, সঙ্কোচে কণ্ঠ রোধ করিতে চাহিলেও এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, —"আমায় আপনি যা' দেখছেন, আমি ঠিক তা' নই।—আমার নাম সুশীলকুমার রায়, আমার বাপ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় অবস্থাপন্ন লোক, দৈববিড়ম্বনায় আমায় এ রকম বিপন্ন হ'তে হয়েছে—আপনি যদি আমায় সাতটি টাকা কর্জ্জ দেন—আমি বাড়ী ফিরে যাই, পৌছেই আপনার টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো।"

নন্দ বাবু বিস্মিতনেত্রে সুশীলের উত্তেজিত আরক্ত মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কণ্ঠে তার যে অখণ্ডনীয় সত্যের সুর ঝঙ্কার দিয়াছিল, তার মুখ চোখের উৎকণ্ঠিত আগ্রহের মধ্য হইতে সহজ সত্যের যে অমিশ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাকে নিতান্ত অন্ধ ব্যতীত আর কেহই অবিশ্বাস করিতে অপারগ !

আগ্রহ-ব্যাকুলকণ্ঠে সুশীল পুনশ্চ কহিল, "পার্‌বেন কি বিশ্বাস কর্‌তে ? আমি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ি, রান্নার আমি কি জানি, এক মাস আপনার বাড়ী রাঁধতে পার্‌লেও হয় ত ঐ সাত টাকা আমার হবে না, আর আমি তা' পার্‌বোও না—আমার পক্ষে সে সম্ভবও নয়, বাবাকে এ সব কথা জানাতে ইচ্ছা করি না, সেইজন্য।"

সুশীলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, উদ্বেলিত লজ্জা অভিমানটাকে দমন চেষ্টায় সে এইবার সচেষ্ট হইয়া পড়িল।

নন্দ বাবু একটি কথা না বলিয়া বাক্স খুলিয়া এক টাকার করিয়া সাত খানি নোট গণিয়া তার হাতে দিলেন।

ঢং ঢং ঢং ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ষ্টেশন-মাষ্টার সুশীলের হাতে টিকিট দিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, ভুলে যেও।"

সুশীল সাশ্রুনেত্রে তাঁর পদধূলি লইয়া অশ্রুগাঢ় কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "আমায় আপনি ভুলবেন না—যদি কখন সুযোগ পাই, একবার আপনার কাছে আমি আস্‌বো।"

নন্দ বাবু স্নেহ-করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। হুইশেল দিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং দেখিতে দেখিতে নৈশ অন্ধকাররাশির মধ্যে সেই দু'দিনের রহস্যময় অতিথিকে তাঁর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

## চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা মহানগরীর এক সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর উদ্যানমধ্যস্থ প্রাসাদোপম অট্টালিকার সযত্ন-সজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া দুইটী সুন্দরী তরুণী কথা কহিতেছিল। জানালার উপর ঝালরদার এবং দরজায় মোটা কাপড়ের পর্দ্দা ফেলা, ঘরের মার্ব্বেলের মেজে পুরু গালিচায় মণ্ডিত, আশপাশে টেবল চেয়ার কৌচ, একখানা বড় সোফায় বসিয়া বিনতা ও সুলেখা।

সুলেখা এখন আর বালিকা নাই, সে এখন বর্ষাবারিপরিপূর্ণ

স্রোতস্বিনীর মত অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছে, গোমুখী-নিঃসৃত স্বচ্ছ নির্ঝরধারা এখন জাহ্নবীরূপিণী। তার তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ বয়সের উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বলতর, সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতা ও মসৃণতা তাকে যেন নিপুণ হস্তে রচনা করা দেবী প্রতিমার মতই অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। হরিণী-নেত্র ঈষৎ সরম-সঙ্কোচে নত হইতে শিক্ষা করিয়াছে, গণ্ডেও মধ্যে মধ্যে লালিমা গোলাপের বর্ণকে গাঢ় করে।

বিনতা বলিতেছিল, "তুই বুঝতে পারবি কেন? নিজে রূপের ডালি সাজিয়ে ব'সে আছিস্ কি না, রূপতৃষ্ণা কি জিনিষ, তা'ত জান্লি না? আমি নিজে কালো, নিজেকে নিয়ে ত আশ মেটেনি, তাই আমি অপরকে নিয়ে সেইটে মেটাতে চাই, তুই নিজের রূপেই মসগুল হয়ে থাকবি, তোর কি?"

সুলেখা লজ্জা-স্মিত মুখে উত্তর করিল, "তাই নাকি হয়? নিজে কালো কি ভাল, তা' বুঝি আবার দেখা যায়? না ভাই! তা ব'লে তোমার ও কথাটা ঠিক নয়, রূপে মন মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু সেটা স্থায়ী হতে পারে না, এক দিন না এক দিন মানুষের মন থেকে রূপের মোহ কেটে যায়ই যায়, কিন্তু গুণের আদর চিরস্থায়ী।"

বিনতা সন্দেহ-স্মিত মুখে একটু অনুযোগের সুরে কহিল, "তবে কি তুই বল্তে চাস তোর হবু-নন্দাইয়ের কোন গুণই নেই? মাকালফল?"

সুলেখা অপ্রতিভের শেষ হইয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে এই অনুযোগটাকে সে অস্বীকার করিতে না পারিলেও প্রকাশ্যে স্বীকার করাও চলে না, ঘাড় হেঁট করিয়া নম্র মধুর হাস্যের সহিত সংক্ষেপে কহিল, "তাই কি বল্ছি?"

বিনতা আবেগের সহিত কহিল, "বলছিস্ বৈ কি, শুধুই কি তুই? সব্বাই ত এই কথাই বল্ছে, বাবার মন ত খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে—

সেও আমি বেশ টের পাচ্চি, দিদি আমার সঙ্গে বাক্যালাপই ছেড়েছে, জামাইবাবু এ বিয়েয় ত আসবেনই না, যেহেতু তার ভাইকে অপমান করা হয়েছে—দাদার যে কি মতলব, সেই জানে! গরীবকে বন্ধু বল্লেও ভগ্নীপতি বল্‌তে হয়তো তাঁরও রুচি হচ্চে না।—কেন বলত, গরীব ব'লে বুঝি ওদের বড়লোকের মেয়েকে ভালবাসতেও নেই? আমি কালো, আমায় যে ওর ভাল লেগেছে, সেই ত ওর কতখানি উদারতা।"

সুলেখা বিস্মিত নেত্রে বিনতার ভাব-গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল দেখিয়া বিনতা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিল।

"আচ্ছা সু! তোরও ত দাদার সঙ্গে কত দিন থেকে বিয়ের কথা হয়ে রয়েছে, দাদাকে তোর দেখতে ইচ্ছে করে, দেখতে ভাল লাগে? বিয়ের দেরী হচ্চে ব'লে মনটা বিরক্ত হয় না? ঠিক ক'রে বল্।"

সুলেখার গালদুটি ডালিমফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। চঞ্চল হইয়া সে অঞ্চল হইতে রেশমী সূত্র টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল, কথার কিন্তু প্রতিবাদ করিল না—বিনতা সকৌতুকে উচ্চহাস্য করিল।

বাহিরের দিকে একটা গোলমাল শুনা গেল। অল্পক্ষণ পরে নিতাই চাকরটা উচ্চকণ্ঠে কাহাকে বলিতেছে—"ওরে পিসীমাকে ব'লে আয়, ছোটবাবু এয়েছেন।"

বিনতা ও সুলেখা দু'জনেই এ সংবাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুলেখার পদনখ হইতে উত্থিত হইয়া মাথার কেশমূল পর্য্যন্ত একটা পুলকের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার রক্তিমায় তার হিম-শুভ্র ললাট ও কম্বু কণ্ঠ আরক্তিম হইয়া উঠিল, বিনতা তার ফুলা ঠোঁট একটু বাঁকাইয়া সাভিমান মন্তব্য করিল, "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে, তা' হ'লে, আমি বলি, নীলিমা বুঝি তাঁকে ভুলিয়েই বা নিলে!"

সুলেখার কানে ব্যঙ্গোক্তিটা ভাল লাগিল না—সে ব্যক্তিটি কে? এই প্রশ্ন মনে জাগিলেও, প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হইল।

সুশীলকে দেখিয়া দ্বারবান্ সরকার মহাশয় ও নিতাই খানসামা যতটা বিস্মিত হইয়াছিল, ঠিক ততটাই সে ঘরের লোকদের দান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া নিতাইয়ের সাহায্যে স্নানাদি সারিয়া স্বাভাবিক বেশে যখন পিসীমার ও ভুবন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল; একটু রোগা দেখাইলেও তার উপর দিয়া কত বড় যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তার বিশেষ চিহ্ন প্রকটিত ছিল না। পিসীমা গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মনে মনে কৃপণ বুড়ার আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। মুখে কিছু বলিবার প্রবৃত্তি হইল না, সেই সর্ব্বনেশে কৃপণটার জ্বালা তাঁর সংসারে যে ভাবে পতিত হইয়াছে, তার কাছে এটুকু ত সামান্য।

সুশীল এ বিবাহের সংবাদে স্তম্ভিত হইল। এ কি দৈববিড়ম্বনা, না প্রকৃতির পরিশোধ? যে দুর্দ্দশার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সে ফিরিল, সেই অবস্থায় পতিত হইল তারই বোন বিনতা!

বিনতাকে অনুকূলের পুত্রবধূ হইতে হইবে, মনে করিতে সুশীলের মন বিরক্তিতে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। এ হইতে পারে না। বিনতা সে ঘরের সহিত সম্পর্কিত হইলে, তাদের সংস্রব রাখা অনিবার্য্য হইবে, সে সম্ভব নয়! এ বিবাহ বন্ধ করিতেই হইবে।

শুভেন্দুর কথা মনে করিতে সুশীলের মনে হইল, কোন্ ভরসায় সে তাদের সেই মলিন সংসারে তার বোনকে টানিতে চাহিতেছে? সঙ্গে সঙ্গেই হাসি পাইল—অনুকূলের পুত্রই ত সে—তার পক্ষে বিনতাকে বিবাহ করিতে চাওয়া এমন কি দুঃসাহস?

একবার বিনতার সহিত শেষ চেষ্টায় আসিতে প্রস্তুত হইল।

"বিন্!"—বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই সুশীলের দৃষ্টি পড়িল সুলেখার জবাকুসুম সদৃশ আরক্ত মুখে। বিস্ময়ের একটা বিপুল আনন্দ তার শিরায় শিরায় বহিয়া গেল। সুলেখাকে এখানে দেখিয়া তার সারাপ্রাণ যেন আশ্বাসে ভরিয়া উঠিল, মনে হইল, সে যেন নিজেরও অজ্ঞাতে ইহাকেই খুঁজিতেছিল। নিজের মনকে সাম্‌লাইয়া লইবার জন্য আজ ইহাকে তার বড় প্রয়োজন! তাই প্রার্থিতাকে নিকটে দেখিয়া মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে!

"কি গো দাদা ঠাকুর! বাড়ী ফিরলে? নীলিমা যে বড় ছেড়ে দিলে? আমরা বলি, একেবারে গাঁটছড়া বেঁধেই বা বুঝি আস্‌ছো!"

বিনতার এই সহজ বিদ্রূপে সুশীল যেমনই চমকিত, তেমনই রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তার বুকের মধ্যে অপরাধীর লজ্জা তোলপাড় করিতে লাগিল। মনে হইল, তা হ'লে হয় ত অনুকূল বাবাকে চিঠি লিখিয়াছে—তিনি কিছু বলিলেন না বটে; কিন্তু তিনি ত কখনই কিছু বলেন না! গভীর আতঙ্কে লজ্জায় সে সুলেখার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল, সুলেখাও কি জানে?

বিনতা সুশীলের বিজড়িত অবস্থা দেখিয়া কৌতুকে হাসিয়া উঠিল, "খোকাছেলের বুঝি রাগ হল? হ্যাঁ, রাগ শুধু উনিই করতে জানেন, আমি ত আর জানি নে'! এত দেরী ক'রে আসা হলো কেন বল ত? সুলি শুদ্ধু তোমার পথ চেয়ে ব'সে রয়েছে—বাবুর আর সেই 'কিপটে বামুনের' ভাতের মায়া কাটে না!—সাধ ক'রে কি আর বলতে হয় যে, নীলিমা তোমায় 'তুক' করেছে।"

সুশীলের সর্ব্বাঙ্গ হইতে একটা দারুণ লজ্জার খোলস খসিয়া পড়িল। সে নিশ্চিন্ত স্মিতমুখে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল—"কে' কাকে কি

করেছে—সে তো বাড়ী এসেই দেখতে পাচ্ছি রে!”—বলিয়া সুলেখার সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই সলজ্জ স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল—“ভাল আছ সুলেখা ?”

রঞ্জিতমুখী সুলেখা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর প্রদান করিল। বিনতা বলিল —“ভাল এত দিন ছিল না, এখন হলো। পোড়ারমুখী ক’দিন ধ’রে কান পেতে পেতে মোটরের শব্দই শুনছে, বিশ্বের আর কোন সাড়া ওর কানে গিয়ে পৌছয়ও নি।”

সুলেখা বিনতার বাহুমূলে একটা কঠিন চিম্‌টী কাটিয়া চাপা তর্জ্জনে শাসন করিল—“বড্ড যা’ তা’ বলছো!”

সুশীলের ভারাক্রান্ত চিত্ত ক্রমেই লঘুতর হইয়া আসিতেছিল। সুলেখা!—তার অন্তরাসনের চির-প্রতিষ্ঠিতা দেবী—এর সঙ্গে কারোও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবে না।—এত রূপ—এত গুণ—এত স্নেহ আর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা! এত দিন বিবাহের কথা চলিলেও সুশীল কোন দিনই ইহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে নাই, বাল্যে পরিচিতা ইদানীং কদাচিৎ দৃষ্টা, নিকট আত্মীয়া হিসাবেই সে এই মেয়েটির কথা স্মরণে রাখিয়াছে, এই ঘটনাতেই সর্ব্বপ্রথম সে তাকে মানসী-প্রেয়সীরূপে একান্ত নির্ভরে নিকটবর্ত্তী করিয়া লইয়াছিল, আবার আজ নিজ চিত্তের দুর্ব্বলতার রক্ষাকবচ বলিয়া ইহাকে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিল—মনে হইল, আগামী পরশ্ব বিনতার পরিবর্ত্তে যদি তার বিবাহটা হইয়া যাইত!

বিবাহের ইচ্ছা মনে জাগিতেই অনিবার্য্যরূপে সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণে আসিল নীলিমাকে! নির্জ্জন পথপ্রান্তে অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে পরিত্যক্তা নীলিমার স্তম্ভিত দীনমূর্ত্তি! সুশীল ক্লিষ্ট চিত্তে সুলেখার দিকে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

“কি গো দাদা! দাঁড়িয়ে রইলে যে—বসলে না? না—হার হাইনেসের

হুকুম না পেলে বস্‌তে পারছো না বুঝি? ইওর হাইনেস! দাদা বেচারীকে কৃপা ক'রে বসবার অনুমতিটা দিয়ে দিন।"

"যাঃ, আমি চ'লে যাচ্ছি"—বলিয়া সুলেখা একটু নড়াচড়া করিল, চলিয়া গেল না।

সুশীল অপ্রস্তুতভাবে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়া ফেলিল—"তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

শুনিয়া বিনতার সূক্ষ্ম অধর স-বিরক্ত মৃদু হাস্যে ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, —"বলে ফেল।"

সুশীল অপাঙ্গে সুলেখার দিকে চাহিতে সুলেখা আপত্তি বুঝিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেই বিনতা তার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল— "তোকে যেতে হবে কেন? যা কথা হবে, তুইও উপস্থিত থেকে তা শুনেই যা না, কথা যা' সে ত আর নূতন নয়, আর গোপনেরও তাতে কিছু নেই!—দাদা—তুমি এই বলবে ত' যে, এ বিয়েয় আমার পক্ষে লজ্জা!—আর তোমাদের পক্ষে অপমান?—কেমন এই ত?"

সুশীল ঠিক এ রকম জেরায় পড়িবে ভাবে নাই, তাই কিছু কাল একটু বিপন্নবৎ থাকিয়া নিজেকে কঠিন করিয়া লইল; দৃঢ়স্বরেই কহিল— "অ্যাঁ—হ্যাঁ! তার চাইতে খুব তফাৎ নয়।"

উত্তরটা সুশীলের স্বভাব বহির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বিনতা একটু বিস্ময়ানুভব করিল, তার পর তার একজেদী স্বভাবের বশে উথলিত ক্রোধাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া গম্ভীর পরুষ কণ্ঠে "হোক গে' যাক্— তাতেও আমার মত বদলাবে না!"—বলিয়াই ক্রোধ-সজল তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া গেল। দাদা যে বন্ধুর বিরুদ্ধে এত বড় মন্তব্য প্রকাশ করিবে, এ যেন তার ধারণাতেও ছিল না! আর কেহ না করুক, সুশীল আসিয়া তাকে নিশ্চয় সমর্থন করিবে, এ বিশ্বাস তার অন্তরে দৃঢ় ছিল

বিনতা অমন করিয়া কান্নাভরা চোখে ও বিদ্ধ-বক্ষে পলাইয়া গেলে সে আঘাত সুশীলকে বড় কম বাজে নাই, কিন্তু এ কয় দিনের অভিজ্ঞতা তাকে এমনই কঠিন করিয়া তুলিয়াছে যে, আজ স্নেহের বোনের ঐ সাভিমান বেদনাটুকুর কোন মূল্যই ছিল না। শুভেন্দুর মধ্যে কত দুর্ব্বলতা, কত অন্যায়ের বীজ নিহিত, আজ সে সব কথা মনে করিয়া তার মন কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, মনে হইতেছিল, জোর করিয়াও এ বিবাহ বন্ধ করা উচিত। পিতার প্রতিও অভিমান হইল, এ'কি অসঙ্গত আবদার দেওয়া, তিনি সম্মত না হইলে ত সব চুকিয়া যাইত।

প্রস্থানোদ্যত সুলেখার চুড়ির ঝনৎকার সুশীলকে সসংজ্ঞ করিয়া তুলিল, ব্যগ্রভাবে ডাকিয়া উঠিল, "লেখা!"

সুলেখা দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"ব'সো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

সুলেখা পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিল। সুশীলের সঙ্কোচহীন ব্যবহারে সেও সলজ্জ ভাবটা দমন করিয়া লইল।

দুজনে নীরবে থাকার পর সুলেখাই কথা কহিল, "কি কথা বলবেন—বলচেন না?"

সুশীলের মুখ চিন্তাম্লান, সুলেখাকে যে কথা জানানো তার প্রধান কর্ত্তব্য সেকথা জানাইবার এমন প্রশস্ত অবসরও ঘটিয়া গিয়াছে কিন্তু বলার সময় দেখা গেল, বলিবার পক্ষে তাহাতে যথেষ্ট সঙ্কোচ আছে! নীলিমা-ঘটিত সকল কথা হয় ত সে তার বাগ্দত্তা এই কুমারী মেয়ের কাছে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে পারিবে না, তার স্ত্রী তো সে এখনও হয় নাই!

সুশীল নিজের ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়া বিমূঢ়ভাবে উত্তর দিল, "কি বলা উচিত—ভেবে পাচ্চিনে!" তার পর সহসা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা—লেখা। মনে কর, কেউ যদি আমার খুব নিন্দা করে—

তুমি কি তা' বিশ্বাস করবে ?" এক নিশ্বাসে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আগ্রহভরে স্থলেখার বিস্ময়াপন্ন মুখ নিরীক্ষণ করিল।

স্থলেখা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ঈষৎ হাসিল। সেই মিষ্ট হাসিতে তার চকিত হরিণী-চঞ্চল কালো চোখের সবটুকু বিস্ময়লেখা ধৌত হইয়া একটি অতি কোমল স্নিগ্ধ-জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইল, স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে সে জবাব দিল, "শুধু পেয়ারা-চুরি ছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করিনা,"—বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

স্থশীলও মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে যোড়হাত করিয়া বলিল, "ভুলে গেছলেম—সত্যিই ত—ও বিষয়ে যে আপনি আমার 'আই উইটনেস্।'—ও কুকীর্ত্তিটা আর এ জন্মে চাপা দে'বার সখ নেই! কিন্তু দোহাই আপনার—ধর্ম্মাবতার! একটা পেয়ারা চুরি করেছিলুম বলেই—'যা কিছু হারাবে, 'কেষ্টা বেটাই চোর'—এই সিদ্ধান্ত চিরদিন স্থির ক'রে রাখবেন না যেন!"

দুই জনেই প্রাণ খুলিয়া হাসিল; কিন্তু সেই হাসির শেষে দুই জনেরই মন দুই রকমে ঈষৎ ভার হইয়া আসিল, স্থলেখার হঠাৎ মনে হইল, যার সঙ্গে তার আজও বিবাহ হয় নাই, তার মুখে এ ধরণের কথা তার শুনা সঙ্গত নয়!—আর স্থশীলের স্মরণ-পথে অতর্কিতে ভাসিয়া উঠিল—নীলিমা—তার সঙ্গেও কতদিন এমনই কোন হাসির কথায় এমনই হাসিই যে সে হাসিয়াছে, আজ সে কোথায়!—এই ক্লেশ-ক্লিষ্ট আলোচনাকে সে মনে স্থান দিতে ব্যথা পায়, ভীত হয়, তাই সযত্নে পরিহার করিতে চাহে, অথচ এরাও যে সময়, অসময় নাই ভৌতিক ব্যাপারের মত তার চিত্তকে সর্ব্বদা অনুসরণ করিতে ছাড়ে না এবং সুযোগ পাইলেই উপদ্রবও উপস্থিত করে! ব্যগ্র ব্যস্ত আসিয়া সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল।

"লেখা! লেখা! আমার জীবনে তুমি ধ্রুবতারা হয়ে থেকো, আমার রক্ষা করো—আমায় বল দিও, দেবে ত?"

সুলেখা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল, এ কি কাতর, ক্লিষ্ট স্বর! মমতা-তরল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আপনার কি কোন বিপদ ঘটেচে'? আমায় বলুন, আমার যথাসাধ্য আমি সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হ'ব না।"

সুশীলের আর্ত্তচিত্তে সহানুভূতির এই প্রলেপ সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিল, এই অপার স্নেহসমুদ্রের শীতল জলে ডুবিয়া যাইতে তার সারা মনপ্রাণ আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া হাত বাড়াইল, সুলেখা যদি আজ সম্পূর্ণভাবে তার হইয়া যাইত তার চেয়ে ভাল তার পক্ষে কিছুই হইতে পারিত না! কিন্তু কাছে থাকিয়াও যে সুদূরবর্ত্তিনী, তার কাছে মন খুলিতে চাহিলেও মুখ যে লজ্জার বাধা কিছুতেই কাটাইতে চাহেনা!

নিজেকে অনেকখানি সংযত করিয়া লইয়া ম্লানমুখে কহিল, "বিপদ আমার আছে, সময় এলে তোমায় আমি জানাবো, তখন তোমার রক্ষাবাহু বাড়িয়ে দিও—এখন এইটুকু অনুরোধ, এর মধ্যে যদি কিছু শোন, আমায় না জানিয়ে তুমি বিশ্বাস করো না।"...অনুকূল যে নীরবে থাকিবে না, তার পরে' কোন ভীষণ প্রতিশোধ সে যে লইবেই এ দুশ্চিন্তা মন হইতে একবারও অপসৃত হইতেছিল না এবং মন তার একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলের প্রত্যাশায় শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল!

সুলেখা মাথা হেলাইয়া এই অনুরোধে স্বীকৃতি প্রদান করিল। কিছুক্ষণ চিন্তিতকণ্ঠে নীরবে থাকার পর অকস্মাৎ মৌনভঙ্গ করিয়া সুলেখাই কথা কহিল—"তা হ'লে এখন তো আর কিছু বলবার নেই? আমি যাই? যখন আবশ্যক হবে, আমায় জানাবেন।"

কি [illegible] বলিয়া স্মিতমুখে সে সুশীলের পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

আচ্ছা [illegible] কি করছো—লেখা!"—সুশীল অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া তাড়া-

তাড়ি তার হাত ধরিয়া তুলিল, কিন্তু আর কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। সুলেখার সমস্ত আচরণে তার ব্যথিত বক্ষ যেন নূতন একটা অজানা ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, এখন সেটা প্রবলভাবেই টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল, চোখের কোণে গোমুখীর জলস্রোত যেন ঠেলা দিতে লাগিল। সুলেখার হাত সে এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িয়া দিতে ভুলিয়া গেল, প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিতে করিতে জলভারাক্রান্ত শ্রাবণ-মেঘের মত স্তব্ধ রহিল। ওঃ সুলেখা! তার অন্তরের বিপ্লব যদি দেখিতে পাইতে!

সুলেখা ঈষৎ লজ্জিতা ও রঞ্জিতা হইয়া হাত টানিয়া লইয়া কখন্ চলিয়া গেল, সে জানিতে পারিল না।

# পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিনতার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বদিন অনুকূলকে পত্র লেখা হয়, বিবাহের দিন টেলিগ্রাম যায়, কিন্তু সেখান হইতে কোন উত্তর আসে নাই। বিবাহের বর ইহাতে উল্লসিত। কন্যাকর্ত্তা কিছু উদ্বিগ্ন হইলেও দুঃখিত নন। কেবল সুশীলের মনেই এ ঘটনা কোন দুর্ঘটনারই পূর্ব্বাভাষ-রূপে অশান্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। অত বড় ধূর্ত্ত যে নিরুপদ্রবে এ দাবীটাকেও অগ্রাহ্য করিবে, সে নিজের চোখে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না!

বিনতা বিবাহের পর পিতৃ-গৃহেই রহিল। কোথায় যাইবে? বিনতা ও শুভেন্দুর ইচ্ছা ছিল, ভুবন বাবু তাদের জন্য এখনই স্বতন্ত্র

বাসা করিয়া দেন, কিন্তু ভুবন বাবু এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই, তিনি শুভেন্দুকে নিজের আফিসে কাজ শিখিবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া নিজের কাছেই রাখিলেন, বিনতার মনে প্রথম ধাক্কা লাগিল এইখানেই —তার অবিবাহিত জীবনে ও বিবাহিত জীবনে বিশেষ প্রভেদ ঘটিল না।

ফুলশয্যার রাত্রে শুভেন্দুর স্বামিত্বের প্রথম পরিচয়ে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল! সে যে কাঞ্চন-বোধে কাচ কিনিয়াছে, একটি দিনেই সে বিষয়ে সংশয় জাগিল এবং বিষাদের একটা মেঘ মনের মধ্যে ঘনাইয়া উঠিল।

বিনতার বিবাহ চুকিলেই সুশীলের বিবাহোৎসব আরম্ভ হইবে, সুশীলেরও এ সম্বন্ধে আগ্রহ অপর কাহারও অপেক্ষা কম নয়—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের শুভ তিথি দুই মাসের মধ্যে পাওয়া গেল না, অগত্যাই বিলম্ব ঘটা অনিবার্য্য হইল এবং সপরিবারে বিপ্রদাস বাবু আরও এক সপ্তাহের জন্য ভাবী বৈবাহিক-গৃহের আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া প্রায় প্রতি রাত্রে থিয়েটার, বায়স্কোপ এবং এমনই কোথায় কোথায় ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সত্যবতী সরোজিনীর সহিত কালীঘাট সর্ব্বমঙ্গলা, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি এবং বিনতা, শুভেন্দু, সুশীল, সুলেখা তরুণের দল বায়স্কোপ, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল কোন কিছুকেই তুচ্ছ করিল না। প্রভাতে মোটরে যশোহর সান্ধ্য, নদীতে ষ্টীমার-ভ্রমণে, ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল।

শেষ যে দিন ষ্টীমারে বেড়ান হইল, ফিরিবার সময় শুভেন্দু ও বিনতা ; লইয়া তর্ক করিল এবং ফলে বিনতা রাগ করিয়া উপরের কেবিনে গিয়া শুইয়া রহিল, শুভেন্দু গেল তাকে সাধিতে। অগত্যা সুশীল ও সুলেখা একা রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আকাশে তারকার দীপালোক মর্ত্ত্যবাসীর অবনত চিত্তকে ঊর্দ্ধপানে আকর্ষণ করিতেছিল, ধবলা জাহ্নবী অহোরাত্র ষ্টীমারচক্র-মথিতা হইয়া মলিনা হইয়াছেন, তবু তাঁর মলিনাঙ্গেরই বা কি রূপ! বর্ষাবারি পরিপুষ্ট নীর-ধারা মৃদু কল্লোলে অব্যাহত গতিশালী, নদীবক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে নক্ষত্রচ্ছায়া নর্ত্তিত, বর্দ্ধিত ও বিভক্ত হইয়া জলকে আলোক রঞ্জিত করিয়াছিল। দুই তীরে কোথাও জোনাকীর সহস্র ভাতি, কোথাও কলবাড়ীতে অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুদালোকের লহরীমালা—চারিদিকে আলোকের আর পুলকের স্রোত বহিতেছে।

সুশীল খোলা ডেকের উপর বেঞ্চের পিঠে বুকের ভর দিয়া সাম্‌নে ঝুঁকিয়া নদীতীরের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণচিত্তে ভাবিতেছিল, বিনতা কি ভুলকেই তার জীবনে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইল! ঐ অসহিষ্ণু-প্রকৃতির আদুরে মেয়ে কেমন করিয়া এই বিড়ম্বিত জীবন কাটাইবে?

সুলেখা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—"কি সুন্দর!"

সুশীল নিজের মনকে চিন্তা-জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মুখ ফিরাইতেই ঐ দুটি কথার প্রতিধ্বনি তারও জিহ্বাগ্রে ফোটো ফোটো হইল—কি সুন্দর!—প্রকাশ্যেও সে সহাস্যে প্রশ্ন করিল—"কি সুন্দর?"

সুলেখা কহিল—"কেন, এই গঙ্গার জল—আর ঐ গঙ্গাতীর! সুন্দর নয়?"

সুশীল বিকশিত নেত্রে সুলেখার আনন্দজ্যোতি-বিভাসিত প্রফুল্ল মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি করিয়া স্মিতহাস্যে কহিল—"তোমার চাইতেও সুন্দর লেখা?"

সুলেখার সুগৌর ললাট মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তাভা ধারণ করিল। রূপের প্রশংসা সে চিরদিন শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন এমন করিয়া

হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই, প্রীতি-পূর্ণ নেত্রে অনুযোগের দৃষ্টি হানিয়া কলস্বরে প্রতিবাদ করিল—"যান্!—আমি ত ছাই!"

সুশীল সহাস্যে স্নেহ-মধুরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাপা হাসির সহিত কহিতে -"তুমি ছাই? ওঃ—তাই নাকি! বোধ হয় স্বর্ণভস্ম?"

দু' জনেই প্রাণ খুলিয়া খুব হাসিল, সুশীল বেঞ্চিখানা দেখাইয়া বলিল, "ব'সো।"

সুলেখা সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। তার পর উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন কথা আছে কি?"

সুশীল প্রথমে ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিল, "কথার শেষ আছে কি?" পরক্ষণেই তার হাসিমুখ গম্ভীর হইল। সেদিনকার কথা মনে পড়িয়া গেল, সুলেখা সে কথা ভুলিয়া যায় নাই, নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ সে-দিন না করিলেই বুঝি ভাল ছিল! যখন বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, তখন অহেতুক এই নিষ্পাপহৃদয়া সরলা বালিকার চিত্তে সংশয়ের বীজ বপনের সার্থকতা কি?

সুলেখা সেই কথাই তুলিল, বলিল—"সে দিন যে কথা বলবেন বলেছিলেন, সেই কথা বলবেন কি? বলার বোধ হয় দরকার নেই?"

সুশীল অস্বস্তি বোধ করিল, সেটা চাপা দিয়া মন স্থির করিয়া লইয়া উত্তর দিল—"বোধ হয়, দরকার হবে না, কোন দিন না কোন দিন এ কথা তোমায় আমি জানাবো—তবে এখন থাক।"

এর পর দু'জনেই নীরবে রহিল! আকাশে চাঁদ দেখা দিয়া অজস্র জ্যোৎস্না ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, শুভ্র জলরাশি স্বর্ণরশ্মি-বিমণ্ডিত হইয়া চক্র-মথিত সুবর্ণ পিণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, কলিকাতার উপকণ্ঠে নদীতীর বিদ্যুদালোকখচিত হইয়া জাহ্নবীর মণিময় কণ্ঠহারের মত দ্যুতি াকীর্ণ করিতেছিল।

বিনতা ও শুভেন্দু আসিয়া দাঁড়াইল। শুভেন্দুর মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি-চিহ্ন, বিনতার নেত্রে ক্ষমার স্মিতহাস্য।

বাড়ী ফিরিয়া বিনতা সুলেখাকে ধরিল, "যখন একা ছিলি, দাদা কি সব বলছিল, বল না ভাই ?" সুলেখা না বলিলে—"তা' গরীব ননদকে বলবে কেন ?—বলিয়া তীব্র অভিমান জানাইল।

সুলেখাকে অগত্যাই বলিতে হইল, কাজেই সে দিনের কথা বাদ গেল না—শুনিয়া বিনতার মুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "শুনে তোর কি মনে হলো ? কি আন্দাজ করলি ?"

এ আলোচনা চালাইতে সুলেখার ভাল লাগিতেছিল না, বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া অপরকে এ সব কথা জানাইতে হওয়ায় সে অশান্তি অনুভব করিতেছিল, অপ্রসন্নমুখে জবাব দিল, "কিছুই মনে হয় নি—আর আন্দাজই বা করতে যাব কেন ?"

বিনতা বলিল, "না করলেই ভাল! আমিও এতদিন করতুম না, লোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও এতটুকু দোষ দেখিনি—কিন্তু এই ক'দিনেই দেখছি যে, পুরুষ জাতটাই মন্দ! অবশ্য আমার বাবা ছাড়া—আর জামাইবাবুও।"

সুলেখার মনটা একটু ভার হইয়া উঠিল, সে আর কথা কহিল না; কিন্তু মনে মনে বিনতার প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হইল।—তার যেমন তুলনা করা!—শুভেন্দুতে আর সুশীলে! সুশীলের ছোট বেলার সেই যত কিছু বিপত্তি—সে ওই দুর্দ্দান্ত-শুভেন্দুরই জন্য, সে কথা নাকি সুলেখা জানে না! বিনতা নিজের ভাইকে চিনে না, পর সে; সেও জানে সুশীল কত ভাল!

# ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[illegible] কয়েক দিন সুশীলের মন ভয়-চকিত ও ত্রস্ত হইয়া [illegible] সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে স্পন্দিত বক্ষে মুখের দিকে চাহিয়া দেখিত—মুখে তার হাসি আছে কি না! বিনতার এই অযোগ [illegible] ব্যাপারে হাসি প্রায় তাঁর মুখের সীমানা ছাড়া হইয়া গিয়াছে, [illegible]নেক সময় এই অচেনা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ক্লিষ্ট মুখ সুশীলের অপরাধ-ভীত চিত্তকে সংশয়াকুল করিয়াও তোলে।

অতীত দুর্ঘটনার দুঃস্বপ্ন সুশীলের চিত্ত হইতে ক্রমেই মুছিয়া আসিতে ছিল। অনুকূল তবে প্রতিশোধ লইল না?—গভীর স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া সে তার তত বড় উৎপীড়কের প্রতিও কৃতজ্ঞতা বোধ করিল এবং নিশ্চিন্ত হইয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিল। —অবশ্য নীলিমার কথা সে এত শীঘ্র এতখানি ভুলিতে পারিত না— যদি না এ সময় সুলেখা তাহার এত কাছে থাকিত! সুলেখাকে সে দেখিতে পায়, কদাচিৎ কথাবার্ত্তারও সুযোগ ঘটে, ভুবন বাবু ও বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে প্রতিদিনই তাদের মধ্যে দেখা শুনা হয়, সুশীলের মন প্রাণ একান্ত আকর্ষণে তাই চির-প্রিয়তমাকে আশ্রয় করিতে গেল। ভাবী-সম্বন্ধের স্মৃতিই নয়, প্রতিমা আজ প্রাণময়ী হইয়া উঠিল যখনই নীলিমার স্ফূর্ত্তিহীন নিষ্প্রভ মুখ বুকের মধ্যে ব্যথার আঁচড় কাটিতে থাকে, তার প্রতি ব্যবহারের স্মৃতি অন্তরে গ্লানির কালিমা মাখাইয়া দেয়, তখনই সে প্রাণপণ শক্তিতে সুলেখার সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি স্মরণ এবং সম্ভব হইলে মুহূর্ত্তকালের জন্য তার সান্নিধ্যলাভ চেষ্টা

করে, ব্যথা কম পড়ে ও কালির লেখা মুছিয়া আসে। এমনই করিয়া তার চিত্ত প্রাণ যখন বিগত দুঃস্বপ্ন বিস্মৃতপ্রায় ও সুলেখাময় হইয়া গিয়াছে, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া উঠিল!

সুলেখার জন্য বিপ্রদাস ভুবন বাবুর জহরতওয়ালা এক ভাটিয়া-রত্ন-বণিকের নিকট কতকগুলি অলঙ্কার গড়িতে দিয়াছিলেন, সেগুলি গড়া হইয়াছিল—দুই ভাবী-বৈবাহিকে সুলেখাকে ডাকিয়া পছন্দ করাইতে ছিলেন, এমন সময় ডাক-হরকরা দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। দু[illegible] উপর স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়!—দুইখানি একই হস্তাক্ষরে বাঙ্গালা[illegible] লেখা, বাড়ীর ঠিক নম্বর দেওয়া নাই—তাই অনেকগুলি ছাপ মারা হইয়া ডেড-লেটার অফিস হইতে ঘুরিয়া অনেকদিন পরে আসিয়া পৌছিয়াছে।

হীরার মুকুট একখানা ভুবন বাবু ভাবী বধূর জন্য পছন্দ করি[illegible] ছিলেন, সুলেখার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ ত মা ডিজাইনটা তোমার পছন্দ কি না?" —বলিতে বলিতে সেই খামখানাই ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সুলেখা ও বিপ্রদাস দেখিল, একটুখানি পড়িবার পরই পাতা উল্টাইয়া লেখকের নামটা আগে দেখিয়া লইলেন, তখনই মুখ তাঁর বিশেষ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। পাতা দুয়েক পড়ার পর পত্রপাঠ বন্ধ করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আর্ত্তশ্বাসের সহিত একটা উৎকট যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "মাঃ!"—তখন অশুভাশঙ্কায় সুলেখার বুকেও সজোরে ঐ কাতর শব্দের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল, তার কোমল চিত্ত প্রবল সহানুভূতির সহিত পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্বশুরের অভিমুখে ছুটিয়া গেল—গহনাগুলা নামাইয়া রাখিয়া বাপের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ এ সব নিয়ে যাক্ বাবা! কা'ল ওঁকে আসতে ব'লে দিন।"

ততক্ষণে ভুবন বাবু আবার সেই অকথ্য যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ পত্র

পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন, পড়া যখন শেষ হইয়া গেল, তখনও তিনি সেই সাংঘাতিক চিঠির দিকেই চাহিয়া আছেন, সে পত্র যেন কার অশরীরী মূর্ত্তি! সে যেন কোন অন্তরতমের মৃত্যুসংবাদ! সে যে কি—সে যার এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, শুধু সেই জানে!

সুলেখা কাছে গিয়া স্নিগ্ধ-মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ করচে কি?"

ভুবন বাবু ভয়ার্ত্তচক্ষে তার দিকে ক্ষণকাল আড়ষ্ট ভাবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রায়-আর্ত্তনাদের মত করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"মা গো আমার! আমি বুঝি তোকে হারালুম!" বলিতে বলিতে দুই হাতের মধ্যে তার একটা হাত সজোরে জড়াইয়া ধরিলেন।

"অমন করচেন কেন? আমায় কেন হারাবেন? এই তো আমি!"—সুলেখা ছোটবেলার মতই কাছে ঘেঁষিয়া গেল, তখন ভুবন বাবুও তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, এবং তাঁর চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ব্যাপারটা যে কি ঘটিল, না বুঝিলেও ভয়ানক একটা কিছু ঘটিয়াছে, এটা সহজ বুদ্ধিতে কে' না বুঝিবে? ভুবন বাবুকে কতকটা সময় শান্ত হইতে দিয়া বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন বিপ্রদাস সুলেখাকে বিশেষ চেষ্টায় বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন, তার পর তিনি মুহ্যমান ও বাক্যহীন ভুবন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি আমি পড়তে পারি?"

ভুবন বাবু সচেষ্ট ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যেমন তেমনই অনড়-ভাবে আরাম-চৌকির উপর পড়িয়া রহিলেন।—ওঃ—কি তীব্র—কি অসহনীয় যন্ত্রণার মুহূর্ত্তও মানুষকে যাপন করিতে হয়! কি অসহ্য—কি অসহ্য সে জ্বালা! প্রাণ-প্রিয়ের মৃত মুখ দেখার অপেক্ষাও এ বুঝি অসহ্যতর! তথাপি মানুষের কঠিন প্রাণে সবই সহ্য হয়! এ কি রহস্য

দিয়া গড়িয়াছ এই মানবচিত্ত, হে ভগবান!—যেখানে ভ্রমরপদভার সহে না, সেখানে বজ্রাঘাতও সহিয়া যায়! ভুবন বাবুর জ্বালাভরা চিত্তে এম্‌নিধারা এলোমেলো কতকগুলা কথা ওতপ্রোতভাবে উঠানামা করিতেছিল, সব কথা ভাল করিয়া গুছাইয়া আসিতেছিল না, শুধু নিদারুণ শোকের মত মনের মধ্যে বজ্রবলে বাজিয়া উঠিতেছিল—তাঁর আদর্শ চূর্ণ [illegible] তাঁর সুশীলও আজ এত বড় কলঙ্কে কলঙ্কিত!

বিপ্রদাস সেই দীর্ঘ পত্র যথেষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত পাঠ শে[illegible] সম্পূর্ণ সংযত কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন—"এতে এত ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন রায়? একটা বাজে লোকের বাজে ভয় দেখান, শ'তু[illegible] টাকা পাঠিয়ে দাও আর লিখে দাও যে, এ নিয়ে যদি ফের ঘ্যান্‌-ঘ্যা[illegible] আসে, তা' হলে ছেলেকে জোর ক'রে ধরে রেখে বিয়ে দিচ্ছি[illegible] ওর নামে উল্টো নালিশ দায়ের ক'রে দেবো। কিচ্ছু ভেবো না। ওটা তুমি বরং আমার হাতেই ফেলে দাও, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।"

ভুবন বাবু একান্ত বিস্ময়ে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। বিস্ফারিত বিহ্বল নেত্রে বিপ্রদাসের স্থির চক্ষের উপর চাহিয়া বিহ্বলতর ভাবেই কহিয়া উঠিলেন, "তুমি মিটিয়ে দেবে?—"

বিপ্রদাস কহিলেন, "হ্যাঁ, হে! তাই দোব, বোধ করি তোমার চাইতে আমি ভালই পারবো। এসব তোমার কর্ম্ম নয়!"

বিপ্রদাসের অবিচলিত ভাবে ভুবন বাবুর বিহ্বলতা ঈষৎ প্রশমিত হইবার উপক্রম করিতে গিয়াও ধুমাইত যন্ত্রণানল তীব্র শিখায় মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল—"বিপ্রদাস! লেখা-মা'কে আমার—আমি যে তরু-বিন্নুরও উপর স্নেহ করেছিলুম ভাই!"

বিপ্রদাসের মুখে বা ভাবে কোন বিপর্য্যয়ই দেখা গেল না, তিনি

যথাপূর্ব্ব শান্ত স্বরেই কহিলেন, "চিরদিনই করবে ! তোমার বউ তুমি স্নেহ করবেই। সে এমন বিচিত্র কি ?"

ভুবন বাবুর ব্যথাহত প্রাণ এ আশ্বাসে কি যে কাঁদিয়া উঠিল, সে যেন প্রকাশেরও বহির্ভূত। ক্ষণকাল বিস্ময়ে বিমূঢ় থাকিয়া একটা বুকফাটা হাহাকারের মতই আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন—"সুশীল আমার এ' কি করলে ?—আমার সুশীল !"

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ আহত-গর্ব্ব অপমানাহত শোকার্ত্ত পিতাকে সতর্ক করিলেন—"দেখ, এ নিয়ে তুমি একটা বাড়াবাড়ি কিছু করো না !—বয়েসকালে এমন ঘটনা সকলকারই একটা না একটা ঘ'টে থাকে, আবার বিয়ে-থাওয়া হয়ে সন্তান-টন্তান জন্মালে সব চাপা পড়ে—ও কি আর অত ধরে ? জোয়ান ছেলে ভুলচুক হয়ে গেছে একটু। সবাই ত শুকদেব নয় ?"

ভুবন বাবু কি শুনিতেছেন, নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না ! সুলেখার বাপ—তাঁর ছেলের ভাবী-শ্বশুর, সে এমন অবিচলিতভাবে এত বড় কুৎসিত ঘটনাটাকে অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিল, যে অপরাধের ক্ষমা তিনি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না !

মানুষের মনের মাঝে এত প্রভেদ ! বিস্ময়ের সহিত মুখ দিয়া নির্গত হইল—"তবে কি তুমি এ বিয়ে ভেঙ্গে দেবে না ? তাকে এত বড় দোষে দোষী জেনেও অমন লক্ষ্মী-রূপিণী মেয়ে দিতে পারবে ?

বলিতে বলিতে ক্ষোভে ঘৃণায় স্বর বন্ধ হইয়া আসিল, উঃ, কি লজ্জা ! কি লজ্জা ! কি অপমান রে—সুশীল !—সুশীল !

বিপ্রদাস সাশ্চর্য্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "বিয়ে ভেঙ্গে দেবো ? বিলক্ষণ ! সাত বার ধ'রে যা ঠিক আছে, মুহূর্ত্তেই ভেঙ্গে যাবে ? বলেছি ত—

কম বয়েসের ভুল-ভ্রান্তি বয়েস পাকলেই সামলে যায়, ওর জন্যে অত মন খারাপ করতে আছে? এখন যাতে বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র চুকে যায়, তারই চেষ্টা আমাদের করতে হবে, আর এ দিকে—সে-ও আমি ঠিক ক'রে নিচ্চি—ওর জন্যে তুমি একরত্তিও মাথা খরচ ক'রে দুঃখ পেও না—যত সব জ্বালা-কাতুরের ব্যাপার!"

ভুবন বাবু আর্ত্তশ্বাস মোচন করিলেন, তাঁর বুকে যে অগ্নিময় ঝটিকা বহিতেছিল, যদিও তাহা এ সান্ত্বনায় প্রশমিত হইল না, তবে স্থলেখার জন্য গুরু অপরাধী পুত্রকে অন্ততঃ প্রকাশ্যে ক্ষমা দেখাইতে হইবে, ইহা স্থির করিলেন।

সে দিনের ডায়ারিতে স্খলিত কলমের লেখায় এই কয়টি কথা লিখিত হইল—

"চারুশশি!—কোথায় আছ? লজ্জায় মুখ লুকাও!—আমার আদর্শ, আমার আনন্দ, আমার আশা, আমার আজীবনের সকল সাধনা আজ অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি! আমার মেয়ে স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া কুবিবাহে নিজেকে অবনত করিয়াছে—ছেলে—ওঃ ভগবান! —কেন মরিলাম না!"

# সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গোলমাল এইখানেই মিটিয়া যাইতে পারিত—যদি সেই ডাকে অনুকূলের নিকট হইতে আর একখানা চিঠি শুভেন্দুর নামে [illegible]

পড়িয়া শুভেন্দু ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল!—বড়লো[illegible] হইয়া শুভেন্দু নিজেকে সম্মানিত বোধ না করিয়া পদে পদে অপমানিতই বোধ করিতেছিল, বিশ্বাস, সে গরীব বলিয়া সকলেই তাকে অগ্রাহ্য করে—ভুবন বাবু হইতে বাড়ীর নূতন ঝিটা পর্য্যন্ত! দুই জন লোক একত্রে দাঁড়াইয়া কথা কহিলেই শুভেন্দুর মনে হয়, এরা তারই কথা বলিতেছে। কেহ কোথাও হাসিলে তো রক্ষাই নাই, সে হাসি নিশ্চয়ই তাকে উপহাস করিয়া হাসা।—বিনতাকে সে সর্ব্বদাই এ কথা শুনাইতে ছাড়ে না এবং ফলে সর্ব্বদা দুজনের কলহ চলিতেই থাকে। বিনতা কখনও স্বামীর পক্ষ লইয়া পরিজনবর্গের প্রতি অভিমান করে, কখনও ক্রমাগত একই অভিযোগে উত্যক্ত হইয়া বলে—"বেশ করে—তাচ্ছিল্য যাতে না করতে পারে, সে যোগ্যতা অর্জ্জন কর না কেন, তখন ওরাও করবে না—তাচ্ছিল্যের যোগ্য কি তুমি নও?"

সুশীলের উপরে শুভেন্দুর বিরক্তির অন্ত ছিল না। সুশীল বড়-লোকের ছেলে বলিয়া বরাবরই তাকে সে মনে মনে তীব্র ঈর্ষা করিত, নিজে বড়লোকের জামাই হইয়া সেটা বর্দ্ধিতই হইয়াছে। জামাই আর ছেলে যেই কিছুতেই এক হয় না, তা' সে খাওয়া পরা সকল বিষয়ে একত্বলাভেও নয়, এই অভিজ্ঞতা লাভ হইতে ঈর্ষাটাও তীব্রতর

হইতেছিল। বিশেষতঃ এবার ফিরিয়া পর্য্যন্ত সুশীল কোনমতেই শুভেন্দুর কাছে তিষ্ঠিতে পারিত না, এর অবশ্য কারণ অন্যও—কিন্তু শুভেন্দু একটা কারণই ধরিয়া লইয়াছিল যে, সে গরীব বলিয়া সুশীলেরও তার প্রতি ঘৃণা হইয়াছে। আশ্রিত হিসাবে সুশীল তাকে করুণা করিয়া গিয়াছে মাত্র, ভিতরে ছিল তুচ্ছতার আবরণ। শুভেন্দু মনের মধ্যে গুমরিতে ছিল।

সুযোগ পাইতেই তার অপব্যয় সে করিল না। খোলা চিঠিখানা হাতে সুশীলের কাছে ছুটিল। সুশীলের বসিবার ঘরে সুলেখা ও বিনতা দাঁড়াইয়া উদ্বিগ্নভাবে কথা কহিতেছিল। ভুবন বাবুর শরীর অসুস্থ; তিনি আজ স্নানাহার করেন নাই, সেই কথাই হইতেছিল। সুলেখা বলিল, "একজন ডাক্তার আনা দরকার ছিল।"

বিনতা কহিল, "দাদা বলেছিল, তা'তে বাবার আর তোমার বাবারও কি জানি কেন মত হলো না, দুজনেই বল্লেন, রেষ্ট নিলেই সেরে যাবে।"

এই সময় শুভেন্দু ঘরে ঢুকিয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জিয়া উঠিল —"কই, সে হতভাগাটা কোথায়? কোথায় গেল রাস্কেলটা? তাকে আমি আজ দেখে নিতে চাই! পাজি ড্যাম শুয়ার!"

এই ভীষণ আস্ফালনযুক্ত আক্রমণে নারী দু'জন ভীত হইল। বিনতা কিছু নম্রস্বরেই কহিল, "কা'কে খুঁজচো? মাধবকে? সে ত এ দিকে আসেনি, কি করেছে সে?"

ক্রোধ-পরুষ উচ্চকণ্ঠে ব্যঙ্গ করিয়া শুভেন্দু বলিল—"মাধবকে নিয়ে কি কর্‌বো? খুঁজছি তোমার গুণধর মহামহিম দাদাকে!—পাজি, বজ্জাত, ছোটলোক, জানে না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছে! গরীব ব'লে এত অত্যাচার! উঃ! দেশে কি আইন-আদালত নেই?

রাজা নেই ? আমি ওকে পুলিসে দেবো—জেল খাটাবো—ঘানি টানাবো, পাথর ভাঙ্গাবো—তবে আমার নাম শুভেন্দু চক্রবর্ত্তী !—অল্পে ছাড়বো ওকে ? সাধু পুরুষের ডুবে জল খাওয়া বার ক'রে দিচ্চি এইবার দাঁড়িয়ে দেখ ! আমরা যা' করি দশের সাক্ষাতে জানিয়ে করি, ধর্ম্মের খোলস পরে লুকিয়ে করিনে !"

নারী দু' জন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বিনতা দুই একবার মুখ খুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু সেই বদ্ধ মুষ্টি ঘূর্ণিত চক্ষু ও ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে তার গলা কাঠ হইয়া গেল, কথা, কহিবে কি, আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

শুভেন্দু এ দুইটি অসহায়া নারীকে নিজের নির্ব্বাক শ্রোতারূপে পাওয়ায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বাক্যস্রোত প্রবাহিত করিয়াই চলিল—"ছোট লোকটা যখনই সেখান থেকে আসতে চাইলে না, তখনই আমি এই সন্দেহই করেছিলুম ! গরীবকে দয়া দেখিয়ে নিজের ছেলের চাইতে আপন হয়ে এই কুমতলবেই তাদের বুকে চেপে বসেছিলেন ! অ্যাঁ, এ'কি অমানুষিক অত্যাচার ! আমরা গরীব হ'তে পারি, এঁদের মতন সাতগণ্ডা পাশও করিনি ; কিন্তু এত বড় নৈতিক-অবনতি তা' ব'লে আমাদের ভিতর নেই ! আমরা ওই ভণ্ড-তপস্বীদের চাইতে লাখো গুণে উপরে, তা' এই বড় গলা করে বলতে পারি ! ভণ্ড-তপস্বী এদিকে—"

"ব্যাপার কি শুভদা ! সক্কালবেলা অমন করে চেঁচাচ্চো কেন ? লোক জমে যাচ্চে যে !" বলিতে বলিতে অপ্রসন্নমুখে সুশীল আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।—"বাবার শরীর ভাল নেই, গোলমাল কানে গেলে কষ্ট পাবেন। কি—তোমাদের হয়েছে কি, বিন্ ?"

"হয়েছে কি ? পাজি ! রাস্কেল ! জানো না কি হয়েছে ? দুধ

দিয়ে কালসাপ পুষে রেখে এসেছিলুম। একেবারে বুড়ো বুড়ির বুকে ছোবল মেরে এসেছ!—সয়তান!"

এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপার সুশীলের হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। সে মুহূর্ত্তে তার চোখে পৃথিবীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত বোধ করিল, তার পায়ের নীচের মাটী দুলিয়া উঠিল, তার কানের পাশ দিয়া সাঁ করিয়া গোটাকতক কামানের গোলা চলিয়া গেল!—একটি কথাও না কহিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখ তুলিয়া চাহে নাই তাই দেখিতে পাইল না তার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এক কুপিতা সিংহী-সদৃশী বালিকার অগ্নিবর্ষী জ্বলন্ত দৃষ্টি সেই সঙ্গেই কি তীব্র ক্ষোভের লজ্জায় ধরাশায়ী হইল।—সে সুলেখা!

শুভেন্দু যখন দেখিল, তার এতখানি বীরত্বের কেহ প্রতিবাদ করিল না, তখন সাহসও বাড়িল, সুশীলের উপর ক্ষোভের সকল জ্বালা মিটাইতে চাহিয়া সে তখন পুনশ্চ ক্রুদ্ধ তর্জ্জনে চোখ পাকাইয়া বলিল, "ভদ্রলোক জেনে মা-বোনের কাছে বিশ্বাস ক'রে রেখে এসেছিলুম, তার এই প্রতিফল দিলি? বিশ্বাসঘাতক! নীচ! কুচরিত্র! পশু!"

সুশীল সবেগে শুভেন্দুর দিকে অগ্রসর হইয়া আহত সিংহের ন্যায় উন্নত গ্রীবায় আরক্ত মুখ তুলিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বাধা দিল, "সাবধান শুভেন্দু!"

"কিসের সাবধান সুশীল? আমার বোনের সর্ব্বনাশ ক'রে, আমার মাকে হত্যা ক'রে চোরের মতন লুকিয়ে পালিয়ে এসে নিজের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছ, তারই জন্যে আমায় সাবধান করচো?"

"তোমার মাকে হত্যা ক'রে!"

"হ্যাঁ—আমার মাকে!—সে জানতে চাও এই চিঠি প'ড়ে দেখ—

নীলির সর্ব্বনাশ ক'রে তাকে ফেলে তুমি চোরের মতন পালিয়ে এলে, বাবা কেলেঙ্কারীর ভয়ে একটা বুড়োর সঙ্গে রাতারাতি তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল; কিন্তু বিয়ে হবার আগেই, মায়ের হার্টফেল ক'রে—নীলিও তখনই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়—এসব কার জন্যে?—কে তাকে লুকিয়ে রেখেছে?"

সুশীল সহসা অধোমুখ হইল। স্বর্ণলতা মরিয়াছেন? সেই রাত্রে? নীলিমা পলাইয়াছে? 'কার জন্য'? 'এ সব' কার জন্য? সত্যকথা, এসব তার জন্যই নয় কি?—যদি সে বাড়ীতে কোন দিনই না ঢুকিত!

সুশীলের এই অসহ্য নীরবতা দুই স্থানে অগ্ন্যুৎপাত করিল, তার মধ্যে শুভেন্দু সহসা হিতাহিত জ্ঞানহারা হইয়া প্রমত্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া সুশীলের হাত চাপিয়া ধরিল, চিৎকার শব্দে বাড়ী ফাটাইয়া কহিল—"নীলিকে নিশ্চয়ই তুমি লুকিয়ে ফেলেচ! তাকে বিয়ে করতে পার না, কিন্তু সেবাদাসী করতে ত আপত্তি নেই। বল্ সে কোথায়?—বার করে দে' তাকে, গরীব ব'লে আমাদের পরে এত অত্যাচার! কেন আমরা তা' সইবো!"

সুশীল কথা কহিল না, মুখ তুলিল না, নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মতই স্তব্ধ রহিল। এত বড় অপবাদও তার মাথায় তুলিয়া দিল? মানুষে এতটাও পারে?

"দেখ তবে—সত্যি কথা বার করতে পারি কি না!" বলিয়াই সজোরে সুশীলের নাকের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল।

এই কাণ্ডটা অতর্কিতে ঘটিয়া যাইতেই বিনতা সজোরে চিৎকার করিয়া উঠিল—"বেরিয়ে যাও—আমাদের বাড়ী থেকে! দাদার গায়ে হাত তুল্‌তে সাহস কর? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার?"

প্রচণ্ড আঘাতে সুশীল ঘুরিয়া পড়ার মত হইয়া দেওয়াল ধরিয়া

সামলাইল, তারপর কোঁচার কাপড় নাকে চাপিয়া নিকটবর্ত্তী কোচে মাতালের মতন টলিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে কাপড়ের অংশটা চেলীর কাপড়ের মত রক্তে লাল হইয়া গেল—সমস্ত পৃথিবী চোখের সামনে একটা ভাঁটার মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, তারই মধ্যে সে প্রায়-অন্ধকার চোখে দেখিতে পাইল, সম্মুখে রহিয়াছে সুলেখার রক্তহীন মুখ এবং সেই মুখের মধ্যের চোখ দুইটা যেন দুইটা লাল বাতির মতই অস্বাভাবিক তেজে জ্বলিতেছে!

সুলেখা তার বাপকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, "আজই আমি বাড়ী যাব বাবা! সব গুছিয়ে নিয়েছি গাড়ী ডাকতে ব'লে দাও।"

বিপ্রদাস একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—"আজই কি করতে যাবি? গহনাগুলো আসুক—আর—"

সুলেখা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "না বাবা! আমায় আজ যেতেই হবে, শরীর আমার ভারী খারাপ বোধ হচ্চে, এখানে আর এক দিনও আমার থাকা চলবে না, রোগে পড়ে যাব। পরে হবে, আগে আমায় রেখে এস।"

বিপ্রদাস সকালের ব্যাপারে নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন, আসল ব্যাপারটা সে না বুঝিতে পারে, সে ভাবনা তাঁর বিলক্ষণই ছিল, তার এখান হইতে সরিয়া যাওয়ায় তিনি আর আপত্তি করিলেন না, বলিলেন—"আচ্ছা, রায়কে বলি গিয়ে, সে ফিরলে। তার আবার আজ মাথাটা কেমন ঘুরে গেছে, একটা মস্ত মকদ্দমা হারার খবর পেলে কি না সকালের চিঠিতে—"

সুলেখা একবার তীব্র দৃষ্টিতে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া ত্বরিত-পদে চলিয়া গেল।

সমস্ত বাড়ীটা কেমন যেন একটা অন্তর্বিদ্ধ বেদনা-ভারে ভারাক্রান্ত থমথমে হইয়া রহিল, অথচ কেন যে, তার প্রকৃত কারণটা অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত। বাবু অসুস্থ এবং দাদাবাবুর সহিত জামাইবাবুর ভয়ঙ্কর একটা ঝগড়া হইয়া গিয়াছে—তা' হইবেই ত, নির্ধনের ধন হইলে জগৎকে সে যে তৃণ জ্ঞান করিয়াই থাকে—এ ত' নূতন নয়, ঠিক এই রকমই ঘটনা অমুক অমুক অমুক সংসারে আগেও ঘটিয়াছে! তা' ছোটদি'মণিও না কি ছেড়ে কথা কয় নি, সেও আজ খুব যাচ্ছেতাই করেছে!—বাবুসাহেব গোঁসা ক'রে তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন।—গেছেন—যেতে দাও না, পিত্তি চুঁই চুঁই করলেই আবার ল্যাজটী মুখে করে আপনিই ফিরে আসতে পথ পাবেন না! হতো সেই সময় একটী গর্দ্দানা দেওয়া, দুদিন ন্যাজে-গোবরে হয়ে মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হতো।—ছোটদি'মণির যেমন বেয়াড়া সখ—মাকালফলটাকে ইচ্ছে সাধে বেছে নিলে!

চারিদিকে চাকর-দাসীমহলে চুপি চুপি আলোচনা চলিতেছিল।

সুশীল সারা দুপুর সেই ঘরের সেই কৌচের উপর আড়ষ্ট অভিভূতবৎ পড়িয়া রহিল। একই সময় বিনতা, শুভেন্দু ও সুলেখা তাহাকে একা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শুভেন্দু বিনতা যে কলহ করিতে করিতে গিয়াছিল, তাদের সেই সরব গর্জ্জন তখন সুশীলের কানে বা মনে প্রবেশও করে নাই; কিন্তু আর এক জনের নিঃশব্দ প্রস্থানকালীন সেই একটুখানি নীরব ঘৃণার চাহনি আজ তার ব্যথা-কাতুর শরীর মনে সহস্র মণ ভারের মতই বিরাট হইয়া চাপিয়া আছে। সুলেখা—যে সুলেখা এক দিন অপরিচিত বালক-সুশীলের

প্রতি বাপের দেওয়া শাস্তিকে সহিতে পারে নাই, সেই সুলেখা আজ তার সাত বছরের পরিচিতা বিবাহপণে আবদ্ধা—বুঝি এই মাসাধিক-কালের ঘনিষ্ঠতায় সমধিক স্নেহবন্ধনে সম্বদ্ধা—সেই সুলেখা আজ তাকে এইরূপে অবমানিত ও শোণিতাপ্লুত দেখিয়াও অনায়াসে অবহেলায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল—আর চোখে তার সে কি সঘৃণ দৃষ্টি! —উঃ, সুশীলের বুক এখনও লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না কেন?

সহসা সুশীলের মনে পড়িল বাপের কথা! তবে তিনিও কি এই সংবাদেই শয্যালীন হইয়াছেন? সুশীল ঘরে ঢুকিতে তিনি না পিছন ফিরিয়াছিলেন? তার সঙ্গে একটি কথাও ত তিনি কহেন নাই?

নিশ্চয় নীলিমার পিতা এই হীন প্রতিশোধ লইয়াছেন! স্বর্ণলতাও মরে নাই—নীলিমাও পালায় নাই—মাত্র আরও একটা মিথ্যা চক্রান্ত গড়িয়া তাকে নূতনভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। সুশীলের সর্ব্বশরীরের শোণিতপ্রবাহ যেন অসহায় রুদ্ধরোষে তরল অগ্নিপ্রবাহের মতই তার দেহকে জ্বরতপ্ত করিয়া তুলিল।

ধীরে ধীরে নিবিড় অভিমানে বুক তার ভরিয়া উঠিল। এ সম্বন্ধে তাকে একবার জিজ্ঞাসা করিবারও কি কাহারও কোন প্রয়োজন ছিল না? সুশীলের চরিত্রে কবে কি সন্দেহ-জনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে, এক কথায় তাকে এত বড় একটা অমানুষিক অন্যায়ের পাপী বিনা বিচারেই সাব্যস্ত করা হইল? আর যে' যা করে করুক, তার বাপের এ অবিচার একান্তই অসহ্য! আর সুলেখা—সেও কি এই সেদিনও বলে নাই যে, সে তাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না?

দরজা খোলার একটুখানি শব্দ হইল—সুশীল নিজের চিন্তাভারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও সেটুকু কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিল; অবি

:ষ্টে মাথা ফিরাইয়া দেখিল, স্থলেখা প্রবেশ করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তে কি আনন্দ, কি আশ্বাস, কি আশাই যে তার ভগ্নচিত্তে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়া উঠিল, সে শুধু সেই জানে!—অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল, বসিতে গিয়া রক্তপাত-জনিত দৌর্ব্বল্যে মাথা ঘুরিয়া গেল; তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না, স্থলেখা তাকে অবিশ্বাস করিয়া পরিত্যাগ করে নাই! তার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, আঃ!

স্থলেখা আসিয়া টেবলে স্থশীলের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। তার মুখে সেই স্থমিষ্ট স্থস্মিত হাস্যটুকু আর নাই, এখনও মুখে একটা অক্ষমণীয় ঘৃণার ভাব দেদীপ্যমান। স্থশীল বারেক তার চোখের দিকে চাহিয়া অপরাধীর মত মাথা নত করিল। প্রখর সূর্য্যের দিকে চাহিতে যেরূপ ক্লেশ হয়, তারও আজ এই বিচারদৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইতে তেমনই হইল, এ মিথ্যা কলঙ্কের মধ্যে যতটুকু সত্য, তাহা তাকে পীড়া দিতেছিল।

স্থলেখা নিজেই কথা কহিল। স্থিরস্বরে কহিল, "আমরা বাড়ী যাচ্চি, এক দিন বলেছিলেন, "আমার সম্বন্ধে যদি কিছু শোন আমায় না জানিয়ে বিশ্বাস করো না"—আমিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেম, যদিও আজকের ঘটনার পর এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথাই ওঠে না—তবু নিজের কথা রাখার হিসাবে জেনে যেতে এসেছি, আর জানিয়ে যেতে এসেছি, যা' জেনেছি এবং নিজেও যা অপ্রতিবাদে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, তার পর আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়।"

কার এ কণ্ঠ? কার এ ভাষা? এই নির্ম্মম কথাগুলা কে' এমন অনায়াস-সহজে উচ্চারণ করিতে পারিল? এই কি সেই স্থলেখা? সেই বনচারিণী কপালকুণ্ডলা? সেই শরীরিণী দয়ামূর্ত্তি? সে দিনের সেই ষ্টীমার-ভ্রমণের আনন্দময়ী সঙ্গিনী—সেই জ্যোৎস্নাজড়িতা স্নেহময়ী

প্রেমময়ী নারী? আজ কোন পাষাণী এত বড় নিষ্ঠুর বাক্য এমন করিয়া মুখের উপর বলিয়া বসিল? বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সে শুধু চাহিয়া রহিল।

তার চোখের ভাষাহীন সেই দৃষ্টি সুলেখাকে পাগল করিয়া দিল। এর চেয়ে অপরাধ স্বীকার করা কিসে হয়? ওরে নির্ব্বোধ—লোভী, সুলেখা! এখনও তোর মোহ ঘুচে নাই? কত বড় রক্ষাই যে তুমি পাইয়াছ, এখনও সে কথা না ভাবিয়া অতীতের পানে—সেই স্বপ্নের অতীতের পানে লুব্ধ চোখে চাহিয়া আছ—তোমার মরণ নাই?

তখনও সুশীল তেমনই অনড়, তেমনই স্তব্ধ, নতনেত্র। বারেক রোষতীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিরাগ শুষ্ককণ্ঠে সুলেখা বলিল, "তা' হ'লে এই শেষ!—আমাদের মধ্যে এ জন্মে বোধ হয় আর দেখাও হবে না, তাই যাবার সময় একটা শেষ কথা ব'লে যাই—এর পর যে যতই চেষ্টা করুক, বিয়ে আমি করবো না—তাই বলি—এখন উচিত, সেই যে মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রে আসা হয়েছে, তাকেই ফিরে গিয়ে বিয়ে করা, এ'ত ন্যায় ধর্ম্মের খাতিরেও করা উচিত—আমার আর কিছুই বলবার নেই।"

সুশীল ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিল, মনে হইল, যেন সত্যই সে নীলিমার কাছে ঘোর অপরাধে অপরাধী। আর তার সেই অপরাধের বিচারক সম্মুখবর্ত্তিনী ঐ ধর্ম্মাধিকারিণী—নারী। এই কঠোর দণ্ডাদেশ সে স্তব্ধ থাকিয়া শুনিল, একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও জিহ্বা তার উচ্চারণ করিতে পারিল না, এ আদেশ যেন অলঙ্ঘ্য, এর পরিবর্ত্তন নাই।

সুলেখা চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইয়া পুনশ্চ ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল সুশীল তখনও তেমনই বসিয়া আছে। দেখিল, তার নাসিকা স্ফীত, চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি যেন পৃথিবীর কোন শেষপ্রান্তে ভাসিয়া গিয়াছে। —করুণার প্রচণ্ড প্লাবন সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করিল। মন প্রাণ

তার লাঞ্ছিতের, লজ্জিতের জন্য উৰ্দ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি! নীলিমা এরই জন্য কলঙ্ক-লাঞ্ছিতা, আশ্রয়-বিচ্যুতা, সমাজত্যক্তা—এখনও হয়ত প্রতীকার আছে, কিন্তু বিলম্ব হইলে একটি জীবন হয়ত চিরদিনের মত দুরবস্থার অতলে তলাইয়া যাইবে! নিজেকে সে জন্মের মত বিসৰ্জ্জন দিয়া দিবে, অত্যাচারিতা নীলিমাকে তার অবশ্য প্রাপ্য অধিকার ফিরাইয়া দিতে যদি তার বুকের পাঁজরা খসাইতে হয়, তা'ও হোক—নারী সে, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অপরাধিকে নিশ্চয়ই বাধ্য করিবে। পণ, নারী হইয়া নারী মর্য্যাদাকে পদদলিত হইতে দিবে না।

মুহূৰ্ত্ত মধ্যে করুণাধারা মরুবালুমধ্যে ক্ষীণ জলধারার মতই বিলুপ্ত হইয়া গেল—ক্ষমা!—কাহাকে ক্ষমা করিবে? বিশ্বাসহন্তা চরিত্রহীনকে? সুশীল তার সঙ্গেই বা কি ব্যবহার করিয়াছে? অতবড় অন্যায় করিয়া আসিয়া অনায়াসে তাকে লইয়া খেলা করিতেও দ্বিধা করে নাই! —সুলেখা ফিরিল।

"লেখা! লেখা!—শুনে যাও—আমায় অবিচারে এত বড় দণ্ড দিয়ে চিরদিনের মতন চ'লে যেও না—আগে ভাল ক'রে শোন, বিচার ক'রে দেখ!"

সুশীলের আৰ্ত্তস্বর ঘরের মধ্যে তীব্র ক্রন্দনের সুরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।—আর সুলেখার বুকের মধ্যেই কি হইল না? কিন্তু তথাপি সুলেখা দাঁড়াইল না, আর একবার সে ফিরিয়াও চাহিল না, কঠিন আদেশের সুরে শুধু বলিয়া গেল—"বিচার আমি করেছি! নীলিমাকে বিয়ে করতেই হবে। এ না হ'লে ঈশ্বরের কাছেও ক্ষমা পাবে মনে করো না।"

সুলেখা চলিয়া গেল, হতবুদ্ধি সুশীল মুহ্যমানবৎ পড়িয়া রহিল।

# অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার জীবনের সকল আশার অপমৃত্যু ঘটার সঙ্গে তার জন্য যে চিতাসজ্জা হইতেছিল, অকস্মাৎ স্বর্ণলতা নিজের জীবনকে সেই আগুনে আহুতি প্রদান করিলে অনুকূলের গৃহে একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটিয়া উঠিল। এই মৃত্যুসংবাদটা অতর্কিতে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় বিবাহ আর ঘটিয়া উঠিল না। পাড়ার লোকের মধ্যে জানাজানি হইতে কিছুই বাকি ছিল না, দেখিতে দেখিতে ঘরে ঘরে তীব্র আলোচনা আরম্ভ হইল এবং পাড়ার এক রসিকা ঠানদিদি এতদুপলক্ষে ছড়া কাটিলেন—

"দুই পতিতেও হলো নাক পতি-সম্মেলন
পোড়া বিধি এই দিলে মোর কপালে লিখন!" ইত্যাদি

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মড়া উঠিল না। জন কয়েক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ কষ্টে যোগাড় করিয়া অনুকূল স্বর্ণলতার কাঁটা মাত্র সার শবদেহটাকে বাঁশে বাঁধিয়া তীরস্থ করিতে পাঠাইয়া দিল, নিজে সঙ্গে গেল না, গেলে শূন্য গৃহ আগলাইবে কে'? নীলিমাকে কেহ না ডাকিতেই সে আপনি উঠিয়া শব-বাহীদের সঙ্গ লইল।

গভীর রাত্রে চিতা নির্ব্বাপিত হইল! শবদাহকারীরা অর্দ্ধ-দগ্ধাবস্থায় শব ফেলিয়া বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলে, নীলিমা তাহাদিগকে বাকি কার্য্যটুকু সমাধার জন্য বিস্তর মিনতি করিল; কিন্তু সেই সব নীচ চরিত্রের হৃদয়হীন লোকেরা তার অনুনয়ে কর্ণপাত করিল না, কেহ ভদ্রভাবে, কেহ অভদ্রভাবে হাসিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, অসমাপ্ত-শবদাহ ফেলিয়া প্রস্থান করিল। কেবল একজন মাত্র নীলিমার সম্পূর্ণ অচেনা লোক সঙ্গীদের

আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চিতাগ্নিমধ্যে কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ পূর্ব্বক দাহকার্য্য সমাধা করিতে মনোযোগী হইল, সেই গেল না।

স্বর্ণলতার চিরজ্বালাময় জীবনের সকল চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া তাঁর চিতাভস্ম নিঃশেষে ধুইয়া নীলিমা শুষ্ক নেত্রে নদীগর্ভে নামিয়া স্নান করিল। ডুব দিবার সময় মনে হইল, এই শীতল জলতল হইতে মাথাটা না তুলিলেই ত চুকিয়া যায়?—পৃথিবীর তপ্তবক্ষ হইতে এই নদীগর্ভ কত শান্ত, কতই শীতল! কি প্রয়োজন তার এখান হইতে উঠিবার? প্রবল লোভ সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

একবার সে অনেকক্ষণ জলতলে ডুবিয়া রহিল; কিন্তু অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইতেছিল, কেবলই হাঁপাইয়া ভাসিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়—না, ডুবিয়া মরা বড় কষ্ট! আরও একটা কথা—নারী সে, মরিলেও সে দেহ নারীদেহ, কোথায় কি ভাবে ভাসিয়া গিয়া সে দেহটা কোথাকার কূলে লাগিবে; জল-পুলিসে সেটা না জানি কি অবস্থায় টানিয়া তুলিবে, মুর্দ্দাফরাসে হাসপাতালে লইয়া গিয়া সেটাকে চিরিবে ফাঁড়িবে, তার পর কোথায় ফেলিয়া দিবে না কি করিবে, কে' জানে! তার উদ্দেশ্যে কতই হয়ত তীব্র ব্যঙ্গোক্তি বর্ষিত হইবে!—তার কেরোসিনে পুড়িয়া মরাই ভাল, এমন আগুন ধরাইবে যাহাতে সেই আগুনেই ভস্ম হয়!

নীলিমা যেন একটা পথ পাইয়া জল হইতে উঠিয়া আসিল। নদীতীরে কেহ কোথাও নাই, রাত্রির সঙ্গী ব্রাহ্মণটির স্নান শেষ হইয়াছিল, বলা যায় না, কি উদ্দেশ্যে সে তখন কোথায় গিয়াছে! নীলিমা কিন্তু ইহাতে বড় স্বস্তি বোধ করিল, জনসঙ্গ তার পক্ষে এখন যেন বিষ খাওয়ার অপেক্ষাও তিক্ততর ঠেকিতেছিল।

নদীতীর ধরিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল—যে দিক হইতে তাহারা আসিয়াছিল, তার বিপরীত পথে চলিল—বাড়ী ফিরিবার কথা মনে

পড়িতেই আতঙ্কে ও ঘৃণায় তার সমস্ত দেহ মন কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল! সেই বাড়ীতে সে ফিরিবে? কেন?—কিসের লোভে? লোকে নিন্দা করিবে? হয়ত কত দুর্ণামও রটিবে? তাতেই বা তার ক্ষতি কি? সে ত মরণপথেরই যাত্রী। সে মরিতে বসিয়াছে, তার আবার লোকলজ্জা কিসের?

নীলিমা লক্ষ্যহীন হইয়াও শুধু নদীতীর লক্ষ্য করিয়া বহুপথ অতিক্রম করিল। প্রথম দিকে একখানা ক্ষুদ্র বস্তি ভিন্ন কোথাও অপর কোন লোকালয়ের চিহ্ন সে দেখিতে পাইল না। নদীর গায়ে চর পড়িয়া গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে বালিরাশি ধূধূ করিতেছে; অনেক দূরে প্রায় নদীমধ্যভাগে ক্ষীণ জলরেখা সূর্য্য-করোজ্জ্বল শুক্তি-মাল্যের মতই শুভ্র দেখাইতেছিল। শ্রান্ত পক্ষী বহু দূর হইতে উড়িয়া আসিয়া চঞ্চু ডুবাইয়া জল পান করিল; চরণশীল গাভী মহিষ দল বাঁধিয়া চড়া ভাঙ্গিয়া জলে অবগাহন করিতে গেল; বস্তির নিকটে কৃষকপল্লীর পল্লীবধূ বালিকা ও গৃহিণীগণ ঘট-কক্ষে স্নানার্থী হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল, নীলিমা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। ক্রমে প্রখর রৌদ্রতেজে প্রবল পশ্চিমে বাতাসে তপ্ত বালি যেন ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবাণের মতই নীলিমার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তৃণশূন্য বালুকাময় মৃত্তিকা তার নগ্নপদ ঝলসিত করিয়া দিল, তখন ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত ক্লান্ত এবং রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া সে একটা সুবৃহৎ তুঁত গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। মনে হইল, অন্ততঃ বিশ ক্রোশ পথ সে আজ হাঁটিয়াছে, আর এক পা হাঁটিতে গেলে সে পড়িয়া যাইবে। নীলিমার বুক ফাটিয়া এক ফোঁটা হাসি শুক্‌নো ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া উঠিল। যে মরণকে সে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এইরূপেই যদি তার সাক্ষাৎ মিলে ক্ষতি কি?—কিন্তু যুক্তির সহিত মন সব সময়ে আপোষ করে না, ছায়া-সুশীতল বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল।

কি সুমিষ্ট ঐ বাতাসটুকু! কি শীতল এই তরু ছায়া! গাছের উপর গলায় চিত্রকরা কয়েকটা চন্দনা পাখী কিচির-মিচির শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, নীলিমার মনে হইল—কি সুন্দর তাদের রূপ! আহা, একটিকে ধরিতে পারিলে—আবার সেই দুঃখ দীর্ণ বক্ষের রক্তঝরা তীব্র ব্যঙ্গ হাস্য!—মরণের উপযুক্ত সঙ্গী বটে!

সহসা মৃত্যু-চিন্তাকে অন্তরাল করিয়া বাঁচিয়া থাকার সাধ দেখা দিল। সহসা মনে হইল, মরণেরই বা কি প্রয়োজন? জগতে এত লোক সকলেরই যদি বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার থাকে, শুধু তারই কি নাই? কেন? কি অপরাধে?

অপরাধ খুঁজিতে গিয়া কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না। মস্ত বড় অপরাধ সে করিয়াছে, তাহা কৃপণের ঘরে, হিন্দুর ঘরে, গরীবের ঘরে কন্যা হইয়া জন্মান। ইহাকে যদি অপরাধ ধরা যায়, তবে এই-ই যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু এ পাপের জন্য সে ত দায়ী নহে, যে পিতৃ-কর্ত্তব্য পরাঙ্‌মুখ নির্দ্দয় পিতা তাকে এ পৃথিবীতে আনিয়াছে, এ জন্য একমাত্র দায়ী সে।—যে পিতা সন্তানকে পোষা জানোয়ারের মত খোঁয়াড়ে বাঁধিয়া রাখিয়া চারিটি আহার্য্য—তাও সহস্রবার খোঁটা দিয়া—প্রদানেই পিতৃ-কর্ত্তব্য সমাধা করে, সন্তানের কোন শিক্ষা, কোন উন্নতির কোন চিন্তা পর্য্যন্ত করে না, যার নিজের জীবনই পশু জীবন হইতে সামান্য মাত্র বিভিন্ন—তাকে সন্তান-জননের অধিকার দেওয়া সামাজিক দুর্ব্বলতা—সমাজের পক্ষে মহা পাপ—সে প্রায়শ্চিত্ত সেই সন্তানকেই শুধু কেন করিতে হইবে? এ বিড়ম্বনার কি কোন প্রতীকার নাই? কেন সেই অপরের কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মরিতে হইবে তাহাকে? নির্দ্দোষ—নিরপরাধ—সবেমাত্র এই আঠার বৎসর বয়স তার—এই কি মরিবার সময়? না, সে মরিবে না—মরিতে পারিবে না।

নীলিমার মরণ-প্রত্যাশী নিশ্চিন্ত হৃদয় এইবার সভয় সন্দেহে সঘনে দুলিয়া উঠিল। না হয় সে নাই মরিল—কিন্তু বাঁচিতে হইলে ত একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন আছে—যদি বাঁচিতেই হয়, তাহা হইলে সে কোথায় দাঁড়াইয়া বাঁচিবে? এমন করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া মরিলে ত মরণের বাড়া দুর্দ্দশা ঘটাও অসম্ভব নয়! তার মতন বয়সে ও রূপে যে অনেক বিপক্ষ পক্ষের হস্ত লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা জগতে বর্ত্তমান আছে, সে কথা কেই বা না জানে! তবে যাইবে সে কোথা? পিতৃগৃহে?—পিতার কথা স্মরণে আসিতেই সভয়ে সেই রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জন প্রান্তরের চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—না কেহ কোথাও নাই! প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-সূর্য্য চারিদিকে পীতাভ অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত করিয়া পৃথিবীকে দগ্ধীভূত করিতেছিলেন, কার সাধ্য আশ্রয়ের বাহির হয়!

নীলিমার মনে হইল, এখন যদি তার বাপের সঙ্গে তার চোখাচোখি হইত তো নিশ্চয়ই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইত, বাপের বাড়ী অপেক্ষা যমের বাড়ী যাওয়া অনেক সহজ এবং নিঃসন্দেহ শান্তিময়ও—মরিবার জন্যই বরং সেখানে যাওয়া চলে, বাঁচিবার জন্য চলে না।

সারাদিন সেই গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া ভাবিল, ক্রমে তার চিন্তাশক্তিও বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল, অবসাদগ্রস্ত শোকাকুল ও ক্ষুৎপিপাসাতুর শরীর মন কেমন যেন একটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া চেতনা অপহরণ করিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সংজ্ঞাহীন থাকিয়া সন্ধ্যার বাতাসে রৌদ্র-তপ্ত লতার মতই কাহারও শুশ্রূষা ব্যতিরেকেও আপনা আপনি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

তখন নির্জ্জন নদীতীরে সন্ধ্যালোক স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। নদীর তীর, তীর-বালুকা, জলধারা, পরপার সব একই অন্ধকাররাশির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া একমাত্র অন্ধকারই অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। মধ্যে

মধ্যে প্রবল ঝিল্লীর এবং শৃগালের সমুচ্চ চীৎকারধ্বনি না থাকিলে সমস্ত জগতের জীবিত-চিহ্ন এই অবিমিশ্র অন্ধকারে বুঝি বা খুঁজিয়া পাওয়াই ভার হইত! নীলিমার পায়ের তলা দিয়া কি যেন একটা খস্-খস্ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দে ও স্পর্শে তার সদ্য চেতনা-প্রাপ্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। চমকিয়া সে উঠিয়া বসিল, উঠিতে গিয়া শরীরের দারুণ দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া বিস্মিত এবং কিছু ভীতও হইল, এই শরীরকে টানিয়া তুলিয়া বহিয়া লইয়া আর কি কখন সে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে? এক ফোঁটা জল না পাইলে আর ত বাঁচিবার কোন উপায়ই নাই। মাথার উপর গাছের ডালে কয়েকটা বাদুড় ঝুলিতেছিল, তাহারা ঝপ্-ঝপ্ করিয়া ডানা ঝাড়া দিয়া উড়িয়া গেল, একটা কালপেঁচা শ্রুতিকঠোর তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল, একটা শৃগাল কাছ দিয়া যাইতে যাইতে বারেক দাঁড়াইয়া নীলিমাকে আঘ্রাণ করিয়া গেল—জীবিত প্রাণী জানিয়া চকিতে ছুটিয়া পলাইল। মহাভয়ে নীলিমা তখন স্খলিত-পদে উঠিয়া অতিকষ্টে এক পা এক পা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মরণ যখন দূরে থাকে, আলেয়ার আলোর মতই তখন তাহা অতি উজ্জ্বল মনে হয়, হৃদয়কে সে আকৃষ্ট করে; কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আসিতে হইলে বীরের প্রাণ চাই!

কখনও বসিয়া, কখনও চলিয়া অনেকখানি পথ অতিক্রম করিবার পরও যখন কোন লোকালয় দেখা গেল না, তখন হতাশা ও অবসন্নতা মিলিয়া নীলিমার হাত-পা অসাড় করিয়া দিল, সে তখন জীবনের আশামাত্র বিসর্জ্জন দিয়া সেইখানেই ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল; এবং তৎক্ষণাৎ অবসাদপূর্ণ গভীর নিদ্রা আসিয়া তখনকার মতন তার সকল যন্ত্রণারই অবসান করিল।

ঘুম ভাঙ্গিল পরদিন সূর্য্যের আলো চোখে পড়িয়া। সুপ্তিভঙ্গে অনেকখানি সুস্থদেহে সে অভ্যাস-মত উঠিয়া বসিতেই তার বিস্মিত দৃষ্টিতলে এক অপরূপ দৃশ্য প্রতিভাত হইল।

যেখানে সে শুইয়া ছিল, তারই পাশ দিয়া নদীর গতি বক্র হইয়া গিয়াছে, নদীজল সেখানে কিছু গভীর এবং তীরদেশ সজল শ্যামল তৃণশষ্পাস্তৃত। ধূধূ মরুবৎ বালুকারাশি পরপারে সাদা চাদর বিছানোর মতই স্থির পড়িয়া আছে। অদূরে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ, আপাদ-মস্তক তার রক্ত পুষ্পে ভরিয়া আছে; নীল-আকাশের নীচে শ্যাম-পত্রাবলীমধ্যে সেই লোহিত রাগ বৈচিত্র্যময় ও সুন্দরতম।

নীলিমা নিজের দেহপ্রতি নেত্রপাত করিল, অঙ্গে আজও সেই বিবাহরাত্রে পরিধৃত রক্ত-বস্ত্র রহিয়া গিয়াছিল, সে রাঙ্গা রং আজ অযত্নে অবহেলায় মলিন হইয়াছে, যেন কত দিনেরই পুরাতন! তার মনে হইল, সে রাত্রিটা যেন কত—কত কালই পূর্ব্বে অতীত হইয়া গিয়াছে! সেই দাহময় অথচ মধুমাখা স্মৃতি—এ জীবনে যে স্মৃতির আগুন কখন বুক হইতে নিবিবার নয়; যে স্মৃতির সুধা এই মৃত্যু-বাণাহত বজ্রাগ্নিদগ্ধ হৃদয়কে অমৃত-নিষেকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে, সেই ভীষণ-মধুর রাত্রি সে যেন কোন্ এক যুগ-যুগান্তরের অবিস্মৃত স্মৃতিমাত্র! নীলিমা যেন তার পর হইতে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়াই এই গৃহহীন, লক্ষ্যহীন, আশাহীন জীবন-তরণী মহাকালস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে অহোরাত্র ভাসিয়া চলিয়াছে; ইহার শেষ কোন দিনই যেন সে খুঁজিয়া পায় নাই—এবং বুঝি বা পাইবেও না!

সুশীলের কথা এ দুই দিনে নীলিমার বারে বারেই মনে পড়িয়াছে, কিন্তু এযাবৎ সেই বিষয়টাকে মন হইতে সরাইয়া দিবারই চেষ্টা করিয়াছে—মন যখন বড়ই পীড়িত ও একান্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিল, সে

তাকে কখন ধমক দিয়া কখনও মিনতি করিয়া নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছিল। সে তোমার কে'?—তুমি গরীবের মেয়ে, সে ধনীর তুলাল?—তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? বামন হইয়া কে' কবে চাঁদ ধরিতে পারিয়াছে?—এখনও সেই যুক্তি প্রয়োগে তার সেই একান্ত ক্লেশজনক—সেই অত্যন্ত সুখকর চিন্তা হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সূর্য্যতাপ প্রখর হইবার পূর্ব্বেই আজ তাকে একটা আশ্রয়ের সন্ধান করিতেই হইবে। জিজীবিষা তার মনে আবার প্রবল হইল। নদীতে নামিয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া সে অঞ্জলিপূর্ণ জল পান করিল, কিন্তু তিন দিনের উপবাসের পর সে জল পেটে থাকিল না—বমন হইয়া গেল। তখন আবার সেই দুর্ব্বল চরণ কোনমতে কূলে উঠাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কি অসীম এ যাত্রাপথ! এর কি সমাপ্তি নাই? এ'কি তার মহাযাত্রা? নীলিমা যে আর পারে না! তার পা যে টলিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষুর সম্মুখে খর রৌদ্র-জাল যেন ধোঁয়ার মত ধূসর, মেঘের মত নিকষ কালো হইয়া আসিতে লাগিল—তথাপি চলার বিরাম নাই!

দ্বিপ্রহরের অগ্নিতপ্ত ধূলাবালি উড়াইয়া প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল। যেন অজস্র অগ্নিবাণে সর্ব্বাঙ্গ তার ভেদ করিয়া দিতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে পতনোন্মুখী হইয়াও শুষ্ককণ্ঠে দগ্ধপদে ঘর্ম্মাক্ত দেহ টানিয়া লইয়া চলিল, তখনও গতি বন্ধ করিল না। কিন্তু আর চলিবার শক্তি নাই—আর বুঝি বাঁচা হইল না—এইবার বুঝি সব শেষ!—সুশীল!—সুশীল!

অদূরে ঐ না একটা বাড়ী? ধূলিমেঘজাল ভেদ করিয়াও তার উজ্জ্বল লাল রং সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। না না, চলিতেই

হইবে—বাঁচিতেই হইবে—বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত—হয় ত কখনও না কখনও দেখা হইলেও হইতে পারে—একবার—একবার—এক নিমেষের দেখা—আর একবার—জন্মের শোধ একটিবার—না, না, আর দেখা নয়—না, না—আর বাঁচা নয়—না, না, আর চলা নয়—আর পা উঠিতেছে না—দেহ বহিতেছে না—আর বাঁচিবার উপায় নাই—কোন উপায় নাই—ওঃ, সুশীল!—সুশীল!—সুশীল!

নীলিমার সংজ্ঞাহারা অচেতন দেহ সেই অগ্নিতপ্ত মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, তার উপর দিয়া দুরন্ত গ্রীষ্মের আগুনে-ঝড় উদ্দামভাবে তপ্ত বালুকারাশি উড়াইয়া হাঃ হাঃ শব্দে অট্টহাস্য করিতে লাগিল, তার মাথার উপর কেবলমাত্র পরিশ্রান্ত চিলের কর্কশ আর্ত্তস্বর কদাচিৎ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, এভিন্ন আর কেহ তার এই ভয়াবহ অবস্থার সাক্ষীমাত্র থাকিল না।

# ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এর পর নীলিমা যখন চোখ চাহিল, তার বিস্মিত দৃষ্টি স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইল না। চারিদিককেই সম্পূর্ণ অজানা ঠেকিল, সে কোথায় ছিল? কোথায় আসিয়াছে? কেমন করিয়া আসিল? এ সকলের কোন ধারণাই তার মনে ছিল না, মনে করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু সব শূন্য! কিছুই মনে পড়িল না, অগত্যা চেষ্টা ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

একজন হিন্দুস্থানী 'দাই' তার পরিচর্য্যা করিতেছিল, নীলিমা তাকে

কিছু জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল, কিন্তু কি ভয়ানক তার দুর্ব্বলতা, বাক্যস্ফুরণের সামর্থ্যটুকুও নাই—ঠোঁট নড়িল কিনা, বুঝা গেল না, শব্দ যে বাহির হয় নাই, তাহা সে নিজেও বুঝিয়াছিল।

আরও কয়েকটা দিন গেল। ক্রমে তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া আসিতে লাগিল, ভীষণ দুর্ব্বলতা অতি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল, এখন চোখ চাহিতে তত ক্লেশ হয় না, কানেও কিছু কিছু শুনিতে পায়, শুশ্রূষা-কারিণীর সহিত দু একটা কথাও বলে, কিন্তু দুই একটা শব্দের অধিক একসঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারে না—ক্রমেই দেখিল, প্রাতে ও অপরাহ্নে একটি বর্ষীয়সী মহিলার সহিত এক জন তরুণ পুরুষ তার কক্ষে প্রত্যহ আগমন করেন, তাকে পরীক্ষা করেন, শুশ্রূষাকারিণীকে প্রশ্ন ও উপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থিত হন। মহিলাটি প্রায়ই একটি সুগন্ধি পুষ্প আনিয়া নীলিমার রোগ-শয্যার উপর স্থাপন করেন, বিদায়কালে তার মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া কোন দিন একটু স্নেহ জানাইয়া যান। তাঁরা গেলেও নীলিমা বহুক্ষণ তাঁদের প্রস্থান পথের অভিমুখে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকে। এই শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি নারীর মধ্যে যেন তার দুরন্ত স্নেহ-ক্ষুধা অনেকখানি প্রশমিত হয়। তার জ্বালাময় শুষ্ক নেত্রে অশ্রুর ঈষৎ আভাস অকস্মাৎ দেখা দেয়, তার প্রায়-রুদ্ধ চিত্তে সুদূর অতীতের স্মৃতির মতই ক্ষীণভাবে জাগিয়া উঠে মা'র মুখ।

ক্রমে নীলিমা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। এখন তার সব কথাই মনে পড়িতেছিল, মনে পড়িল, সে মরণের খুব নিকটবর্ত্তীই হইয়াছিল, কিন্তু আবার সেখান হইতে ফিরাইয়া তাকে বাঁচাইল কে'?

যেদিন ঘরের মধ্যে দুই এক পা করিয়া হাঁটিতে পারিল, সেই দিন যথা নিয়মে সেই পুরুষ ও বর্ষীয়সী নারী তাহাকে দেখিতে আসিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইঁহারা য়ুরোপীয়, সম্বন্ধে ভাইবোন—জাতিতে

আইরিশ—মহিলাটি এই স্থানের ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধানা কর্ত্রী—অপর জন সুদূর সিন্ধপ্রদেশে পাদরীর কার্য্যে নিযুক্ত, ভগ্নীর অসুস্থতার সংবাদে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

মিস্ ওকবর্ণ অতি মধুর স্বরে ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলিলেন, "বাছা! তুমি যে জীবন পাইলে, এ শুধু দয়াময় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলিয়া জানিও। এরূপ অসম্ভব ঘটনা যীশাস-ক্রাইষ্টের সময়েই শুধু তাঁরই দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল।"

মিষ্টার ওকবর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে মন্তব্য করিলেন—"অসম্ভব সত্য!"

নীলিমা কিছুই না বুঝিয়া হতবুদ্ধিভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কে' বাঁচালে?"

মিস্ ওকবর্ণ উৰ্দ্ধে চাহিয়া মুদিতনেত্রে উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই—ঈশ্বর।"

মিষ্টার ওকবর্ণ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন, "ইহাতে কোন সংশয় নাই!"

নীলিমা যখন ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনিল, তখন ইঁহাদের বিশ্বাসের সহিত তাকেও একমত হইতে হইল—না হইয়া উপায় রহিল না!—সেই জনমানব পরিশূন্য মরুবৎ স্থানে তপ্ত বালুকা ঝড়ের মধ্যে শোকাহতা, লাঞ্ছিতা, ক্ষুৎপিপাসাতুরা, অনাথা বালিকার আসন্ন মরণের ঠিক সন্ধিস্থলে কে' আর এই বিদেশী পুরুষকে অকস্মাৎ পাঠাইয়া তাকে জীয়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন?—যে করুণা নীলিমা নিজের বাপের কাছেও পায় নাই, সংসারের সার, সেই করুণাধারা কে' এই বৃদ্ধা বিদেশিনীর অন্তরে প্রেরণ পূর্ব্বক তাকে নিজগৃহে আনিয়া চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় পুনরুজ্জীবিত করিল? নীলিমার নিমীলিত নেত্রে কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল, সেই সেবাব্রতধারিণীর পদতলে নতজানু হইয়া অশ্রুসিক্ত

কণ্ঠে সে গদ্‌গদ স্বরে কহিয়া উঠিল, "আপনি আমার মা, আপনার আমি দাসী হয়ে থাকবো।"

মিস্ ওকবর্ণের নেত্রও জলপূর্ণ হইল, তিনি স্বভাব-মধুর ভাবে নীলিমার মস্তকে স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া স্মিতমুখে কহিলেন—"তুমি আমার মেয়ে; কিন্তু আমার অপেক্ষা ঈশ্বরের কাছে আর আমার ভাই জর্জ্জের—মিষ্টার ওকবর্ণের কাছেই তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া সঙ্গত—আমি কিছুই করি নাই—সে দিন সেই সময় যদি জর্জ্জ তোমায় রাস্তায় প'ড়ে থাকতে দেখে মোটরে তুলে না নিত, তা হ'লে কারও সাধ্য ছিল না যে, তোমায় বাঁচাতে পারে,—করুণাময় ঈশ্বরই তাকে অবশ্য সে সুযোগ দান করেছিলেন।"

মিষ্টার ওকবর্ণ যন্ত্রচালিতের মতই প্রতিধ্বনি করিলেন, "তাতে সন্দেহ কি?"

নীলিমা তখন অশ্রুপ্লাবিত মুখ আইরিশ যুবকের দিকে ফিরাইল, স্ব-বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব, জানি না!"

যুবক মৃদু হাসিয়া উত্তর দান করিলেন, "তুমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাও।"

নীলিমাকে ইংরাজী বলিতে শুনিয়া মিস্ ওকবর্ণ সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি ইংরাজী বলিতে পার! এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা একটা হিসাবেও পড়ে না—জর্জ্জ! তোমার অনুমান মিথ্যা নয়, বিপন্না বালিকা নিশ্চয়ই ভদ্রবংশীয়া।"

নীলিমার প্রতি মিস্ ওকবর্ণের স্নেহ যত্ন প্রতিদিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সুখাদ্য বলকারক ঔষধ ও মনে ভরসা পাইয়া নীলিমার দুর্ব্বল শরীরে অতি শীঘ্রই বলাধান হইতে লাগিল, এমন কি, জীবনে কখন যে স্বাস্থ্যের মুখ সে দেখিতে পায় নাই, লালকুঠি মিশনের কর্ত্রীর পোষ্য-

কন্যা হইয়া সে মাসখানেকের মধ্যেই তাহা লাভ করিল। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে ঝলসিত লতা শ্রাবণ বারিধারা-পুষ্ট হইয়া যেমন সতেজ হইয়া উঠে—শ্যামল পত্রাবলীতে বিভূষিত হয়, নীলিমার অযত্ন-বর্দ্ধিত, অখাদ্যে অ-পুষ্ট, ক্ষীণ দেহলতা তেমনই নূতন আশ্রয়ের স্বাচ্ছন্দ্য লাভে ও উৎকট রোগ-মুক্তির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য প্রাপ্তির সুযোগ লইল। তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রক্তাল্পতায় পাণ্ডু দেখাইত, এখন তাহাতে গোলাপের আভা মিশ্রিত হইল, টানা চোখের দুর্ব্বল কুণ্ঠিত দৃষ্টি প্রাণশক্তির স্ফুরণে উজ্জ্বল ও চঞ্চল দেখাইল, অস্থিসার দেহ সুপুষ্ট ও সুললিত ভাবে সুগঠিত হইয়া উঠিল,—মরা গঙ্গায় জোয়ার আসিল কি ?

লাল কুঠীর আশ্রয় নীলিমার পক্ষে সুখ-স্বপ্ন! রোগ শয্যায় সপ্তাহ দুই কাটাইবার পর রোগমুক্ত অবস্থায় এখানে তার তিন মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, এই মাসত্রয় তার কাছে যেন আরব্য-রজনীর তিনটি রাত্রি! মিস্ ওকবর্ণ তাকে কন্যাস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন, এত অল্পদিনে মানুষকে যে মানুষ এত ভালবাসিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে, মানুষের এ উদার ও মহৎ পরিচয় নীলিমার কাছে অজ্ঞাত ছিল, আজ তাহা প্রকটিত হইল—এক বিদেশিনীর মধ্য দিয়া! নিজের দেশকে তীব্র ঘৃণা করিয়া সে ভিন্নধর্ম্মী ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষা-ভাষিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত করিয়া দিল। নিজেকে ইঁহার কাছে উৎসর্গ করিয়া দিয়া সে স্নেহ-করুণার স্রোতকে বর্দ্ধিত ও বেগবান করিয়া তুলিল।

মিস্ ওকবর্ণ বাক্সের চাবী, হিসাব-পত্র সমুদায়ই তাঁর পোষ্য-কন্যার হস্তে তুলিয়া দিলেন। নিজে তাকে পিয়ানো শিক্ষা দিতে লাগিলেন, ভাইকে তার ইংরাজী ও লাটিন শিক্ষায় নিয়োজিত করিলেন, তাকে এতটুকু অমনোযোগী দেখিলে অনুযোগ করিতেও ছাড়িলেন না। অথচ সে বেচারারও এ সম্বন্ধে কোনই ত্রুটি ছিল না, বরং বিশেষরূপ উৎসাহই

ছিল—সে উৎসাহ এত বেশী যে, নীলিমাকে সে জন্য সময় সময় বিব্রত হইতে হইত, অথচ প্রাণদাতাকে ঘুণাক্ষরেও সে ভাব জানাইবার উপায় ছিল না।

কেবল একটি বিষয়ে নীলিমার মতদ্বৈধ ঘুচে নাই, মিস্ ওকবর্ণ প্রত্যহই দুই চারিবার করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা লইবার কথা মনে পড়াইয়া দেন, তার সংশয় দেখিয়া অসহিষ্ণুও হইয়াছিলেন, লাটিন পড়াইতে বসিয়া বাইবেল বর্ণিত বিষয়ের উপরও কল্পনা যোগ করিয়া অ-খৃষ্টানের অ-স্বর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন, তথাপি নীলিমার মন হইতে এতটুকু চলচ্চিত্ততা দূর হইতে ছিল না। হিন্দুত্বের কোন শিক্ষাই সে পায় নাই—উচ্চ হিন্দুত্বের কথা বাদ দিলেও অত্যন্ত বহিরঙ্গ যে আচারনিষ্ঠা তাও এখনকার বাসাবাড়ীর ক্ষুদ্র পরিবার-পদ্ধতির মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না, বারব্রত, দানধর্ম্ম, অতিথি-সেবা তীর্থযাত্রা, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে ত্যাগশীলতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি যে সব সদাচার ও সদ্‌গুণ হিন্দুসমাজের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচুরতর রূপেই বর্ত্তমান ছিল, প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলিমা যে সঙ্কীর্ণ পরিবৃতির মধ্যে মানুষ, সকল শিক্ষাই তার অসম্পূর্ণ—মানুষকে সে হীন স্বার্থপরতাপূর্ণ, নির্ম্মম—অথবা ভীরু, সঙ্কুচিত, অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত—এর বাহিরে দেখিতে পায় নাই! তাই স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ তার ছিল না, বরঞ্চ পরধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল, একে সে ভাল করিয়া না চিনিলেও লোভনীয় বাহ্য রূপ তাকে এক সময় আকৃষ্ট করিয়াছিল। মিশনারীদের মধ্যে জীবনের অনেক অংশ তার কাটিয়াছে, এদের ভিতর আর যাই থাক, দয়া দাক্ষিণ্যের অভাব নাই। সে দেখিত, এই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত জাতটা কোন্ সুদূরে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীর জন্য একান্ত আগ্রহে চিন্তা করিতেছে—জগতের সর্ব্বত্র তারা প্রতিনিধি

পাঠাইয়া ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচারই নয়, অনাথ শিশুদের রক্ষার জন্যও সস্নেহ প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখে নাই। অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু মানব-শিশুর মরণ প্রতিরোধ করিতেছে, তাদের মধ্যে বহুকে চোর, দস্যু, ভিক্ষোপজীবী হওয়া হইতে রক্ষা করিতেছে, আর্ত্ত ব্যক্তি ওদের দ্বারা ঔষধপথ্য ও সেবালাভে কৃতার্থ হইতেছে—বিদ্যা, জ্ঞান, উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম সফল করিতেছে! দেখিতে গেলে মানব সমাজের জন্য এদের চিত্তে করুণার অন্ত নাই, জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, পাত্রাপাত্র নাই—যেখানে অভাব ও অত্যাচার, সেইখানেই এদের সেবাকুশল করুণাস্পর্শ—এই করুণার উৎস নিজ দেশভূমি আত্মীয়-বন্ধু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাইয়া অপার জলধিগর্ভ হইতে বালুময় মরুস্থান পর্য্যন্ত পৃথিবীতে হেন স্থান নাই—যেখানে ঠেলিয়া পাঠায় না। এ ধর্ম্ম মানুষকে উদার করে, মানুষকে মানুষ বলিতে শিক্ষা দেয়, নীলিমার প্রাণে আকুল উন্মাদনা জাগিয়া উঠিল, একে আশ্রয় করিয়া সে নূতন ভাবে জীবন গড়িবে, সে জীবন মিস্ ওকবর্ণের মতই নির্ম্মল নিঃস্বার্থপরতায় পূর্ণ ও সেবাব্রতী হইবে। নীলিমার আশাহত প্রাণ যেন নব আশা কিরণে আলোকদীপ্ত হইয়া আসিল, কিন্তু একটু সঙ্কোচ, মূলে তার এতটুকু দুরাশা, সেটুকু যে কিছুতেই মরিতে চায় না!

সুশীল এ কথা জানিলে কি বলিবে? সুশীল যদি তাকে লোভী বলিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ বলিয়া মনে করে—বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করে? মন অবশ্য বলে সে জন্য ভাবনা কেন? তার সঙ্গে এ জীবনে দেখাই কি আর হইবে? কিন্তু এ যুক্তিতে হৃদয় সান্ত্বনা পায় না—দেখা যদি না-ই হয়, মনে মনেও যে সুশীল ঘৃণা করিবে সে স্মৃতিও যে তার চিত্তে অসহ্য দাহ আনিয়া দেয়! সুশীল তাকে তুচ্ছ করিতে পারে, সে দুঃখ নীলিমা প্রাণপণেই সহিতেছে, কিন্তু তার ঘৃণা সে সহিতে পারিবে না। নীলিমার

মন হইতে সব আশা মুছিয়া যায়, মিষ্টার ওকবর্ণ হতাশা লইয়া ফিরিয়া যান।

একদিন—সে দিন মিষ্টার ওকবর্ণ নীলিমার পাঠ সমাপ্তির পর যথা-পূর্ব্ব খৃষ্টানটীর সপক্ষে ঝাড়া দুই ঘণ্টা বক্তৃতার পরও তাকে সংশয়াচ্ছন্ন দেখিয়া জোর করিয়া ধরিলেন, বলিলেন—"তুমি হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা নাই বলিতেছ, অথচ খৃষ্টান হইতেও চাও না, ভিতরকার কথাটা কি বলিবে? নিশ্চয়ই ওর মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে!—সাম্ লাভ্ অ্যাফেয়ারস্——আই থিঙ্ক?"

এই সুস্পষ্ট যুদ্ধঘোষণায় নীলিমা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল।

মিষ্টার ওকবর্ণের মুখের উপর সত্যতত্ত্বাবিষ্কারের হর্ষ দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে উঠিতে সহসা বাতাহত দীপশিখার মতই নিবিয়া গেল, সন্দেহ-গম্ভীর মুখে অনুসন্ধিৎসুনেত্রে ক্ষণকাল নীলিমার নতমুখে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আমার সন্দেহই তবে সত্য—মিস্ চক্রবর্ত্তী?" —তথাপি তাকে বাক্যহারা ও প্রতিবাদ বিমুখ দেখিয়া মিষ্টার ওকবর্ণের শুভ্র মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, স্বর উত্তেজিত এবং আবেগপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল—সবেগে কহিয়া উঠিলেন, "ওঃ, না—না, ও সকল দুর্ব্বলতা মন হইতে মুছিয়া ফেল!—'লেট্ দি ডেড্ পাষ্ট বেরি ইট্স্ ডেড', এণ্ড 'অ্যাক্ট অ্যাক্ট ইন্ দি লিভিং প্রেজেণ্ট, হার্ট উইদিন এণ্ড গড ওভার হেড।'—অতীত বিস্মৃত হও, ঈশ্বরের কার্য্যে মনোনিবেশ কর, বিগতের পানে ফিরে চেও না, মিস চক্রবর্ত্তী!"

নীলিমা নিরুত্তরেই রহিল, মিষ্টার ওকবর্ণের মর্ম্মস্পর্শী বাক্যগুলা তার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে গম্ভীর মেঘমল্লারে সঘনে বাজিয়া উঠিতেছিল। —'লেট দি ডেড পাষ্ট বেরি ইটস্ ডেড্।'—'ডেড পাষ্ট?'—তার অতীত তার কাছে তার চাইতে বেশী কি? মৃত—একেবারে মৃত্যুর শীতল-

আলিঙ্গন-নিবদ্ধ—নিঃসার—প্রাণহীন! কি আছে তাতে? এতটুকু রূপ রস গন্ধ কোথাও আছে কি? না, না—পিছনে ফিরিয়া চাহিবার মত কোথাও কিছু বাকি পড়িয়া নাই—তবে সে কিসের মোহে "লিভিং প্রেজেণ্ট"কে, এই আশা-আনন্দ সুখসম্ভ্রমে ভরা জাগ্রত জীবন্ত বর্ত্তমানকে তুচ্ছ করিবে? তাকে অবহেলায় ফিরাইয়া দিয়া মৃত অতীতকেই দুহাতে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে? কি আছে তার মধ্যে? কে' আছে তার সঙ্গে?—সহসা নীলিমার চিন্তাকুল সমস্ত অন্তরকে মথিত ব্যথিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল একখানা মুখ—সে মুখ সুশীলের। কই? অতীত ত মরে নাই! সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাপানে অমর হইয়া দেহ-বিচ্ছিন্ন রাহুর মস্তকের মত মৃত্যুঞ্জয় রূপে বাঁচিয়া আছে। কই, মরণের কূল হইতে নবজীবনের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও ত এই সমুজ্জ্বল স্মৃতিটুকুর ঔজ্জ্বল্য নাশ বা হ্রাস হয় নাই—তেমনই সুন্দর—তেমনই ভাস্বর হইয়া আজিও অনিমেষে জাগিয়া আছে! এই চিন্তায় নীলিমার চিত্ত যেন চন্দ্রোদয়ে স্ফীতবক্ষ জলটির মতই সুখোদ্বেল হইয়া উঠিল, অন্তরের সুখস্রোত বাহিরেও প্রবাহিত হইল, সেই সুধাসিন্ধুর আলোড়নে সুপুষ্ট গণ্ড সরস রক্তিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই সুখস্মৃতির হাস্য বিরহিত অধরপ্রান্ত স্মিতহাস্যে ঈষৎ উদ্ভাসিত হইল। নেত্রদ্বয় সলজ্জ জড়িমায় অবনত হইল।

আইরিশ যুবকের আরক্ত মুখ সম্মুখবর্ত্তিনীর আনন্দ স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শুভ্র হইয়া গেল! সুখস্মৃতির আন্দোলনে হর্ষ দীপ্ত ও সলজ্জ মূর্ত্তি বুকে তাঁর বেদনার আঘাত করিল—সংশয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল!—তিনি ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ মুগ্ধনেত্রে নীলিমার লজ্জাশ্রীবিমণ্ডিত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ঈর্ষ্যা-বিদগ্ধ শ্লেষের স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি যাহার কথা ধ্যান করিয়া ঈশ্বরের ডাক কানে তুলিতেছ না, তোমার ডাকে সে কি কোন দিন কর্ণপাত করিবে আশা কর?"

এ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া মিঃ ওকবর্ণ কহিতে লাগিলেন, "আমার মনে হয় যে, সে বিষয়ে তোমার চিত্তেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে—তুমি সেই অগ্নি-বৃষ্টির মধ্যে কখনই অমন করিয়া অনাহারকৃশ, চলচ্ছক্তি-হীন, অসহায় ভাবে মরণের সমুদ্যত আলিঙ্গনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে না! সম্ভবতঃ তোমার প্রণয়ী ( ইওর লাভার ) পিতৃবৎসল, পিতার দয়াজীবী ( ফাদারস্ চ্যারিটী-বয় ) তোমায় বিবাহ করিলে যৌতুক পাইবে না বলিয়া কোন দিন তোমায় সে তার পিতার অনিচ্ছায় বিবাহ করিবে না—সম্ভবতঃ সে তোমায় ভালওবাসে না, অন্যের প্রেমে হয় ত চিত্ত তার পরিপূর্ণ—সেই অন্য-পরায়ণ, অথবা ভীরু, অথবা তোমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—একটা অযোগ্য নরের জন্য তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অযথা বিলম্বই করিতেছ না—সংশয়ও করিতেছ! ইহা তোমার একান্ত সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা এবং ইহার শাস্তিও তোমায় ঈশ্বরের নিকট হইতে অবশ্য পাইতে হইবে।"

নীলিমার আনন্দস্নাত মূর্ত্তি ঘোর বিষাদের কালিমায় লিপ্ত হইয়া একান্ত মলিন হইয়া গেল।—অন্যের প্রেমে চিত্ত তার পরিপূর্ণ—তা' আছেই ত! সুলেখাই ত তার সব। নীলিমা কে? সেই সুলেখার জন্যই বিবাহের মাত্র মন্ত্র পাঠ কয়টা বাকি রাখিয়া সে উল্লসিত চিত্তে তার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া পলাইয়াছে—আর সে মুক্তি লইয়াছে সে কার হাতে হইতে? শতবার চিহ্নিত এই অসহনীয় চিন্তা আবারও মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া নীলিমার সমস্ত আনন্দ-উৎসের মুখগুলোকে নির্ম্মম হস্তে চাপিয়া ধরিল।—হায় সুশীল! এতটুকু ভালবাসা যদি তোমার হৃদয়প্রান্তে পড়িয়া থাকিত! এতটুকু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, কিছুই কি—এক বিন্দুও কি ছিল না? না, না—তা' থাকিলে কেহ কি তেমন করিয়া কাহাকেও ফেলিয়া যাইতে পারে? নারী-মর্য্যাদাকে কি ততো বড় অপমান করা সম্ভব হয়? ওঃ

সুশীল! সুশীল! কি নিষ্ঠুর, কি কঠোর তুমি!—তোমার সুলেখা—যাক্, বৃথা কেন এ সব চিন্তা? যা গিয়াছে, চিরদিনের মতই তো গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না। কেন সেই দুরাশা-স্বপ্নের ধ্যানে মরীচিকার সন্ধানে, আকাশ কুসুমের কল্পনায় সারা জীবনটাকেই অপব্যয় করিয়া ফেলা?

মিষ্টার ওকবর্ণের ব্যঙ্গভরা তীব্রবাক্য কাঁটার মতই নীলিমার মনের বুকে বিঁধিতে থাকিল—'তুমি যার কথা ধ্যান ক'রে ঈশ্বরের ডাক কানে তুলিতেছ না, তোমার ডাকে সে কি কোন দিন কর্ণপাত করিবে আশা কর?'—না—কোন দিন না!—কোন আশা নাই—কোন আশা নাই! ওঃ সুশীল! সুশীল! সুশীল! কেন তুমি এমন নির্ম্মম হইলে? কেন তোমার চিত্ত সুলেখাময় হইয়া রহিল? যঁদি সুলেখার সহিত তোমার দেখা না হইত, তার সঙ্গে তোমার বিবাহের বাগ্দান না থাকিত তবে হয় ত তুমি আমায় অমন করিয়া অবহেলা করিতে পারিতে না! কে জানে, তাও হয় ত করিতে—তুমি বড় লোকের ছেলে আমি গরীবের মেয়ে—সুশীল! কেন তুমি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলে?

গভীর নৈরাশ্যের অনিবৃত্ত হাহাকারে নীলিমার বক্ষ দীর্ণ হইতে লাগিল। মিষ্টার ওকবর্ণের শ্লেষোক্তি তার গুপ্ত-ক্ষতের আচ্ছাদন বড় নির্ম্মম হস্তেই ছিঁড়িয়া দিয়াছে—এতে তার কল্পনা সরস মধুর চিন্তাধার আবরণমুক্ত কঠোর সত্যের নগ্নমূর্ত্তি যেন ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করিল এবং ঈর্ষ্যা শোক ও নিরাশায় প্রাণ তার সহস্রধা' হইয়া গেল।

# চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সুশীলের প্রতি পাছে বিরাগ দেখা দেয়, সেই ভয়ে সে তার কথা ভাবিতেও ভরসা করিত না, মাত্র তার সুন্দর মুখ, তার স্নেহের বাণী—তার আদরের সম্ভাষণ এইটুকুই স্মরণে আনিয়া নিজের অন্তরকে সুখ-প্রদীপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মিষ্টার ওকবর্ণের সহিত সেই আলোচনার পর সে আচ্ছাদন খসিয়া গিয়াছে। মনকে আর আঁখি ঠারিলে চলে না, সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় তার হাতে নাই, সুশীলের স্মৃতিতে সুখের লেশ জাগে না—জাগিয়া উঠে প্রচণ্ড ব্যথাভরা তীব্র অভিমান! স্বার্থপর ভীরু কাপুরুষ—তাকে বিপন্ন করিয়া তারই হাতের মুক্তি লইয়া চোরের মতন পলাইয়া গেল! কি ঘৃণা! নীলিমার কে' সে, যে নীলিমা তার কথা ভাবিবে? বৃথা চিন্তায় জীবনকে ব্যর্থ করিবে? —এ কি বুদ্ধিভ্রংশ না দুর্ব্বুদ্ধি?

মিষ্টার ওকবর্ণ অসহিষ্ণু হইয়া দিদির শরণ লইলেন।—ক্লারা ওকবর্ণও নীলিমাকে অনেক আশার বাণী শুনাইলেন। খৃষ্টানের পরমার্থ যে সুরক্ষিত, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রলোভন নীলিমা তার পূর্ব্ব-জীবনেই দেখিতে পাইয়াছিল, ইহলোকটাকেই বরং তখন তার আগের মত তুচ্ছ বোধ হয় না, জীবনকে যে উপভোগ করিবার উপায় আছে সে এখন তা জানিয়াছে, ব্যাপ্‌টাইজ হইতে রাজী হইল।

এই উপলক্ষে লালকুঠীতে একটু সমারোহ পড়িল। এখানকার দাস-দাসী এবং অনাথা মেয়েরা, তাদের শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই কয়

মাসের মধ্যে নীলিমাকে বিশেষ স্নেহ করিয়াছিল। এত দিন তাকে একটু পর পর বোধ করিয়া কিছু সঙ্কুচিত থাকিত, এখন মনে হইল, সে যেন তাদের আপন জন হইয়া গেল। মিষ্টার ওকবর্ণ কয়দিন হইতে এতই আনন্দোত্তেজিত হইয়া আছেন, যে, সে দেখিয়া নীলিমার অবসাদ-গ্রস্ত চিত্তেও সময় সময় একটা বিস্ময়-কৌতূহল উদ্রিক্ত না হইয়া যায় না!

যথাকালে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নীলিমার প্রাণ তার অন্তরের মধ্যে তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে, উর্দ্ধস্বরে সে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া বলিয়াছে—সুশীল! সুশীল! সুশীল! কোথা তুমি? কোথা তুমি? দেখ—জন্মজন্মান্তরের মতই আজ আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম, আর সে শুধু তোমারই জন্য, যদি তুমি আমায় এক বিন্দুও ভালবাসিতে? যদি অভাগিনী বলিয়া—অত্যাচারিতা অনাদৃতা দেখিয়া তোমার সুখস্পৃহ-চিত্তে এতটুকুও ত্যাগের মহত্ত্ব দেখা দিত, তাহা হইলে আমায় আজ এমন করিয়া তোমার কাছে পরের অপেক্ষা পর হইতে হইত না, ইহজীবনে নাই হোক, পর-জীবনে, পরলোকে তোমায় পাইবার আশা লইয়া সেই সাধনাতেই জন্ম ক্ষয় করিতাম, কিন্তু তা' হইলনা। তোমার অন্তরে আমার জন্য তিলমাত্র স্থান নাই—আমার জীবনের মূল্য তোমার কাছে কানা কড়িরও নয়—আমার মৃত্যু তোমার পক্ষে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, আমিই বা কেন এত কষ্ট সহ্য করি? নিজের মঙ্গল চেষ্টা কে'না করে?

কিন্তু দুঃখকে ত্যাগ করিব মনে করিলেও সে তাকে ত্যাগ করিল না, সুশীলের চিন্তায় আজও তার চিত্তে ক্ষণিক সুখ-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, আর সবই তার অন্ধকারে ভরা সেই সুখ-চিন্তাটুকুও আজ লজ্জা-ম্রিয়মান! নীলিমা যতই তার হৃদয়-স্থিত সুশীল-মূর্ত্তিকে তাচ্ছিল

ভরে দূরে সরাইয়া দিতে যায়, ততই যেন তা' দৃঢ় হইয়া বসিয়া আপনার পূজা আহরণ করে। সে পূজার অধিকারই বা আজ নীলিমার কোথায়?—প্রাণ তার হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠে, নূতন জীবনে সুখের উপাদান সত্ত্বেও সে সুখ পায় না।

জর্জ্জ ওকবর্ণের যত্ন সীমাহারা হইয়া উঠিল, এদিকে মিস্ ওকবর্ণের পীড়া বৃদ্ধির জন্য তাঁর করাচী ফেরা ঘটিল না। সহসা একদিন বর্ষীয়সী মিস্ ওকবর্ণের পীড়া ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। এ ঘটনায় সর্ব্বাপেক্ষা ভীত হইল নীলিমা।

অক্লান্ত সেবা ও চিকিৎসার ফলে আয়ুষ্মান্ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু আয়ু যার নাই, কে' তাহাকে ধরিয়া রাখিবে, মিস্ ওকবর্ণের পবিত্র জীবন-দীপ দিনে দিনে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। মহা ভয়ে নীলিমা তাঁর শয্যাপার্শ্ব আশ্রয় করিল, প্রাণমন ঢালিয়া জীবন ও আশ্রয়-দাত্রীর শুশ্রূষায় অন্তরের অজস্র কৃতজ্ঞতা ধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল, ফল মিলিল না।

এক দিন মিস্ ওকবর্ণ নীলিমাকে একা পাইয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলেন, "নেল! আমার মৃত্যুর পর তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

নীলিমার যত্ন-নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি এই কথায় উদ্দাম বেগে উথলিয়া উঠিল, অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়া সে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে উত্তর দিল—"জানি না।"

মিস্ ওকবর্ণের রোগ-যন্ত্রণা-মলিন শুষ্ক অধরে স্নেহের মৃদু হাস্য ফুটিল, নীলিমার অশ্রু-আবেগ বিকম্পিত দেহে ক্ষীণ হস্তাবমর্ষণ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "শান্ত হও বৎস! তুমি বালিকা, তোমার সম্মুখে অপার সংসার প্রবাহিত, একা অসহায় ইহাকে পার হওয়া বড়ই

কঠিন!—যদি আমার পরামর্শ লইতে চাও, আমি বলি, তুমি তোমার সহায়-স্বরূপে একজন সঙ্গী লও—বিস্মিত হইতেছ?—সঙ্গী হিসাবে আমি বলিতেছি স্বামী—যিনি তোমার সহায়ক ও রক্ষাকর্ত্তা হইবেন।"

নীলিমার পতনশীল অশ্রু-নির্ঝর সহসা অচলতার হাওয়া লাগিয়া নিথর হইয়া গেল। ক্ষণকাল বাঙ্‌নিস্পত্তি হইল না, কিয়ৎক্ষণ পরে সে ঘোরতর বিস্ময়াভিভূত-ভাবে কহিল, "আমায় আপনি বিয়ে করতে বল্‌ছেন? আমি যদি বিয়েই কর্‌বো, তা হ'লে নিজের সমাজ ধর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে এখানেই বা রইলুম কেন? বিয়ে কর্‌তে আমায় আপনি আদেশ করবেন না।"

মিস্ ওকবর্ণের নিস্প্রভ মুখ এই উত্তরে চিন্তাম্লান দেখাইল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কিছু দুঃখিত স্বরে কহিলেন, "নেল! আজ আমার পক্ষপাত করিয়া কাহাকেও প্রবঞ্চনার দিন নাই, সরলভাবে সত্যকে স্বীকার করাই আজ আমার একমাত্র কর্ত্তব্য, সেইজন্য বলিতেছি—তোমার মত রূপসী ও তরুণীর পক্ষে সকল সমাজে বিবাহই আত্মরক্ষার প্রশস্ত উপায়। অবশ্য, আমি যদি বাঁচিয়া থাকিতাম তবে অবস্থা অন্যরূপ হইতে পারিত, এখন তোমায় আর তেমন ভাবে কে' রক্ষা করিবে? তোমার সমাজও করিবে না, আমার সমাজও করিবে না, তাই আমার পরামর্শ লও, যদি উপযুক্ত স্থান হইতে আবেদন পাও, বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। জানিও—সুযোগ মনুষ্য জীবনে দুইবার আসে না; কদাচিৎ একবারই দেখা দেয়।"

এ অযাচিত উপদেশের প্রকৃত অর্থবোধ সে দিন নীলিমা করিতে পারে নাই, তাই নীরবেই রহিল। তার মৌনকে সম্মতিলক্ষণ বোধেই বোধ করি অতঃপর মিস্ ওকবর্ণ তার সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিয়া আর এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনে

ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার মায়ের যে চেন-ছড়া আমি ব্যবহার করিতাম, সেটি তোমার ভাবী বধূর জন্য তোমায় দিয়াছি, আনিয়া আমার সাক্ষাতে তুমি নীলিমাকে পরাইয়া দাও।"

নীলিমা কুণ্ঠিত ভাবে এ দান গ্রহণ করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া মিস্ ওকবর্ণ কহিলেন, "আমার মা'র মতন গুণবতী হইও।"

জর্জ্জ ওকবর্ণ ভগিনীর হাত ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন, "আর এই ক্লারার মত!"

নীলিমা নীরব কৃতজ্ঞতায় মস্তক নত করিল।

*    *    *    *

মিস্ ওকবর্ণের মৃত্যুর পর কয়েক দিন নীলিমা একান্তই শোকাভিভূতা হইয়া রহিল, এক রকম শয্যা গ্রহণই করিল, এই ঘটনায় নিজের মরা মায়ের শোক যেন এত দিনে সে ভাল করিয়া অনুভব করিতেছিল, আবার যেন সমস্ত জীবনটাই তার শূন্যময় হইয়া গেল। সব যেন এলোমেলো ও বিপর্য্যস্ত।

নীলিমাকে আত্মচিন্তায় ফিরাইয়া আনিল দুইজন। এদের মধ্যে প্রথম ধাক্কা খাইল সে মিস্ গোল্ডেনরীচের কাছে। এই মহিলাটী সম্প্রতি লাল কুঠির প্রধানা কর্ত্রীরূপে দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরৎ আসিয়াছেন। এখানে পদার্পণ করিয়াই সর্ব্ব প্রথম তাঁর চোখে ঠেকিল নেটিভের মেয়ের আধিপত্য! মিস্ ওকবর্ণের পাশের ঘরে সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় সাজ সজ্জায় সজ্জিত উত্তম গৃহে নীলিমার বাস এবং জর্জ্জ ওকবর্ণ ও য়ুরোপীয় সহকারিণীর সহিত তার একত্র পান ভোজন—মিস্ গোল্ডেনরীচের নিকট একান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত স্পর্দ্ধাসূচক বোধ হইল। ফলে জর্জ্জের সহিত এ লইয়া তাঁর কলহও হইয়া গেল। সহকারিণী মিস্ প্যাকউড মিস্ ওকবর্ণ ও জর্জ্জের উপর সমস্ত দায় চাপাইয়া দিয়াও সহজে নিষ্কৃতি

পাইলেন না, এ সকল ঘৃণ্য-সংসর্গ জোর করিয়া তাঁর ছাড়ান উচিত ছিল, নতুবা কর্ম্মে ইস্তফা দেওয়াও সঙ্গত—ইত্যাদি যথেষ্ট কঠিন তিরস্কার সহিয়া তাঁর মন নীলিমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এমন কি, যে সকল দাস-দাসীরা এত দিন নীলিমার প্রতি একান্ত প্রীতিপূর্ণ ছিল, কর্ত্রীর মনোভাবের অনুবর্ত্তনে তারা পর্য্যন্ত তাকে নিতান্ত অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। নীলিমার এখন সর্ব্বত্র হইতে পদে পদে তিরস্কার অবমাননা ও তাচ্ছিল্য উপভোগ আরম্ভ হইল। ততখানি সুখের পরেই এতটা দুঃখ এবার নীলিমাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিল—তবে কি সব সমাজেই তার পিতৃ-আদর্শ বর্ত্তমান? তবে কি খৃষ্টান-সমাজেও হিন্দুসমাজের মতই সঙ্কীর্ণচেতার কিছুমাত্র অভাব নাই?

সে দিন মিস্ গোল্ডেনরীচ নীলিমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নীলিমা আসিয়া পূর্ব্বের অভ্যাসমত অভিবাদন শেষে একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিতে যাইতেই তিনি ভীষণমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে যথেচ্ছ কটু ভাষা প্রয়োগ করিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, "মিস্ ওকবর্ণ তোমায় ভয়ানক প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন,—দেখিতেছি—নর্দ্দমার নোংরা জলকে তিনি পান করবার আধারে তুলে রেখে গেছেন, আর তাঁর স্বজাতীয়েরাও এখন পর্য্যন্ত তাঁর সেই নির্ঘৃণ্য কার্য্যের পোষকতা করিতেছে! আমার মনে করতেও শরীর শিহরিতেছে যে আমি একজন নেটিব-নিগারের সঙ্গে একত্র এক বাড়ীতে বাস করিতেছি! তুমি যদি এখনও ভাল চাও, অর্‌ফানেজের যে কোন কামরা ঠিক করে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে উঠে যাও।"

নীলিমা সে দিন অশ্রুভারাতুর চক্ষে ও গভীর আহত চিত্তে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একখানা সুকোমল কুসন আঁটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। একবার সে অশ্রু-অন্ধ নেত্র চারিদিকে ফিরাইয়া তার

এই কয় মাসের আশ্রয়, তার নব-জীবনের স্মৃতি সুখে ভরা গৃহস্থালীর সমুদয়টী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। করুণাময়ী মিস্ ওকবর্ণের কথা মনে আসিতেই দুই চোখ দিয়া তার পাহাড়ভাঙ্গা ঝরণাধারার মত অজস্র অশ্রু-নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। যে সুখের, যে সম্মানের স্বাদমাত্র সে কোনদিন জানিত না, তিনি যে অযাচিত করুণায় তাকে অপর্য্যাপ্তরূপে তারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন! একবার সেই সম্মান ও ভোগৈশ্বর্য্যের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনশ্চ সেইখানেই আবার দুরবস্থা ও অসম্মানের মধ্যে অবনত হওয়ার মত অপমান ও দুঃখ তার যেন অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। তার জীবনে যে সুখস্পৃহা আজও একান্তই প্রবল হইয়া রহিয়াছে, কোন সাধই তো এ পর্য্যন্ত মিটে নাই।

"আমি কি ভিতরে যাইতে পারি?"—এই প্রশ্ন করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়াই জর্জ্জ ওকবর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। নীলিমা ইতোমধ্যে মুখের অশ্রুচিহ্ন মুছিতে চেষ্টা করিতেছে, নবীন অশ্রুবিন্দুর পতন নিবারণ করিতে পারে নাই।

মিষ্টার ওকবর্ণ নিকটে আসিয়া নীলিমার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন, স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন—"কাঁদ্‌চো তুমি নেল? কান্নার তোমার কোন কারণ নাই—আমার বোনের কিছু টাকাকড়ি এখানে ছড়ানো ছিল, তারই জন্য আমার এ কয় দিন বিলম্ব হলো, না হ'লে এত দিন আমরা এখান থেকে চলেই যেতাম, এখন সে সব মিটে গেছে, আগামী কাল আমরা চলেই যাবো।"

নীলিমা ভয়-চকিত নেত্রে চমকিয়া জর্জ্জের প্রতি ফিরিল, তার মুখ দিয়া আর্ত্তভাবে বাহির হইয়া গেল—"আপনিও আমায় ছেড়ে যাবেন?"

নীলিমার মনে হইল, তার বর্ত্তমান অবস্থা যেন সেই চিরপুরাতন দিনেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে!—সেই নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ও অসহায় সে, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেবল তার পূর্ব্বের সেই আত্মসম্মান-টুকুই আর নাই—যার বলে নিজেকে সে একদিন সুশীলের উপরে স্থান দিতে পারিয়াছিল। আজ সে স্বধর্ম্মত্যাগী, পরপদলেহী, পরের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মন তার যেন কোন্ অন্ধকারের ক্ষুদ্র গুহার মধ্যে নামিয়া পড়িল।

জর্জ্জ ওকবর্ণের গাম্ভীর্য্যময় মুখমণ্ডলে সহসা আনন্দের স্মিতরশ্মি প্রতিভাত হইল। তিনি প্রফুল্লস্মিতমুখে কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "তোমায় ছাড়িয়া যাইব, সে কথা ত বলি নাই নেল? 'আমরা —এই কথায় তুমি শুদ্ধ আমার সহিত যাইবে, ইহাই কি বুঝায় না? তোমায় ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব?"

নীলিমা বিস্মিত স্মিতমুখে ক্ষণকাল তার প্রাণদাতা বিদেশী যুবকের আনন্দ বিকশিত মুখে দৃষ্টি স্থির করিয়া থাকিয়া পরে কিছু কুণ্ঠা বিজড়িত বাক্যে কহিল, "আমায় কি আপনি এখান হতে অন্য কোন মিশনে আশ্রয় দিয়ে দিবেন?—কোথায় নিয়ে যাবেন?"

মিষ্টার ওকবর্ণ নীলিমার চেয়ারের পাশে অপর চৌকিখানা টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিলেন, "কোথায় নিয়ে যাব জিজ্ঞাসা করছো কেন নেল? আমার মিশনের বাড়ীতে আমার গৃহেই তোমায় আমি প্রতিষ্ঠা করতে নিয়ে যাব—সেইখানে পৌঁছেই আমাদের বিবাহ হবে।" এই বলিয়াই জর্জ্জ নীলিমার একখানা হাত টানিয়া লইয়া তার করতলে সাগ্রহ চুম্বন করিলেন।

নীলিমা আচম্‌কা একটা অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি করিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই সচমকে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার নিশ্বাস যেন বদ্ধ হইয়া আসিতেছিল;

কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ বাক্যোচ্চারণের সাহায্য করিতে যেন একান্তই অশক্ত বোধ করিতেছিল, তথাপি কম্পিত, রুদ্ধ ও বিজড়িত স্বরে সে কোনমতে কহিয়া ফেলিল—"এ কি অসম্ভব ও অসঙ্গত প্রস্তাব মহাশয় ?"

জর্জ্জও এই কথায় বিস্ময়ানুভব করিলেন। তাঁর সুনীল স্বচ্ছ চোখে সে বিস্ময় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কণ্ঠেও তাহা প্রকাশ পাইল, কহিলেন, "আমি ত কোন অসঙ্গত বা অসম্ভব নূতন প্রস্তাব তোমায় জানাইতে আসি নাই নেল! আমার ভগ্নীর মৃত্যুশয্যায় যে প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করিয়া আমায় সাহসী করিয়াছিলে, আমি সেই স্থিরীকৃত বিষয়েরই পুনরালোচনা করিয়াছি মাত্র! তুমি ত এ বিবাহে তোমার অসম্মতি জানাও নাই এবং সে দিন আমাদের মায়ের স্মৃতি-পূত অলঙ্কার গ্রহণে আমাদের আবেদন গ্রহণও তো করিয়াছিলে—এ কয়দিন তোমায় নিতান্ত শোকাকুল দেখিয়া এবিষয়ে আমি কোন কথা কহি নাই।"

নীলিমার এখন সে দিনের সকল কথার অর্থগ্রহণ হইল, 'যদি উপযুক্ত স্থান হইতে আবেদন পাও, বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিও।'—সেই 'উপযুক্ত স্থানের' লক্ষ্য ছিলেন তাহা হইলে ইনিই ? নীলিমার সর্ব্বশরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। তবে কি তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে বিদেশীয় বিজাতীয় বিভিন্ন ভাষাভাষী এই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক পাদরীকে ? হিন্দুর মেয়ে হইয়া সে একজন আইরিশকে বিবাহ করিয়া তার স্ত্রী হইবে ? নিজের দেশ, নিজের জন সকলই তার চিরদিনের মত সত্য সত্যই পর হইয়া যাইবে ? নীলিমার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

তার পর আবার মনে হইল, কিন্তু এ ভিন্ন আর উপায় কি ? একটা আশ্রয়ও ত তার চাই, সে খৃষ্টান—কোন হিন্দু তাকে বিবাহ করিবে না, যদি বিবাহ করিতে হয় ত খৃষ্টানকেই করিতে হইবে, কোন ভদ্র-

বংশীয় দেশীয় খৃষ্টানের পক্ষেও অনাথা নিরাশ্রয়াকে বিবাহ করিবার সম্ভাবনা কম, সে ক্ষেত্রে এই পরম রূপবান্ ভদ্রবংশীয় উচ্চশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক আইরিশ যুবকের প্রস্তাব গ্রহণই কি ভাল নয়? মনে পড়িল, 'সুযোগ মনুষ্যজীবনে দুইবার আসে না, কদাচ একবার দেখা দেয়!" সত্য! আজ জর্জ্জকে ছাড়িলে কাল যে সে কোথায় দাঁড়াইবে, তার কোনই স্থিরতা নাই, বিশেষ তিনি তার প্রাণদাতা।

নীলিমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া জর্জ্জ একটু অসন্তোষের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "আবার সেই দ্বিধা এল! আমি দেখিতেছি, তুমি এখনও তোমার সেই বিধর্ম্মী পূর্ব্ব-প্রণয়ীকে ভুলিতে পারিতেছ না! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই মিছামিছি পশ্চাতে চাহিয়া তোমার লাভ কি? তুমি কি জান না যে, হিন্দুরা খৃষ্টানদিগকে কত ঘৃণা করে? সে কি আর তোমার হাতের ছোঁয়া জল খাইবে?—তোমায় ছুঁইলে হয় ত সে এখন গঙ্গাস্নান করিবে।"

ঈর্ষাকঠোর নেত্রে জর্জ্জ ওকবর্ণ নীলিমার সহসা পাণ্ডু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাকে আহত বুঝিয়া মনে মনে কিছু উল্লসিত হইল, তার মনের ভাবটা এইরূপই যে, একটা ড্যাম্-নেটিবের স্মৃতি মন হইতে আর মুছা যায় না?—এ'কি মন?

কিন্তু জর্জ্জের এই শ্লেষাত্মক বাক্য নীলিমার দ্বিধাগ্রস্ত অন্তরে বিরুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করিল। তার সমস্ত মনটা যেন এই কথায় হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কথাগুলা যে নির্ঘাত সত্য, তা অস্বীকার করিবার উপায় না থাকিলেও তার অন্তর-পুরুষ যেন ঘোরতর বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সুশীল তার হাতের ছোঁয়া খাইবে না? তার দেহে অঙ্গস্পর্শ হইলে সে গঙ্গাস্নান করিবে? উঃ, উঃ, ভগবান্! এ কি অবস্থা তার! এ কি ভীষণ দুরবস্থার পঙ্কে সে নিজেকে পাতিত করিয়াছে! আর সেই কথা

—তার পক্ষে সেই মর্ম্মভেদী—প্রাণঘাতী বার্ত্তা তাকে হাসি মুখে শুনাইতেছে কে, না, এক জন পর্‌দেশী !

নীলিমার হৃদয়-প্রাণ তারস্বরে তীব্র অস্বীকার করিয়া উঠিল—না—না—না—সুশীলের ঘৃণার্হ সে কোনমতেই হইতে পারিবে না—সে ঘৃণা তার পক্ষে অসহনীয় ! সুশীলকে সে ভুলে নাই, সুশীলকে সে কোন দিন ভুলিতে পারিবে না—কখনও না !—সুশীল ! সুশীল !—সুশীল ! ওঃ সুশীল !

নীলিমার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ঘামে তার অঙ্গ বস্ত্র ভিজিয়া উঠিল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া যন্ত্রণার্ত্ত অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। মিষ্টার ওকবর্ণ অবাক হইয়া স্তম্ভিত নেত্রে তার সেই মানসিক দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন। মনের মধ্যে তাঁর সুপ্রচুর উষ্মা জন্মিতে থাকিলেও অতখানি কাতরতার প্রতিবাদে তাঁর ভদ্র চিত্ত তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না।

বহুক্ষণ পরে নীলিমা যখন কতকটা সংযত ও শান্ত হইতে পারিল, অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া সে সুস্পষ্ট দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "আমায় ক্ষমা কর্‌বেন, আমি আপনার অনুগ্রহ লইতে পারিলাম না, আপনার অনুমানই সত্য, আমি তাকে ভুলিতে পারি নাই—পারিবও না।"

মিষ্টার ওকবর্ণ সক্ষোভ বিরক্তিতে অধর দংশন করিলেন, অপ্রসন্ন নীরস কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কি তাকে পাইবে আশা কর ?"

এ বিদ্রূপের কঠোর আঘাতে নীলিমার গভীর বিষাদাচ্ছন্ন চিত্ত ঘন দুঃখের কালো মেঘে ছাইয়া উঠিল। আসন্ন বর্ষণোন্মুখ জলধারার মতই সুপ্রচুর অশ্রু-গাঢ় ভগ্নস্বরে সে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "না—কিন্তু তার স্মৃতির পূজা তো করিতে পারিব—তাহাতে তো কেহ বাধা দিতে পারিবে না।"

"তাহাতে আমি বাধা দিব !—এক জন বিধর্ম্মীর 'স্মৃতিপূজা' করা

খৃষ্টানের ধর্ম্ম নহে! তুমি যে এখন আর হিন্দু নও, সে কথা তোমার স্মরণ আছে কি? তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে আমি বাধ্য—সেজন্য আমায় তুমি ক্ষমা করিও।"

ব্যাধ-বাণাহতা অন্তর্বিদ্ধা বিহঙ্গীর মতই নীলিমা এই নির্ঘাত বাক্য-বাণাহত হইয়া ঘুরিয়া পড়িতে গেল—কি ভয়ানক! 'বিধর্ম্মীর স্মৃতি-পূজায়' আজ তার ধর্ম্মহানি হইবে আর সে বিধর্ম্মী কে? না—সুশীল,—ওঃ, ভগবান্! একি হইল!

মিষ্টার ওকবর্ণ তীব্রদৃষ্টিতে নীলিমার মরণাহত মুখের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বিধর্ম্মীর 'স্মৃতি-পূজা' ত্যাগ করিয়া প্রকৃত খৃষ্টানের কার্য্য কর, প্রভুর আহ্বানে কর্ণপাত কর। আমি তোমার প্রাণদাতা, সে প্রাণে আমারই আজ সম্পূর্ণ অধিকার, আর কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র অধিকার নাই—সে প্রাণ তুমি আমাকেই সমর্পণ করিয়া আমার সহিত একাত্ম হও—ইহা হইতে তুমি ন্যায়তঃ বাধ্য কি না বল? বাল্যাবধি আমি মিশনের কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি, বিবাহে আমার কোন দিন অভিরুচি ছিল না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মিশিয়া আমি তোমাতে আকৃষ্ট হইয়াছি—কেন হইয়াছি জানো? আমি দেখিয়াছি, তোমার মধ্যে একটা ঐশ্বরিক প্রেরণা আছে, ভোগতৃষ্ণা ও সাংসারিকতা তোমাতে বড় কম—আমি এই প্রকারের স্ত্রী চাই—তাই তোমায় চাহিতেছি। এস, আমরা দু'জনে মিলিয়া একান্তমনে ঈশ্বরের কার্য্য করি। তোমায় যে পথের মধ্যে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তার জন্য এমন সু-অবসর তুমি কেনই বা ত্যাগ করিবে? জীবন সার্থক করিয়া কেন দয়াল প্রভুর সেবা করিবে না? এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—মানুষ হও—মনুষ্যত্বের অবমাননা করিও না!"

নীলিমার চিত্তে আর যেন শক্তি-বিন্দু নাই! তার মনে হইল সে

ওই বলীয়ান্ আইরিশ যুবকের ফাঁদে যেন এখনই জড়াইয়া পড়িবে। আত্মরক্ষার সামর্থ্য ক্রমশঃই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, জর্জ্জ যেন তাহাকে ক্রমেই সম্মোহন বিদ্যায় বশীভূত করিয়া ফেলিতেছে। সে আড়ষ্ট অভিভূতবৎ রহিল, ভালমন্দ কোন কথাই মুখ দিয়া বাহির হইল না—এমন কি, মনের মধ্যটাও যেন দেখিতে দেখিতে অসাড় হইয়া গেল।

এমন সময় পশ্চাতে জুতা-পরা পায়ের গুরু শব্দে দুই জনেই একসঙ্গে পিছনে ফিরিয়া দেখিল, মিস্ গোল্ডেনরীচ আসিয়াছেন এবং তাঁর স্বাভাবিক সুগোল ও আরক্ত মুখ অধিকতর রক্তোজ্জ্বল! তিনি কোনরূপ ভূমিকামাত্র না করিয়াই ক্রোধ-পরুষ কণ্ঠে কহিলেন, "মিষ্টার ওকবর্ণ! এটা পবিত্র মিশন হাউস, অপেরা হাউস নয়, এবং স্মরণ রাখবেন, আপনি একজন শ্রদ্ধাস্পদ পাদরী।"—নীলিমার দিকে চাহিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "আস্তাকুড়ের ময়লা জল পান পাত্রে ভরে রাখলে কখন কখন তাতে জীবনসংশয় হয়েও উঠে—সে খুব জানা কথাই। যা—তুই এখনই এখান থেকে দূর হ'য়ে যা'।"

নীলিমা নত মস্তকে বসিয়া রহিল, এ অপমানে তার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, ইহা সত্ত্বেও সে উঠিতে পারিল না। জর্জ্জ ওকবর্ণ যারেক ব্যথিত নেত্রে তার প্রতি কটাক্ষ করিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে মিস রীচকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমার পদমর্য্যাদার কথা আমার স্মরণ আছে মহাশয়া!—আমি আমার বাগ্দত্তা স্ত্রীকে আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলতে এসেছি মাত্র! নেল!—আর বিলম্ব অবিধেয়, উঠে এস, আমরা এখান হ'তে এখনই চলে যাই।"

মিস্ গোল্ডেনরীচের তাম্রবর্ণ মুখ এই কথায় সুলোহিত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা তাঁর যেন অনলদীপ্ত দেখাইল, তিনি কহিলেন, "আপনার বাগ্দত্তা স্ত্রী! অসম্ভব!—এক উচ্চবংশীয় আইরিশ-ম্যানের সহিত একটা

পথের কুক্কুরীর বিবাহ?—এ কখনই হইতে পারে না। আজকাল এইরূপেই এ দেশে বৃটিশ-সম্মান নষ্ট হইতে বসিয়াছে। না, আমি ইহা সমর্থন করিতে পারিব না।—মিষ্টার ওকবর্ণ! আমার মিশনের মেয়ে আপনি আমার বিনা অনুমতিতে লইয়া যাইতে পারিবেন না, আমি উহাকে কখনই আপনার হাতে ছাড়িয়া দিব না—আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে—ইহাতে সম্পূর্ণরূপেই আমার অধিকার আছে?"

জর্জ্জের ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, তাঁর দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, পরে ভীষণ ক্রোধকে কোনমতে দমনে রাখিয়া তিনি কহিলেন, "আমার বাগ্দত্তা স্ত্রীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে আপনার কোনই অধিকার নাই!" ক্রোধে তাঁর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

মিস্ গোল্ডেনরীচ সক্রোধ ব্যঙ্গোক্তিতে সহাস্যে উত্তর করিলেন, "একটা পথের-কুটা যে আপনার মত এক জন ভদ্রলোকের বাগ্দত্তা—এটা যে-কোন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রমাণ করিতে পারিবেন ত? আপনার সাক্ষী কে'? আমি অবশ্য আপনাদের মধ্যে একটা অবৈধ প্রণয় স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, কিন্তু বৈধ বাগ্দান স্বীকার করিব না এবং সমস্ত বৃটন সাম্রাজ্যের পক্ষে অবমাননাকর এ বিবাহ যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য সযত্নে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বাধা দান করিব জানিবেন। নীলিমা! এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, আজ হইতে তোমায় আমার নজরবন্দী থাকিয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' এতদূর স্পর্দ্ধা যে নিজের কুহক-মন্ত্রে ইউরোপীয় যুবাকেও বশীভূত করিতে চেষ্টা কর!—মিষ্টার ওকবর্ণ! গুডবাই মহাশয়! এস নীলিমা! তোমায় চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসি—বাহিরে রাখা তোমায় নিরাপদ হইবে না।"

নীলিমা অচঞ্চল পদে উঠিয়া দাঁড়াইল, তার মনে হইল, স্বয়ং মুক্তি-

দেবী আসিয়া যেন তার সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন! জর্জ্জের সূচী-মুখ বাক্যবাণে তার সারা অন্তর প্রায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জর্জ্জের জিঘাংসাবৃত্তির পরিপোষক প্ররোচনায় চিত্তে তার হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহা উন্মাদ তাণ্ডবে নাচিয়া উঠিতেছিল, তার প্রলোভনে সন্দেহ-দোলায়িত মন সঞ্চালিত তালবৃন্তের মতই সঘনে আন্দোলিত হইতেছিল, মিস্ গোল্ডেনরীচের আগমনে ও প্রতিবাদে সে যেন আত্মচিন্তার অবসর পাইয়া সেই সঙ্গে আত্মরক্ষার অবকাশও লাভ করিল। দণ্ডকে মুক্তি বোধ করিয়া তাই সে প্রসন্ন শান্ত চিত্তে উঠিয়া মিস্ গোল্ডেনরীচের অনুগমনোদ্যতা হইল।

জর্জ্জ ওকবর্ণ তৎক্ষণাৎ সবেগে সম্মুখে আসিয়া পথ আগুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"এক মুহূর্ত্ত!—শোন নেল! আমার প্রস্তাবে তোমার সম্মতি আছে, শুধু এইটুকু তুমি স্বীকার কর, তার পরের সমস্ত কর্ত্তব্য আমার। আমায় বিবাহ করিতে তুমি প্রস্তুত আছ—এইটুকু মাত্র আমায় বলিয়া যাও।"

নীলিমা গমনোদ্যত চরণকে সংযত করিয়া ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইল, এক মুহূর্ত্ত মাত্র অবিচল নেত্র জর্জ্জের প্রতি স্থির রাখিয়া তেমনই অকম্পিত দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি আমার প্রাণদাতা, আমার চিরস্মরণীয় হইয়া চিরদিনই আমার অন্তরে বিরাজিত থাকিবেন, কিন্তু আপনার প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণরূপেই অসম্মত—আমি আপনার সহিত যাইব না।"

মিস্ গোল্ডেনরীচ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হিংস্র দৃষ্টিতে জর্জ্জের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উত্তর শুনিলেন ত? এখন যদি ইহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগও অত্যন্তই কঠোর হইবে ইহা জানিয়া করিবেন।"

বিমূঢ়-প্রায় জর্জ্জকে একা ফেলিয়া নারী দুই জন বাহির হইয়া গেল।

সঙ্কীর্ণ গৃহের ততোধিক সঙ্কীর্ণ ও সামান্য শয্যায় পড়িয়া বন্দিনী-নীলিমা নয়নাশ্রুতে ভাসিয়া কাতর চিত্তে ডাকিতেছিল—"সুশীল! —যদি একবার তুমি আমার কথা ভাবিতে!—আমি তোমার জন্য কত যে সহিলাম—তার কিছুই তুমি জানিলে না—এই আমার বড় দুঃখ।"

# একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অন্ধকার মধ্যরাত্রি—সেই সুগভীর অন্ধকাররাশিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একখানা মেল ট্রেণ সুদূর পশ্চিমাভিমুখে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহার গমন পথের দুই দিকে সুনিবিড় পাদপ-পূর্ণ বন, তার মধ্যে গাঢ় অন্ধকার জমাট হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে তৃণগুল্মলতাচ্ছাদিত অসমতল উচ্চাবচ সুদূর বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে স্নিগ্ধসলিলা সুপ্রশস্তা ও অপ্রশস্তা নদীগণ আসিয়া আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছিল। সে সকলই কিন্তু সেই প্রগাঢ় অন্ধকার-সাগরের মধ্যে অস্পষ্টপ্রায় রহিয়া যাইতেছে, আর তেমনই অন্ধকারের রাশি ভরা ছিল সেই গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর আরোহী একটি যুবকের চিত্তে। পথি-পার্শ্বের অন্ধকার ঘন বনে জোনাকীর পুঞ্জ জ্বলিতেছিল, কিন্তু সেই আরোহী যুবকের অন্তরের কোথাও যেন আলোকের বিন্দুটুকুও দেখা যায় না!

বাহিরে অন্ধকার, কিন্তু গাড়ীর কামরার মধ্যে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর প্রভাবের অভাব নাই। উপরি একজন আরোহী নামিয়া যাইতেই যুবক উঠিয়া আলোর উপর 'সেড' টানিয়া দিয়াছিল। এখন সে আবার উঠিয়া তাহা বিমুক্ত করিল এবং পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানা পত্র খুলিয়া তাহা মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল—

"ছয় মাস উত্তীর্ণপ্রায়, এত দিনেও আপনি অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন না? সংবাদ পাওয়া গিয়াছে নীলিমা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে —আমার সে সংবাদে আস্থা হয় নাই।—আমি * * * লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইয়াছি, নীলিমাকে শ্মশান হইতে কেহ ফিরিতে দেখে নাই, ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, সে ডুবিয়া মরিয়াছে। এ সম্বন্ধে দায়িত্ব আপনার, ধর্ম্মতঃ তার স্বামী আপনি, কোন্ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে স্ত্রীর সন্ধান না করিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন? স্বপ্নেও মনে করিবেন না, তার প্রতি সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিলে আপনি ক্ষমা পাইবেন, তবে এমন হইতে পারে, এখন হয় ত আমার ক্ষমায় আপনার প্রয়োজন নাই, সে হতভাগিনীর প্রতি সুবিচার না করিলে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে আপনাকে চির-অপরাধী থাকিতে হইবে। ইতি—

সুলেখা।"

এই পত্রখানা বহুবার পঠিত হইলেও ইহা সুশীল পুনরায় পাঠ করিল। তার পর পত্রখানা যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আর একখানা পত্র সে বাহির

"নিজেই * * * গিয়াছিলেন, অনুসন্ধান ব্যর্থ হইয়াছে, শবদাহকারী ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে নামিতে দেখিয়াছিল, উঠিতে কেহ দেখে নাই! ইহাতে মৃত্যু নিশ্চয় করা অসঙ্গত নহে বটে, কিন্তু তথাপি আমার মন বলে, সে মরে নাই! সুখহীন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া—আহা, না জানি সে অভাগী কোন্ মহা বিপদের সাগরে—কোন্ বিষম দুর্গতির মধ্যেই ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে!—তাকে রক্ষা করুন, আবার যান, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন! যদি তার ভাগ্যে কোনরূপ অকথ্য দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে, তার জন্য একমাত্র আপনিই যে দায়ী, তাহা নিজেও জানেন— তবে কেন অন্তরের সহিত চেষ্টা করিয়া তাকে উদ্ধার করিবেন না?

আমিও অবশ্য এর জন্য কতকটা দায়ী। আমি এর মধ্যে না থাকিলে হয় ত তাকে ধর্ম্মভাবেই পাইতে চেষ্টা করিতেন! তাই প্রায়শ্চিত্তে আমাকেও স্থান লইতে হইতেছে। আমার বাবার এ সম্বন্ধে এতটুকুও সহানুভূতি থাকিলে আমি নিজেই যাইতে পারিতাম, এক দিন এ কথার উল্লেখে যে তিরস্কার সহ্য করিয়াছি, জীবনে করি নাই! এর উপর আমার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, বলিতেছেন, আমার এই সকল 'সেন্টিমেণ্টালিটীতে' তাঁর বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই! তিনি আমার কোন ওজর শুনিতে চাহেন না—আপনার মত সুপাত্রের হস্তে আমায় জোর করিয়াই সম্প্রদান করিবেন। হিন্দুর মেয়ের বিবাহ কন্যার মতামতের অপেক্ষা রাখে না—সে কথা সত্য।—কিন্তু সে বাল্য-বিবাহে—আমি বালিকা নই, আমার মন এখন অন্যের পরিচালনাধীন নহে—তিনি এটা বোঝেন না। তিনি প্রবল, আমি দুর্ব্বল। আমার মা'র যেটুকু আপত্তি ছিল, একদিকে বাবার শাসন, অপর দিকে আপনার পিত্রৈশ্বর্য্য সে টুকুকে ক্রমশঃই গ্রাস করিতেছে! কিন্তু এ বিপদে আমি আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। তাঁদের এই খেয়াল-খেলায় যোগ দিবেন না। আমি আপনাকে নীলিমার স্বামী বলিয়াই মনে করি, হয় দেশ ছাড়িয়া যান, না হয় বিবাহে অনুমতি জানান, আমার আশা ছাড়ুন, নতুবা আপনার বাবাকে আমি নিজেই আমার আপত্তি জানাইয়া পত্র লিখিব, তিনি আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া আমায় নিশ্চয়ই বাঁচিতে দিবেন। ইতি—

সুলেখা।"

সুন্দর হস্তাক্ষরে সুচারু ছাঁদে লেখা এই ভীষণ পত্রখানা সুশীল ইতঃপূর্ব্বে একবারমাত্র পাঠ করিয়াছিল, ইচ্ছা হইলেও ফিরিয়া পড়িতে পারে নাই। দ্বিতীয়বার পাঠ করিতে গিয়া মনে হইল, চোখ দুইটা

হইতে সমস্ত দেহ-মন যেন তার আগুনে পুড়িতেছে ; প্রাণ যেন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, খোলা চিঠি সামনে ফেলিয়া সে নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিল। ট্রেণ থামিয়া ষ্টেশনে আসে, আবার চলিতে থাকে—আবার দাঁড়ায়—আবার চলে, সুশীলের দৃকপাতও নাই, সে অবাক্ হইয়া ভাবে, তার এই জটিল অদৃষ্টের কথা—এ যেন এক রহস্যময় উপন্যাস ! এ যেন একটা শ্বাসরোধকর দুঃস্বপ্ন ! মানুষের ভাগ্যে—ভদ্রসন্তানের ভাগ্যে কি কখনও এমন ঘটনাও ঘটে ? মন তার নীলিমার প্রতি বিদ্বিষ্ট ও তিক্ত হইয়া উঠিল, তার সংস্রবে আসিয়াই তার এত বড় দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, অথচ ঈশ্বর জানেন, তার কি অপরাধ ! অনুকূলের কথা মনে আসিতেই মন গভীর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। পূতিগন্ধ বিশিষ্ট মলিন বস্তুর মতই তার চিন্তাকেও সে ঘৃণা বোধ করে ! * * * গিয়া সংবাদ পাইয়াছিল, স্ত্রী কন্যার মৃত্যুতে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া সে অর্থসঞ্চয়ের প্রতি কায়মনোবাক্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে ; মধ্যে মধ্যে আপশোষ করিয়া বলে, 'মেয়েটা আহাম্মকের মতন মরে গেল—নৈলে ভুবন রায়ের কাছ থেকে দশটি হাজার মারে কে' ? মর্‌লিই যদি ত দুটো দিন বাদে মর্‌লেই ত হতো ?' নীলিমার নিরুদ্দেশটাকেও সে সুশীলের উপর ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বিপ্রদাসের লোক সেটা অনেক কষ্টে মিটাইয়া আসিয়াছে। পাকা লোক বিপ্রদাসের সে জন্য অর্থব্যয় খুব বেশী হয় নাই।

সুশীলের বক্ষ চিরিয়া একটা অগ্নিতপ্ত দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। এবার নীলিমার প্রতি বিদ্বেষজ্বালা মন্দীভূত করিয়া চিত্ত তার জ্বলন্ত হইয়া উঠিল সুলেখার প্রতি ! তার এতটা দুর্গতি ঘটিত না—যদি সুলেখা অমন একরোখা না হইত—ভাল বলিয়া অতটা ভাল হওয়া কারো পক্ষে ভাল নয় ! যে নীলিমা বাঁচিয়া নাই, তাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে,

এ কি অসঙ্গত জিদ? তার পিতা বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে শুধু শুধু একটা খেয়ালের বশে তাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে—সব কথাই ত সুশীল খোলা খুলি পত্র দ্বারা জানাইয়াছিল, সে পত্র সে বিশ্বাস করে নাই। সুশীলের মনটাকে লইয়া এ কি নির্ম্মম খেলা খেলিতেছে সে। সুশীল যেন তার একটা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক মাত্র। সুশীলের পীড়িত চিত্ত নূতন ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিল। বুক তার দীর্ঘশ্বাসে ফুলিয়া রহিল, তবু কৈ, তাকে তো ভুলিতেও পারা যায় না? মনে যার এত অবিশ্বাস, প্রাণে যার এতটুকু সহানুভূতি নাই, তার জন্য বুক অমন তীব্র বেদনায় ফাটে কেন? অনায়াসে তাকে যে পরের হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে—তারই জন্য প্রাণপণ করিয়া বসে, তার স্মৃতি মন হইতে কেন মুছিতে পারা যায় না? তার এ অবিচারের দণ্ড মাথায় লইয়া মিথ্যার পিছনে পাগলের মত দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়াও তার এ প্রায়শ্চিত্তের কি শেষ হইল না? আবার তারই খেয়ালের খেলায় দেশত্যাগী হইতে হইল? তথাপি তারই জন্য প্রাণের মধ্যে বেদনার পুঞ্জ ও অশ্রু-নির্ঝর আজও ঠেলিতে থাকে কেন? সেই কঠোরহৃদয়া পাষাণী যে তার কৈশোর যৌবনের ধ্যানের দেবী, মানস-মন্দিরের করুণা-প্রতিমা! কার শাপে তার ভাগ্যে এই মমতাময়ীকে এতবড় মমতাহীনা করিয়া দিল? তবে তাই দিক—সুশীলকে সে যখন এমন করিয়াই ত্যাগ করিতে চায়, তখন সে-ও তার কৃপাকণার জন্য লালায়িত হইবে না, তার দুঃখের জীবন চির-অন্ধকারাবৃতই থাকুক। সুলেখা সুখী হোক, কোন ভাগ্যবানের হৃদয়লক্ষ্মী হোক, সে, সুশীল তার পথ ছাড়িয়া জন্মের মতই সরিয়া যাইতেছে।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন আসিল। *** ষ্টেশনে এক জন দীর্ঘাকার ইংরাজ পাদরী, বয়সে সুশীলের চেয়ে কিছু বড়, সুশীলের মতই প্রায় সেও

অমনি চিন্তাম্লান সুশীলের কামরায় উঠিল। সুশীল চাহিয়া দেখা দূরে থাক—তার অস্তিত্বও জানিতে পারিল না, তার মন তখন তার পিতার প্রতি একটা অকথ্য অব্যক্ত নিগূঢ় অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা তাকে এত বড় ভুল করিলেন! এক দিনের জন্য তিনি এতটুকু আলোচনা করিলেন না, কোন কথাই তুলিলেন না, যাহাতে প্রকৃত ঘটনা জানাইতে পারে, তার জন্য সুযোগমাত্র দিলেন না, অথচ কি ভীষণ মর্ম্মব্যথাই যে ভোগ করিতেছেন, সেও ত সুশীলের অজ্ঞাত নহে!—সে মনোবেদনার সাক্ষী বা কোন সহানুভূতিকারী একজনও নাই, সে শুধু তাঁর বক্ষশোণিত শুষিয়া লইয়া তাঁকে কীটদষ্ট ফলের মত ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করিতেছে। কেবল মৃত্যুর আমন্ত্রণ বার্ত্তা সেই আনন্দলেশহীন নিস্পৃহ মূর্ত্তি হইতে সকলে অল্পবিস্তর পাইতেছিল মাত্র। সুশীলের প্রাণ যেন তার গৃহের মধ্যে হাঁফাইয়া উঠিয়াছে! এর চেয়ে পিতা তাকে যদি কঠোর তিরস্কার করিতেন, সে তাঁর পায়ে পড়িয়া কাঁদিত, তার সকল ব্যথা প্রশমিত হইয়া যাইত। যদি তিনি তার সঙ্গে কথা বন্ধ করিতেন, তাকে ত্যাগ করিতেন, সে মরিত, তার সকল জ্বালা জুড়াইত। কিছুই না করিয়া সমস্ত দুঃখটাকেই যে কালানলের মত নিঃশব্দে নিজের বুকে তুলিয়া লইয়া প্রাণঘাতী বিষজ্বালায় নিজেকে নিঃশেষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছেন, এ অসহ্য! অথচ এর কোন উপায় করাও তেমনই অসম্ভব! তিনি তার সঙ্গে কথা কহেন, দেখা হইলেও আর মুখ ফিরান না, কিন্তু সে দেখা হয় কদাচিৎ—কথা হয় কত সামান্য! সেই অসীম স্নেহ-সম্বন্ধ ঘুচিয়া এই সম্পর্কই কি তবে চিরস্থায়ী হইল?

এই যে প্রচণ্ড বাধা দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-শিখরের মত উন্নতশীর্ষে পিতা, পুত্রের প্রাণঢালা একাত্মতার মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিল,

ইহাকে মধ্যে রাখিয়া বাঁচিয়া থাকা যে দুজনকারই পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহা দুজনেই সুস্পষ্ট বুঝিতেছিলেন, তথাপি এর প্রতীকার দু জনের কাছেই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে সুলেখার ঐ কুলিশ-কঠোর পত্র—যাতে তার নির্ব্বাসনের আদেশ আছে—পাইয়া অসংবরণীয় হৃদয়াবেগে সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল; আজ যে কোন খানে যাওয়ার পথ তার খোলা—পিতার অনুমতি পাইবার হয়ত বাধা নাই, লইবার প্রবৃত্তিও ছিল না।

আগন্তুক বিদেশী যুবক যদিও চিন্তামলিন মুখে এই কামরায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি সুশীলের মুহ্যমান ভাবের কাছে তাঁর সে অবস্থা যেন কিছুই নহে! ইহার মুখের এই মৃত্যু-বিবর্ণতা ও গভীর অবসাদ-গ্রস্ততা তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করিল। তিনি বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির করিলেন, এর সকল আত্মীয় একত্রে কোন একটা ভীষণ দৈব-দুর্ব্বিপাকে নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে—পৃথিবীতে কোন আশা রাখিয়া মানুষ এমন আত্ম-বিস্মৃত হইতে পারে না! মনে তাঁর কৌতূহল ও করুণা একত্রে জাগিয়া উঠিল, দুই একটা কথা কহিবার চেষ্টাও তিনি করিলেন। এর আহ্বানে সুশীল প্রথমটা চমকিয়া উঠিল, তার পর বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—দেখিল সেই সুবিস্তৃত অন্ধকাররাশি—মনে হইল, উহারা এই যে প্রাণপণে গাড়ীর সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, এ শুধু তার সঙ্গ হারাইবার ভয়ে! মনে হইল, তার অন্তরে এই অন্ধকার-সমুদ্রের তরঙ্গগুলাই প্রবেশ করিতেছে! ইংরাজ সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তর সে নীরবেই এড়াইয়া গেল, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

আগন্তুকের দৃষ্টি সুশীলের সম্মুখস্থিত সেই খোলা চিঠিখানার উপর পতিত হইল। বাঙ্গালা হাতের লেখা পড়িবার মত বিদ্যা তাঁর ছিল।

কতকটা এই অদ্ভুত ভাবের লোকটির সম্বন্ধীয় কৌতূহল আর কতকটা নূতন বিদ্যার ঔৎসুক্য, সেই পত্রের প্রতি চিত্ত তাঁর আকৃষ্ট করিল এবং দৃষ্টিটা খোলা চিঠিতে নিবদ্ধ করিল। কয়েক পংক্তি পড়িয়াই তিনি সচমকে মুখ তুলিয়া উগ্র আগ্রহে সবেগে কহিয়া উঠিলেন—"তুমিই কি নীলিমার স্বামী ?"

এই আকস্মিক ও অদ্ভুত প্রশ্নে সুশীলও চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরক্ষণে এর ধৃষ্টতায় মনে তার সুপ্রচুর উষ্মা জাগিয়া উঠিল ; তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"এ কিরূপ প্রশ্ন মহাশয় ?"

আগন্তুক জর্জ্জ ওকবর্ণ—জর্জ্জ এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে বলিলেন, "ক্ষমা চাইছি ! আমার নীলিমার ত স্বামী নাই !—যার জন্য সে আমায় প্রত্যাখ্যান কর্‌লে, সে তার ভালবাসার লোকমাত্র ! আপনার স্ত্রীরও বোধ করি ঐ নাম ?—আমি তাকে নীলিমা চক্রবর্ত্তী বলে ভুল করেছিলাম।"

"নীলিমা চক্রবর্ত্তী ?—'আপনার নীলিমা !'—আপনি কা'র কথা বল্‌ছেন ? আমিও এক জন নীলিমা চক্রবর্ত্তীর অনুসন্ধান কচ্চি, আপনি যে নীলিমার কথা বলছেন, সে এখন কোথায় ?"

সুশীলের কণ্ঠ যেন তীব্র আগ্রহে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, উত্তরের প্রতীক্ষা যেন অসহনীয় বোধ হইতেছিল—তবে কি সুলেখার সন্দেহই সত্য ? এত দিনে কি তবে—

মিষ্টার ওকবর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুশীলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন —মনে মনে স্বীকার করিলেন, এই যদি নীলিমার প্রণয়ী হয়, তবে তার রুচিকে নেহাৎ নিন্দা করাও যায় না ! নেটিভের পক্ষে এর চেহারা ভালই এবং ইংরাজীর উচ্চারণ ইংরাজের মত না হোক, উচ্চশিক্ষিতের মত তাতে সন্দেহ নাই ! কহিলেন, "সে নীলিমা এখন * * * মিশনে

আছে, প্রায় সাত মাস পূর্ব্বে এক দিন পথের ধারে তাকে আমি মরণাপন্ন অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া আমার বোনের কাছে লাল কুঠীতে লইয়া আসি, অনেক কষ্টে সে পুনরুজ্জীবিত হয়। আমার বোনের মৃত্যুর পর, ইচ্ছা ছিল, আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া আমার কর্ম্মস্থলে করাচীতে লইয়া যাইব, কিন্তু সে কোনরূপেই চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। যে হৃদয়হীন পাপিষ্ঠ-প্রণয়ী তাকে জ্যৈষ্ঠ-মধ্যাহ্নের অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে জনহীন মাঠের উপর মরিতে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এখনও সে তার জন্য প্রাণ দিতে চায়!—আশ্চর্য্য উপাদানেই ঈশ্বর নারী-চিত্ত গঠন করিয়াছেন!—সে আমায় স্পষ্টই বলিল, তাকে সে ভুলিতে পারে নাই—কখন পারিবে না!”

জর্জ্জ ওকবর্ণ আর একবার তীক্ষ্ণ-ভেদ্য দৃষ্টি দিয়া সম্মুখস্থিত সুশীলের ভূতাহতবৎ পাণ্ডুমুখ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, সুশীলের শরীরে তখন সংজ্ঞা আছে কি না, এ বিষয়েও তাঁর সংশয় জাগিল, হঠাৎ মনে হইল, লোকটা উন্মাদ অথবা মৃগীরোগগ্রস্ত হইতেও ত পারে?

গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে জানা গেল; সহসা সুশীল সযত্ন কম্পিত চরণদ্বয় সুদৃঢ় করিয়া লইয়া সজোরে ভূমে স্থাপন পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। বক্ষের দ্রুত স্পন্দন সযত্নে রোধ চেষ্টা করিয়া অস্পষ্ট স্বরকে ফুটাইয়া তুলিয়া বিনীত শান্ত করিয়া বলিয়া উঠিল—“দয়া করে ঠিকানাটা দিন, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই—আমি যাকে খুঁজছি, সে ঐ নীলিমা। আর দয়া করে একটু পরিচয়-পত্র আমায় দেবেন কি?”

জর্জ্জ ওকবর্ণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “অমন কার্য্যও করিবেন না! সেখানে গিয়া কাহারও নিকট আমার নামোল্লেখ করিলে তাহার সহিত আপনার দেখা হওয়া সম্ভব হইবে না—আপনি শুধু গিয়া বলিবেন, আপনি তার বিশেষ আত্মীয়—কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।”

"তবে আমি এই ষ্টেশনেই নামিলাম। একখানা গাড়ী বা যেমন করিয়া হোক, এ পথটুকু ফিরিয়া যাইব—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! বড় ভাগ্যেই আপনার সহিত আজ সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল—সাত মাস ধরিয়া আমি ইহাকে অনুসন্ধান করিতেছি।"

"এই নিন ঠিকানা লেখা কার্ড—নীলিমাকে বলিবেন, 'জর্জ্জ ওকবর্ণ তাহার প্রতি তার অকৃতজ্ঞতার এই প্রতিদান দিয়াছে!—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, সে সুখী হোক—আমার আর কিছুই বলিবার নাই।'—শুভরাত্রি!"

# দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকখানি সুখের পর দুঃখ যখন ফিরিয়া দেখা দেয়, তখন তাকে সহ্য করা কঠিনতর হইয়া উঠে! পূর্ব্ব দারিদ্র্যের কথা, মানুষ বড় সহজেই ভুলিয়া যায়; কিন্তু দুই দিনেরই হোক, আর দশ দিনেরই হোক সুখের দিন কয়টা তার বুকে রঙীন নেশায় রাঙিয়া এমনই মায়ার জাল বুনিয়া রাখে, সেই দিনগুলা আর কখন বিস্মৃতির কালো মেঘে ঢাকা পড়ে না। নীলিমা চির-অনাদৃত জীবনের পরে মস্ত বড় ধাক্কা খাইয়া এমন একটা স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল যে, সে স্থানের সঙ্গে তার পুরাতনের কোন স্থান দিয়াই কোন সংযোগ ছিল না, সে নূতন—সম্পূর্ণ নূতন! সেখানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, স্নেহ, প্রেম, সম্মান সমস্তই সে অপ্রত্যাশিতরূপে অপর্য্যাপ্ত লাভ করিয়াছিল, এত বেশীই পাইয়াছিল যে তত বেশী সে লইয়া উঠিতেই সমর্থ হইল না! তার পর সহসা আবার সমস্তই বদল হইয়া গেল! মিস্ রীচের কঠোর শাসন তাহাকে পুনর্মূষিক করিয়া দিল এবং এই ঘটনায় নিজের প্রকৃত মূল্য আজ কোথায় নামিয়া

আসিয়াছে, দেখিয়া সে আতঙ্কে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল—উচ্চ বংশজ খাঁটী আইরিশ-পরিবারের সহিত সমকক্ষ ভাবে বাস করিতে পাইয়া মিস্ ওকবর্ণের নিকট অসীম স্নেহলাভে ও তার উপর জর্জ্জ ওকবর্ণের সাহচর্য্য ও পরিশেষে বিবাহ প্রস্তাব পর্য্যন্ত লাভ করিয়া সে নিজের যথার্থ অবস্থা এতদিন বুঝিতে পারে নাই ; তার মনে হইয়াছিল, ইহা বুঝি খৃষ্টধর্ম্মেরই প্রভাব !—এ উদারতা—ও মহত্ত্ব—বুঝি সমস্তই খৃষ্টান জগতেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে ! যীশুর মানব-প্রেমে এদের চিত্ত স্বতঃই বুঝি ভরপুর !—কিন্তু মিস্ গোল্ডেনরীচের তীব্র 'নেটিব-বিদ্বেষ' সে বিশ্বাসকে অনেকখানি নাড়া দিল। তার পর লক্ষ্য পড়িল লাল কুঠীর আরও কয়েকটি ইংরাজ মহিলার প্রতি, মিস্ ওকবর্ণের সময়ে এরাই নীলিমাকে কত স্নেহাদর দেখাইয়াছেন ; তার অনন্যসাধারণ রূপের, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন ; তার নম্র ব্যবহারে—ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধবৎ হইয়াছেন ; আর আজ ইঁহারাই মিস্ রীচের বিরাগভয়েই হোক, অথবা স্বভাবজাতই হোক, তার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যবহার দেখাইতেছিলেন। তার স্বপক্ষে একটা কথাও কেহ ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষা হিসাবেও কহেন না বরং যথাসাধ্য নির্লিপ্ত এবং ঔদাস্যপূর্ণভাবে চলেন। নীলিমা দেখিল সকল জাতি এবং সকল সমাজেই মানব প্রকৃতি একইরূপ। ভালমন্দ ছোট বড় সর্ব্বদাই আছে, কোথাও নিছক ভাল এবং কোথাও নিছক মন্দ টিকিয়া থাকে না, সকল ধর্ম্মই মানুষকে ভাল হইতে শিখায়, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি তার মধ্য হইতে যেটুকু গ্রহণক্ষম হয়—সেই টুকুই গ্রহণ করে। নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সে যেটুকু লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে আশা তার ফুরাইয়া গেল, সেই সঙ্কীর্ণচিত্ততা—সেই হীন সন্দেহ—সেই ঘৃণা-বিদ্বিষ্ট জাতিভেদ !—তবে কিসের জন্য সে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল ?

নীলিমার সমস্ত চিত্ত তীব্র ঘৃণায় গুটাইয়া ছোট হইয়া গেল—যখন

লাল কুঠীর আশ্রয় ছাড়িয়া তাকে থাকিতে হইল অনাথাশ্রম ও স্কুল-বোর্ডিংয়ের মধ্যে। সেখানে খৃষ্টধর্ম্মীদের প্রতিশ্রুত ডোম, চামার, হাড়ি, মুচি, মুর্দ্দাফরাস প্রভৃতি ছত্রিশ জাতির একতা সাধিত হইয়া এক মানবতার সৃষ্টি হইতেছে বটে! ইহার মধ্যে অবৈধজাত মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশু, বৈধ-জাত অনাথ সকল ধর্ম্মীর সংমিশ্রণ এ সমস্তই আছে, আবার নীলিমার মত ভদ্রবংশীয়া ব্রাহ্মণকন্যা, বৈদ্যজায়া, কায়স্থ-মহিলা কেহ জুটিলে তাদেরও ভর্ত্তি হইতে হয়। ঘৃণায় নীলিমার গা বমি বমি করিতে লাগিল। চিরকালের সংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রথম প্রথম মিস্ ওকবর্ণের টেবিলে খাইতেও তার সংস্কারে বাধিত, তথাপি সে স্থানের পরিচ্ছন্নতা ও এদের ভদ্রবংশ আর সব কথা ঢাকা দিত, এখন তার নগ্ন রূপটা স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িতে লাগিল। একটা মেথরাণী কুঠীর 'কমঠ' সাফ করে—আবার সেই-ই আসিয়া বাবুর্চ্চিখানায় জাঁকাইয়া বসিয়া কট্‌লেট গড়িয়া দেয়, হাতটাও ধোয় না, বাবুর্চ্চিগুলা মাংস তুলিয়া চাখিয়া দেখে এবং বাকিটা রন্ধনপাত্রে ফেলিয়া দিয়া উচ্ছিষ্ট হাতেই রহিয়া যায়। নীলিমা এগুলা এত দিন না দেখিয়া খাইয়াছিল, চোখে দেখিয়া আহার স্পৃহা তার বিন্দুমাত্র রহিল না। তবে এখন আর তার এ সব আহার্য্যের ব্যবস্থাও ত নাই; মোটা চালের ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, কদাচিৎ একটু মুরগির মাংস, রান্নাও তেমনই কদর্য্য—একটা মুসলমানী, সহিসের নিকা-করা স্ত্রী, সেই তাদের রাঁধিয়া দেয়। একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া এক একখানা কলাইকরা সান্‌কি হাতে খাইতে যাইতে হয়—খাইবে কি, ঘৃণায় শরীর শিথিল হইয়া আসে, হাতের আঙ্গুল ভাতের গায়ে ঠেকিবে কি, খিল ধরিয়া গুটাইয়া যায়, তিন বেলা উপবাসী থাকিয়া অবশেষে অনেক কষ্টে গ্রাস কতক খাইয়া আসিয়া উহা উদ্গিরণ পূর্ব্বক নীলিমা নিজের বিছানায় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে

লাগিল—এমন করিয়া সে কয় দিন বাঁচিবে? না খাইয়া যে মানুষের বাঁচিয়া থাকা চলে না, সে শিক্ষা ত তার আগেই হইয়া গিয়াছে। এখন আর বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনই বা কি? বাঁচিয়া এই ঘৃণ্য জীবন বহন করা! মনে হইল, য়ুরোপীয়রা যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন করতালি পায়, সেগুলা একেবারেই ফাঁকি জাতিভেদ উহারা নিজেরা খুব বড় করিয়াই মানে—তবে অপরের জাতি নষ্ট করিয়া দেয়—জাতিভেদ না মানার ইহাই প্রকৃত অর্থ! যাদের উহারা খৃষ্টান করে, হোক ব্রাহ্মণ, আর হোক মেথর, তাদের এক ঘানি-গাছে ফেলিয়া দিব্য করিয়া মিশাইয়া দেয়! নিজেরা আভিজাত্য গর্ব্বে অন্ধ, নিজেদের আচার ব্যবহারে এতটুকু পরিবর্ত্তন করে না, কিন্তু অন্যের আভিজাত্য এদের চোখে ঘোরতর কুসংস্কার মাত্র! নীলিমাও স্কুল জীবনে এদের শিখান বুলি হৃদয়স্থ করিয়া নিজের দেশের সংস্কারকে 'কু' ধরিয়া লইয়াছিল, আজ তার মনে হইল, যদি একজন ভদ্র আইরিশ বা ইংরাজ যুবক কোন ভদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিলে 'ব্রিটিশ প্রেস্‌টিজ' নষ্ট হয়—ফলে যদি সেই দম্পতির সামাজিক অবনতি ঘটে—অর্থাৎ ক্লাব বন্ধ হয়, সেই স্ত্রীর কোথাও নিমন্ত্রণ হয় না, সরকার হইতে প্রমোসন বন্ধ থাকে—সমাজে নিন্দার পরিসীমা থাকে না, বাপ ত্যজ্যপুত্র করে—তবে হিন্দুরইবা নিজ ধর্ম্মের বা জাতির বাহিরে বিবাহ সমর্থন না করায় এতই কি পাপ? সমাজ থাকিলেই তার একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মও থাকে, বিভিন্ন সমাজের দোষ গুণ সকলেই সচেষ্টায় বর্জ্জন-ব্যবস্থা করে নতুবা সমাজ-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া আদিমকাল দেখা দেয়—যে সময় লোকে বিবাহও করিত না—পরন্তু সন্তানের জন্মাদিও হইত! আজ বড় অসময়েই মনে হইল, না জানিয়া না ভাবিয়া অনর্থক বড় বড় কথার মালা গাঁথিয়া যারা তরুণ চিত্তকে গরল মাথায়,

তারা তাদের কতবড় শক্র ! 'মহামানবত্ব' মুখের কথা নহে। 'প্রত্যেক মানবের মনে স্বাধীন চিন্তার উদয় না হইলে মুক্তি নাই'—এই সকল বাক্য উন্মাদের প্রলাপমাত্র ! উন্মাদ ব্যতীত কোন সুস্থ ব্যক্তি এমন আশা করিতেই পারে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবে ও স্বতন্ত্রভাবে চলিবে—সে এক মাত্র পাগ্‌লা গারদেই সম্ভব ও সঙ্গত—সাধারণতঃ স্থির মস্তিষ্ক নরনারীর জন্য মহাজনের অনুসৃত পথই অনুসরিতব্য এবং ইহাতেই মুক্তি—নতুবা তরুণ-তরুণীদলের প্রত্যেকের স্বাধীন চিন্তা ও স্বেচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে জগতে কোন সুমঙ্গল আনয়ন করিতে পারা একান্তই অসম্ভব !

নীলিমা গভীর বেদনায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ফাটাইয়া অনেক কান্নাই কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল সুশীলকে। আজ সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, তার সম্বন্ধে সুশীলের ব্যবহার হয় ত খুবই নিন্দার্হ ! তার বাপ যে কত মন্দ, তা কি সে জানিত ? কিন্তু উঃ—সুশীল তাকে বিবাহ করিলে আজ ত তার এতবড় দুর্গতি ঘটিত না !—স্বার্থপর সুশীল নিজের সুযোগটাই দেখিল, তার অবস্থা যে কি শোচনীয়, তাও ত তার দেখা উচিত ছিল ?

পাশের ঘরের চন্দ্রমুখী গুহ আসিয়া কাছে বসিল—"কি, এখনও প'ড়ে প'ড়ে কাঁদচো ?—তবেই তোমার হয়েচে ! নাও, উঠে বসো, মনটাকে শক্ত করো; কি করবে ? যখন এখানে পা দিয়েছ, তখন এই সব ত করতেই হবে। নিজে রেঁধে যে খাবে, কি আমিই দুটি রেঁধে দোব, তারও তো উপায় নেই। মেমরা সে মত দে'ন না, বলেন, 'ও সব কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে পারি না।' ওঁদের হাতে খাওয়ার-জাতি-ভেদটা নেই কি না ;—অবশ্য পাশে ব'সে কারুই খান না, নেহাৎ বাছা লোকটি না হ'লে ; তবে সেদ্ধ ক'রে যে দেয় দিক, তা'তে আপত্তি নেই,

—তাই এটা ওদের কাছে বড্ড ছোট জিনিষ! নিজে যা'না করি তাই ত মন্দ! তা' ভাই, খেতে খেতে আবার অভ্যাসও হয়ে যাবে। আমারই কি কম ঘেন্না করতো? তা'তে আবার আমি হিঁদুঘরের বিধবা ছিলুম, সাত বচ্ছর মাছ-ভাতই খাই নি।"

নীলিমা এই সহানুভূতির বাণী শুনিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল—নিজের দুঃখ যেন সে অকস্মাৎ ভুলিয়া গেল, সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, —"আপনি এখানে কি ক'রে এলেন? কেন এলেন?"

চন্দ্রমুখী দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল—"কেন এলুম?—কপালের লেখা ব'লে! আর কি ক'রে এলুম?—তার ইতিহাস এই—আমি এখানের উকীল প্রকাশ গুহর মেজো ভাদ্রবউ—আমার স্বামীর যখন মৃত্যু হয়, তখন আমার মেয়েটি সুধারাণী সাত বছরের। বাপের বাড়ী এক ভাই ছাড়া কেউ ছিল না, ভাইও তেমন নয়, আর ভাসুর বাপের বাড়ী যেতেও আমায় দেন নি, তাঁর বাড়ীতেই বরাবর ছিলুম। জায়ের আমার বছর বছর ছেলেপুলে হয়, নিজেও মাথার রোগে স্থতিকার রোগে অসমর্থ, সমস্ত সংসারের খরচপত্রের সমস্ত ভারই আমার হাতে। খাটতে হতো অবশ্য বড্ড বেশী, শরীর যেন বইতো না। এখন পাশের বাড়ী থেকে জানাশুনা হয়ে এঁরা আমাদের ওখানেও যেতে আরম্ভ করলেন। আমার বোনা শেখার খুব ঝোঁক ছিল; এটা সেটা শিখে নিতুম। বছর দুই ধরে এই আসা যাওয়া, প্রাইজ দেখতে মেয়েদের নিয়ে কুঠীতে আসা, এম্নি ক'রে ওদের ওপোর ভক্তিটা খুবই বেড়ে গেল! আর ওরাও এ দিকে ক্রমাগত ভজাচ্চে যে—যীশুভজ, চলে-এস, ওখানে থেকে দাসীর মত কেবল খাটছ, একাদশী করলে কারু মৃত স্বামীকে সম্মান দেখান হয় না, দেহকে অনর্থক ক্লেশ দিয়ে পাপ করা হয়—এ শুধু বিধবাদের দুর্ব্বল ক'রে, আধ-মারা করে রাখবার জন্যে সমাজের ফন্দি,

তার পর দেখ, তোমার মেয়ের ওখানে উচ্চশিক্ষা হবে না, হয়ত শিশুকালেই একটা অযোগ্য বিবাহ দিয়ে দেবে—এই সব নানান্ কথায় মনটাও ক্রমশঃ বিগড়ে গেল। মেয়ের জন্মেই মনে করেছিলুম যে, এতে বুঝি ওর বিশেষ কোন লাভ হবে, তাই এক রাত্রে ওদের সঙ্গেই লুকিয়ে পালিয়ে আসি। ওরা আমায় দুদিন ধরে লুকিয়ে রাখে, তার পর পাদরী এসে আমায় ও রাণীকে খৃষ্টান করে ছেড়ে দেয়। প্রথম প্রথম খুবই আদর দেখাত, সুধার জন্য খেলনা, পোষাক, খাবার কতই না দিত, ভাসুর আমার অনেক হাঙ্গামা করলেন, বল্লেন, 'বাড়ীতে নিতে পারবো না, তবে কাশীতে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেবো, ওখান থেকে চলে এস।' এরা বল্লে, তোমায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে।—ভয়ে গেলুম না। আর সত্যি কথা বলতে কি, তখনও তো নতুনের নেশা আমার ছোটে নি।—তার পর দেখতে দেখতে উপরের খোলস খুলে গেল!"

"আপনার এখন বাড়ীর জন্য দুঃখ হয়?"

"তা' হয় না? সেখানে সব্বাইকার উপরে ছিলুম, ভাসুর পর্য্যন্ত কোন পরামর্শটী না নিয়ে কাজ করতেন না, ছেলেমেয়ে সবই কাকীমা বলতে অজ্ঞান হতো, এক খাটুনী, তা এখানে খাটুনি কি কম? পয়সা রোজগার করবো, তবে ত পেট চালাবো? নৈলে তো আর কেউ বসিয়ে খাওয়াবে না ভাই! মাইনে ত মোটে সতেরটি টাকা, তা'তে দুজনের খাওয়া পরা সমস্ত চালানো কি মুখের কথা? তার উপর যেখানে একখানা ঠেঁটি প'রে চলতো, সেখানে নিজের গায়েই এতটি চড়াতে হবে, তার উপর আবার মেয়ে আছে।"—চন্দ্রমুখী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, "চলে কি ক'রে?"

"কি ক'রে? থাকতে থাকতেই দেখতে পাবে! দিনে রাতে যখনই সময় পাচ্ছি, মেসিন ঘুরাচ্ছি, নয় ত কাঠির বোনা, নয় ত সূচের

কাজ করছি। রাণীটার পড়াশুনা এখানে আর খুব বেশী কি হবে? যতটা হ'তে পারে, প্রাণপণে সে ক'রচেও। শরীরও ভাল নয়, নিত্যই ভোগে, সেও ক্রুশের কাজটা ভালরকম পারে, ওই সব বিক্রী করি, লেশটা অনেকেই নেয়, কাটা কাপড়ও বড় মন্দ বিকোয় না, এইতেই অনেকটা সাহায্য হয়। তা' তুমি কিছু জান ত? না জান ত শিখে নিও, আমি শেখাবো খন'। এ সব না করলে চলবে কি ক'রে? এদিকে অপরিচ্ছন্ন বা কম কাপড়ে চালাতে গেলেও বকুনি খাবে।"

নীলিমা চুপ করিয়া রহিল। তার মনে হইল, এর জন্য স্বধর্ম্মত্যাগের কোন প্রয়োজন আছে কি? তার মনে হইল, হিন্দু সমাজ যদি অন্ত্যজ জাতির উন্নতির জন্য একটু চেষ্টা করে?—প্রত্যেক সহরে এক একটা অনাথাশ্রম স্থাপিত হয়, আর নারীশিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়, তবে খৃষ্টান মিশনের কাজ অনেক কমিয়া যায়! অনাথ, পতিত অন্ত্যজের মধ্য হইতে খৃষ্টান হইলে অনেকখানি সুযোগ পায়, তাই তাদের এ বিষয়ে লোভ স্বাভাবিক। হিন্দু থাকিলে তাহারা এতখানিও পাইত না!—কিন্তু এই যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবা চন্দ্রমুখী গুহ অথবা নীলিমা চক্রবর্ত্তী—এরা কিসের লোভে প্রলোভন কাটাইতে পারে না? ঘরে এদের হয় ত অভাব ছিল, কিন্তু অভাবেই কি শুধু স্বভাব নষ্ট হয়? এর কারণ, তাদের ভিতরে অভাব ঘটিয়াছে শিক্ষার—ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা এবং উন্নত চরিত্রের সাহচর্য্যাভাবেই এদের মনে প্রলোভন কাটাইবার মত নৈতিক বলের অভাব ঘটিয়াছে! এর উপর ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্মী ও বিভিন্ন সমাজবাসীকে দূর হইতে বড় সুন্দর, বড় উজ্জ্বল, বড়ই উদার ঠেকে! এরা আবার তার উপর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যবান্! ধনীর ঘরের দিকে চোখ ফিরায়, সে কি তার মধ্যে কোন অভাব দেখিতে পায়? নীলিমার অশ্রু শুষ্ক দুই চোখ জ্বলন্ত হইয়া উঠিল—এর কি কোন প্রতিবিধান হয় না?

# ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন মিস্ রীচের অসুস্থতার জন্য তাঁর পরিবর্তে যিনি কাজ করিতেছিলেন, তিনি নীলিমাকে খবর পাঠাইয়াছেন, কলিকাতা হইতে তার এক জন বিশেষ আত্মীয় আসিয়াছেন, তিনি দেখা করিতে চান।

নীলিমা অবাক্ হইয়া গেল। তার আত্মীয় কে' আছে, যে, তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে? তার উপর আবার 'বিশেষ' আত্মীয়! জর্জ্জেরই প্রেরিত কেহ নয় ত? জিজ্ঞাসায় জানিল, আগন্তুক বাঙ্গালী-বাবু বয়সে তরুণ এবং গায়ের রং খুব ফরসা। তখন "কলিকাতা হইতে" কথাটা মনে জোর করিল। তাই ত, কলিকাতায় এক জন আত্মীয় তার আছেই ত?—সে তার ভাই শুভেন্দু। সেই হয় ত কেমন করিয়া সন্ধান পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছে—কিন্তু এটাও যেন বিশ্বাস করা কঠিন! শুভেন্দু তার খবর লইতে আসিবে, তার খোঁজ করিবে, এও কি সম্ভব?—কিন্তু এ ভিন্ন আর কি হইবে? আর একটা সম্ভাবনা মনে উঠিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল।

মনে একটু সুখ হইল। এ পৃথিবীকে জনহীন বলিয়া বোধ হইতে-ছিল, তবু একটি জীবের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে!

আশা আনন্দ ও আশঙ্কা বহন করিয়া নীলিমা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। দাদার যে প্রকৃতি সে তাকে কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া কোন্ ভাষায় সম্ভাষণ করিবে, ভাবিয়া ভীত হইয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু অনেক বেশী স্তম্ভিত হইল, তার কল্পনার পরাভবে! কে' সম্মুখে তার? শুভেন্দুর উগ্রমূর্ত্তি এবং তীক্ষ্ণ ভেদ্য বিদ্রূপ-বিষে ভরা ভীমরুলের হুলের মত বিঁধান বাক্য প্রত্যাশা করিয়া সেও নিজেকে তদুপযুক্ত কঠিন করিয়া লইয়াই

গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু প্রতীক্ষাকারীকে দেখিয়া বিস্ময়াভিহত হইয়া পিছাইয়া আসিল, শরীরধারী প্রাণীকে দেখিয়া এমন বিস্ময়াবিষ্ট বোধ করি ইহার পূর্ব্বে কেহ হয় নাই !

সুশীল ইহা বুঝিল। সেও অনেকখানি বিস্মিত হইয়াছিল, সে যে নীলিমাকে চিনিত, ইহাকে দেখিয়া চেনাই কঠিন! সে বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে উহাকে নিরীক্ষণ করিয়া চিনিল এ সেই বটে ! অসজ্জিত রুক্ষ কেশে চিক্কণ কালো চিকুরজালে পরিবর্ত্তিত হইয়া মাথার নবরুচি অনুযায়ী সুবৃহৎ বেণীতে নিবদ্ধ, রৌদ্রতপ্ত তামাটে রং খাঁটি সোনার মতই সমুজ্জ্বল, গালের গলার ও চিবুকের অস্থিগুলা কোথায় যেন লুকাইয়া পড়িয়া তাদের সুগোল ও সুডৌল করিয়া তুলিয়াছে, সুমসৃণ ও কোমল গণ্ডে রক্তের রং ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। গায়ে গোলাপী ছিটের হাল ফ্যাসানের শাড়ী জ্যাকেট, পায়ে চটিজুতা। এই অপূর্ব্ব রূপসী নারীকে কার সাধ্য বিশ্বাস করিতে পারে যে, এ সেই অনুকূল চক্রবর্ত্তীর মেয়ে নীলিমা চক্রবর্ত্তী !

নীলিমা অচল হইয়া পড়িল, তার মুখের উপর সমস্ত শরীরের রক্তোচ্ছ্বাসটা যেন উথলিয়া উঠিল, কপাল দিয়া চুল বহিয়া ঘামের ধারা ঝরিয়া পড়িল, কথা কহিতে পারিল না।

একটুখানি নড়িয়া দাঁড়াইয়া সুশীল কহিল, "আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।"

আগ্রহ বা অনাগ্রহ কণ্ঠে তার ধ্বনিত হইল না, বিস্ময়ের আমেজ যেটা ছিল সেটা আশ্চর্য্য দর্শনের সেই বিহ্বলতার জের একটু।

নীলিমা নতমুখ উঠাইয়া কম্পিত দৃষ্টি সুশীলের মুখে ন্যস্ত করিল। সুশীল বিচলিতভাবে আবার একটু নড়িয়া উঠিল, কহিল, "আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

সুশীলের কণ্ঠ এবার নীলিমার মুখভাবলক্ষ্যে একান্ত করুণা-কোমল হইয়া উঠিল।

নীলিমা দরজার কবাটে কম্পিত দেহভার রক্ষা করিল, শ্বাস লইতে অক্ষম-প্রায় বক্ষকে, শব্দোচ্চারণে প্রায়-অসমর্থ কণ্ঠকে এবং ভাষাহারা জিহ্বাকে কোনমতে স্ববশে আনিয়া অর্দ্ধস্ফুটে উচ্চারণ করিল, "আমায় নিয়ে যাবেন কেন ? কেন ?"

সুশীল নীলিমার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, সামান্য একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পর সংযত স্বরে কহিল, "আপাততঃ কাশীতে গিয়ে সে রাত্রের বাকী কায সেরে ফেলা যাবে, তার পর পরে স্থির হবে।"

সুশীলের কথার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া, নীলিমা সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দেখিয়া সুশীল কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল—"বুঝতে পারছো না ? আমাদের বিয়ে অর্দ্ধেক তো হয়েই ছিল, সেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করে ফেল্‌বো, সে দিন তোমায় যে অপমান করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসর আমায় দেবে কি নীলিমা ?"

নীলিমার পদনখ হইতে কেশাগ্র অবধি এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের শোণিত-স্তব্ধতায় হাত পা তার কঠিন ও নিশ্চল হইয়া পড়িল। মুখ তার প্রথমে মর্ম্মর শুভ্র হইয়া গিয়া, পরক্ষণে শরৎ মেঘের বিচিত্র খেলার মাঝেই ক্ষণে রক্ত, ক্ষণে শ্বেত ও পরিশেষে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল—এ' তার অদৃষ্টের কিরূপ পরিহাস ?

চেষ্টাস্মিত মুখে শান্তকণ্ঠেই বলিল, "আপনার বাগদত্তা স্ত্রী সুলেখা, এ কথা কেন বলছেন ?"

এইটুকু বলিতেই সে যেন নিজের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে বিক্ষত হইয়া উঠিল।

সুশীল কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, দেখিয়া নীলিমার হৃৎপিণ্ড সজোরে উঠিতে পড়িতে লাগিল।

ক্ষণ পরে একটা ক্ষুদ্র শ্বাস মোচন পূর্ব্বক সুশীল বিষাদিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "সে সব চুকে গেছে নীলিমা! সুলেখা আমার সঙ্গে পাওনাদেনা মিটিয়ে নিয়েছে। তারই আদেশে আমি এই সাত মাস তোমায় দেশদেশান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার বিশ্বাস, তুমিই আমার স্ত্রী।"

নীলিমার অর্দ্ধমূর্চ্ছিত চিত্তে বিষয়টা এইবার রূপ পরিস্ফুট হইল। —তাই বটে,—সুলেখার আদেশ! সে বিমুখী হইয়াছে বলিয়াই আজ এই একান্ত অসময়ে, জীবনের এই নিতান্ত অবেলায়, পরিত্যক্তা শুভানুধ্যায়ী—নীলিমাকে স্মরণ হইয়াছে? এ মহত্ব সুশীলের নয়—সুলেখার? সুশীলের মন প্রাণ যে আজও সুলেখাময়—ঐ মর্ম্মভেদী বিলাপবাণীই তার সাক্ষ্য! একটা হিংস্র ক্ষুব্ধ জ্বালাময় বিদ্রোহের বহ্নিশিখা নীলিমার বুকে রুদ্রতেজে জ্বলিয়া উঠিল, তার বুকের রক্ত দুলিয়া, ফেনাইয়া, মাতিয়া উঠিল, শোণিতের উষ্ণধারা সতেজে ছড়াইয়া পড়িয়া—তাহাকে রক্তালোকে উদ্ভাসিত প্রভাত সূর্য্যের মতই অগ্নিময়ী মনে হইল? আষাঢ়ের মেঘ পরিব্যাপ্ত আকাশের মত জলভরা দু'চোখে অশনি-ভরা, বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলো ঠিকরাইয়া উঠিল। ক্ষণকাল ঝটিকা-পূর্ব্বের স্তব্ধ, ক্রুদ্ধ, অশনিভরা মেঘের মত স্তব্ধ থাকিয়া বিদ্যুৎরেখার মত উদ্দীপ্ত নিষ্ঠুরকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "এই যে কৃপাটুকু কর্‌তে এসেছেন, আমার বেঁচে থাকার—এখানে থাকার খবর যার কাছে পেয়েছেন, সে কি আমার সব কথা বলেনি?"

সুশীলের মনে অনাগত আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়া বুক তার দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সন্দিগ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল, "জর্জ্জ ওকবর্ণ ব'লে এক জন পাদরীর কাছে তোমার খবর পেয়েছি, তিনি—"

"জর্জ্জ ওকবর্ণ! আশ্চর্য্য!—কোথায় দেখা হলো?"

সুশীল সব কথাই বলিল, পরিশেষে যে কথা জর্জ্জ নীলিমাকে বলিতে বলিয়াছিল, তাহাও বলিয়া এই কথা বলিল, "বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, ভেবে দেখেছি হয়ত এখনও আমরা সোজাপথে গেলে সুখীও হতে পারি। সেদিন তোমায় ফেলে না গেলেই হয়ত ভাল হতো, তোমায় আমি ভালও তো বাসি।"

এ' কি শুনিলি ওরে অভাগিনী। মরিয়া-বাঁচা তোর কি আজ সার্থক বোধ হইতেছে না? কিন্তু—এ কি অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনা! কিন্তু—জর্জ্জ যদি না বলিয়া থাকে—

নীলিমার অন্তরে বেদনার জ্বালাভরা বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল।—না, এ প্রলোভনে সে কান পাতিবে না।—রোষে নৈরাশ্যে বুক তার পুড়িয়া উঠিল। অভিমানের মন্দর-মথিত ক্ষুব্ধ তরঙ্গপ্রবল রোলে জীবন-সিন্ধু মন্থন করিল, পাংশু মুখ অরুণ বর্ণ ধারণ করিল—শ্লেষপ্রচ্ছাদিত কঠিন কণ্ঠে কহিল, "আমি খৃষ্টান, আমায় বিয়ে করলে জাত যাবে না আপনার?"

শুনিয়া সুশীল স্তম্ভিত বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা সুশীলের অবস্থা বুঝিল, ঝড়ের ঝঞ্ঝার মত একটা উন্মত্ত ক্রোধের তরঙ্গ তার বুকে আছড়াপাছড়ি করিতে লাগিল। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভুবনের উপর কোথা দিয়া কাহাকে আঘাত করিবে যেন খুঁজিয়া না পাইয়া তীব্র কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "আমায় বিয়ে করে হিন্দুত্বে ফিরিয়ে নিতে সাধ্য হবে না, আমার সঙ্গে নিজেকেই নেমে আসতে হবে।—কলির ব্রাহ্মণ—সে ব্রহ্মতেজ কোথায়—যাতে পতিতকে উদ্ধার করবেন! হিন্দুসমাজ ত্যাগের সমাজ—গ্রহণ করবার ত নয়! আমার ক্ষণিকের ভুলে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড আমায় বইতেই হবে।—ফিরে যাবার পথ নেই।

কিন্তু আমি কি আমার ধর্ম্মকে জানতে কোন সাহায্য আমার সমাজের কাছে পেয়েছি যে, তাকে না জানার জন্য—পাপী হব ? ঘরে ধর্ম্মশিক্ষা নেই—স্কুলে উল্টো শিক্ষা, তাতে যদি প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে কেউ একটা ভুল ক'রে আর কি সে ফেরার পথ পাবে না ? সে যদি ধর্ম্মকে দিয়ে গ্রহণ করতে না পারে ? তবে কেন সে সুযোগ পাবে না ?"

সুশীল অগ্রসর হইয়া আসিল, ধীর ও দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "নীলিমা ! অসঙ্কোচে চ'লে এস ; কথা দিচ্চি, পুরাতনকে ফিরিয়ে পাবে—হিন্দুর স্ত্রী হয়ে হিন্দুত্বে ফিরে আস্‌বে।"

নীলিমার প্রবল উত্তেজনা স্রোতের বেগে উপলখণ্ডের মত—ঝড়ের মুখে তূলারাশির মত—মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল। সে অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল, নিমেষ বিবর্ণা অশ্রুমুখী হইয়া যোড়হাতে ও নম্র কণ্ঠে কহিল, "আপনার এ দয়া আমার চিরকাল স্মরণ থাকবে, কিন্তু আপনি ত আপনার সমাজের সমাজপতি নন, আপনার এ দানকে লোকে হয়ত না বুঝে, লোভের পর্য্যায়ে ধ'রে নেবে।—আর আমি ? আমি জানবো, ভিক্ষা পেয়েছি !—ভিক্ষা !—দয়া !—তা'তে আমার তৃপ্তি হবে না। যদি সমাজ আমার ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'রে আমায় শুচি ক'রে নিজের কোলে ফিরিয়ে নেয়, তবেই আমি যেতে পারি, নৈলে জোর করে চুরি করে যাবোনা।"

সুশীল মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "তোমার জন্যে আমার কি কিছুই কর্‌বার নেই নীলিমা ?"

নীলিমা অন্তর্হিতপ্রায় মনে বল ফিরাইয়া আনিবার জন্য যুঝিতেছিল, প্রতিহিংসার হিংস্র আগুন মনের মধ্যে জ্বালাইয়া তাহারই দাহ জ্বালায় নিজেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, নিজেকে বলি দিয়া প্রতিশোধের একটা

উদ্দাম আনন্দ উপভোগ করিতেছিল—যে আনন্দ আত্মঘাতী মরণ-মুহূর্ত্তে প্রতিশোধ পাত্রের অনুতপ্ত মুখের পানে চাহিয়া উপভোগ করিয়া যায়, নীলিমাও সুশীলের চিত্তে তেমনই একটা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল, কিন্তু হায়! সেই সর্ব্বনাশী আনন্দ তার অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া তাকে লোভ-চঞ্চল করিয়া তুলিল। জমাট মেঘের গুমোট কাটিয়া জলের স্রোত নামে নামে হইল, কিন্তু তখনও সে নিজের সহিত বুঝিতে ছাড়িল না। সকল বাসনা-কামনা সাধ আকাঙ্ক্ষাকে পরাভব করিয়া অবিচল কণ্ঠে উত্তর করিল—"না।"

চলিয়া যাইবার জন্যই বোধ করি নীলিমা পিছনে ফিরিল। ফিরিল বটে, কিন্তু গেল না।

এই সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের অপমান সুশীলকে তীব্র হইয়া বিঁধিলেও নীলিমার প্রস্থানোদ্যত ভাব লক্ষ্যে একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া ব্যগ্র-ভাবে কহিয়া উঠিল, "আমার কিন্তু আরও কিছু বল্‌বার ছিল।"

নীলিমা ক্ষণকাল তদবস্থাতেই অপেক্ষা করিয়া সুশীলের দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়া অনিচ্ছুক ভাবে বর্ণ হীন বিকৃত মুখ ফিরাইল, স্খলিত কণ্ঠে কহিল, "বলুন।"

সুশীল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমায় বিয়ে যদি নাই কর, আমার সামান্য সাহায্য নিতে দোষ কি? আমার বোনের মতন থাকবে, আমার যথা সাধ্য আমি তোমার উন্নতির জন্য চেষ্টা করব। আমার সঙ্গে এস—এখানে কি সত্যিই তুমি সুখে আছ?"

এ কথায় রাগ করিবার কি আছে, না বুঝিলেও নীলিমার বুকের ভিতরে বাড়বাগ্নির প্রচণ্ড শিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে গেল, বহিঃপ্রকাশ রোধ করিলেও সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারিল না। আনত মুখ উন্নত করিয়াও প্রোজ্জ্বল নেত্রে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া সুস্পষ্ট

উচ্চারণে কহিল—"যে দিন আমায় আধ-খানা বিয়ে ক'রে ফেলে রেখে চ'লে গেছলেন সে দিনের চাইতেও কি আমায় আজ বেশী অসুখের মধ্যে দেখতে পেলেন? নিজের পথ আজ আমি নিজেই তৈরী ক'রে নিয়েছি, একজন নিঃসম্পর্কিয়ের কাছে ভিক্ষা নেবার জন্য অনর্থক ডাকাডাকি কেন করছেন? আর ত আমার দরকার নেই।"

নীলিমা এই যে কথাগুলা বলিল, এর মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত আঘাত ছিল না, কণ্ঠেও তার কলহ কাকলী ঝঙ্কৃত হয় নাই, তথাপি ঐ যথার্থ সত্যবাণী সুশীলের বুকে তপ্ত শেলের আঘাত করিল। কিছুক্ষণ বিমূঢ় থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখিত কণ্ঠে কহিল, "তা' হ'লে আমার কাছ থেকে কিছুই নেবে না?—থাক, যদি দরকার না থাকে, নেবেই বা কেন? আর —সত্যকথাই বলি, আমি নিজেই তো আজ পথের কুকুর—দেবোই বা কি?—কিন্তু একটা কথা ব'লে যাই নীলিমা! আমার বা তোমার বাপের অপরাধে তুমি তোমার সমাজধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে ভাল করনি। শত ত্রুটি থাকলেও এ তোমার নিজ ধর্ম্ম;—পিতৃ পিতামহ সেবিত নিজ সমাজ। এর যা' দোষ-ত্রুটি আছে, সে সমাজের বর্ত্তমান লোকদের দোষে, সেই দোষের সংশোধন চেষ্টা যার যতটুকু শক্তি, তাই দিয়ে করাই সঙ্গত—ত্যাগ করবে তাকে কি অধিকারে? আপনার জন মূর্খ হ'লে তাকে কি কেউ ফেলে দেয়?"

সুশীল আর অপেক্ষা না করিয়া নীলিমার পাশ দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। জীবনটাকে এতই নিরর্থক বোধ করিতেছিল যে, এমন ভাবে দাঁড়াইয়া ঐ সব কথা কহিতে সে যেন পারিতেছিল না। এখানের প্রয়োজন তার শেষ হইয়াছে—আর সেই সঙ্গেই অনুভূত হইল ইহ-জীবনের সকল কার্য্যই যেন তার সম্পূর্ণ হইয়া গেল!

# চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়া সুলেখা চিরাভ্যস্ত কার্য্যস্রোতে যখন নিজেকে যথা-পূর্ব্ব নিমগ্ন করিয়া দিল, তখন বিপ্রদাস বাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। দুর্দ্দান্ত বন্য পশুকে যেমন কখন কখন তার প্রতিপালকের কাছে শান্তমূর্ত্তি ধরিতে দেখা যায়, বিপ্রদাসের প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র অপত্যস্নেহ তাঁকে তার কাছে তেমনই নির্ব্বীর্য্য ও নিরীহ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুন্দরী তরুণী ভার্য্যা তাঁর নিরীহ প্রকৃতি দিয়া যে দুর্দ্দান্ত বাঘকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, এই শান্ত ও দীপ্ততেজা বালিকা সেই অঘটন ঘটাইয়াছিল। বিপ্রদাসের সকল কঠোরতা এইখানেই ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাই সুশীল-সম্বন্ধীয় দুর্ঘটনাময় দুঃসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই সুলেখা যখন জিদ করিয়া চলিয়া আসিল, বাধা দিতে ভরসা না করিলেও দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিলেন। সুলেখার কোমল প্রকৃতি তাঁর সুপরিচিত হইলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিরাগও যে তেমনি সুবিদিত! সে যদি সুশীলকে পাপী বলিয়া মনে করে তার সে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটান সহজ হইবে না। তাই বাড়ী ফিরিয়া মেয়েকে সহজভাবে নিজের স্থান গ্রহণ করিতে দেখিয়া যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। সত্যবতীকেও জানাইলেন না; পুরুষোচিত দুর্ব্বলতাকে সত্যবতীও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না।

অনুকূলের ব্যাপারটা মিটাইতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। মেয়ে নিরুদ্দিষ্টা, শ্মশানঘাটে জলে ডুবিয়া মরাই প্রমাণ দাঁড়ায়, অগত্যা নগদ দুই শত মাত্র টাকাতেই অনুকূল বিপ্রদাসের ভাবী জামাতার অনুকূলে এজাহার দিল। 'মেয়ের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না, সে এক খৃষ্টান যুবাকে বিবাহে ইচ্ছুক ছিল, তাই সুশীলকে সে-ই সে কথা জানাইয়া সরিয়া

পড়িবার সাহায্য করে, এবং জাতিচ্যুতির ভয়ে পিতাকে অন্য বরে বিবাহ দিতে উদ্যত দেখিয়া কান্নাকাটি দ্বারা মরণাপন্ন মায়ের মৃত্যু ঘটাইয়া সেই সুযোগে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, ইত্যাদি।

এ দিকের এই গোল মিটাইয়া বিপ্রদাস ভুবন বাবুকে বিবাহের দিন স্থির করিতে অনুরোধ জানাইলেন।

বেনারসের এক বড় ব্যবসাদার সাড়ী আনিয়াছিল, কয়েকখানা বাছাই করিয়া বিপ্রদাস অন্দরে পাঠাইলেন—সত্যবতী নিজে পছন্দ করিয়া মেয়েকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই টকটকে লাল সাড়ীতে বড় বড় জরির ঝাড় দেওয়া সাড়ীখানা বিয়ের জন্য রাখবো, তা'ছাড়া যা' যা' পছন্দ হয়, দেখ্।"

সুলেখা কাপড়গুলার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া শুষ্ক স্বরে উত্তর করিল, "কাপড় আমার একটাও পছন্দ নয় মা, সবই ফেরৎ দাও।"

মা বলিলেন, "সে কি রে? এমন চমৎকার কাপড়, তোর পছন্দ হলো না? সোনার তারের ওই নক্সাকাটা জংলা সাড়ীখানা সত্যি কি চমৎকার! এইটে আমি ফুলশয্যায় দোব! আটশো টাকা দাম, তা' হোক্ গে! রূপার তারে সোনার কাজ, আর নীল রংয়ের বাদলা সাড়ী দুখানা বাক্সয় দিতে লাগবে, ময়ূরকণ্ঠী রংটাও কিন্তু তোকে মানাবে খুব! ওখানাও নিতে হবে, সবই ত দেখছি সুন্দর?"

সুলেখা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আঙ্গুলে অঞ্চলপ্রান্ত জড়াইতেছিল, তেমনি থাকিয়াই ধরা গলায় জবাব দিল, "ও সব কেন বল্‌ছো মা? তুমি কি জানো না, বিয়ে হওয়া আমার এ জন্মে অসম্ভব! যা হবে না, তার মিথ্যা আলোচনায় ফল কি?"

সত্যবতী সাশ্চর্য্যে মুখ তুলিলেন, তাঁর কণ্ঠে ও নেত্রে সভয় সন্দেহ

ভরিয়া উঠিল, বিস্ময়বিহ্বলভাবে কহিয়া উঠিলেন, "সে কি লেখা! এ তুই কি বল্‌ছিস্, মা? বিয়ে অসম্ভব! কেন রে? কখন্ কি হলো এর মধ্যে?"

স্থলেখা একটু চকিত হইয়া মা'র দিকে চাহিল, তাঁর বড় বড় চোখে ব্যথিত বিস্ময়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া সে সবই বুঝিল, এবং বুঝিল বলিয়াই পিতার প্রতি মনটা তিক্ত হইয়া গেল। তিনি কিছুই তো হইলে মাকে জানান নাই!—আশ্চর্য্য!

নীরস শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, "বাবুজীকেই জিজ্ঞেস করো, তিনি যদি এখনও তোমায় না বল্‌তে পারেন, তা হ'লে আমিই বলবো, কিন্তু তাঁরই বলা উচিত ছিল, আমি তো তাঁর একলার মেয়ে নই!"

এই বলিয়াই সে চলিয়া গেল। মায়ের নিশ্চিত আশাভঙ্গের তীব্র বেদনা অনুভব করিয়া তার নিজের দৃঢ়তাও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, মায়ের সঙ্গ তাই সহিতে পারিতেছিল না, সে যে মায়ের এক সন্তান।

এ দিকে স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া সত্যবতীও জিদ ধরিলেন, এ অবস্থায় ওখানে কন্যাদান করিতে পারিবেন না—স্থলেখাকেও সেই কথা বলিলেন।—বলিলেন, স্থলেখার পিতা এখনও চিত্ত স্থির করিতে পারেন নাই বটে—তবে তিনি যেমন করিয়াই হোক এ বিষয়ে রাজী করিবেন। দেশে কি পাত্রের এতই অভাব ঘটিয়াছে যে, স্থলেখার মত মেয়েকে অমন অপাত্রের হাতে দিতে হইবে? সে তিনি থাকিতে ঘটিবে না। মায়ের মুখের আশ্বাস-বাণী শুনিয়া স্থলেখার মুখের কিন্তু বিন্দু-মাত্রও ভাবান্তর ঘটিল না, সে মায়ের দিকে স্থির-সিদ্ধান্তে ভরা অবিচল নেত্র দুটি তুলিয়া ধরিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি মনে কর্‌ছো, আবার আর এক জনের সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দেবে, আর তাই আমি করবো?"

সত্যবতী মেয়ের মুখের এই সুস্পষ্ট জেরায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া গেলেও মনোভাব গোপন করিয়া সহজভাবেই জবাব দিলেন—"সে কি? এক জনের সঙ্গে বিয়ের কথা হ'লে কি আর তার অন্যের সঙ্গে বিয়ে হয় না? একবার ছেড়ে শতবারও এমন বিয়ের সম্বন্ধ সর্ব্বাইকারই হয়ে থাকে।"

সুলেখা চোখের দৃষ্টি মায়ের মুখে তেম্‌নিভাবেই স্থির রাখিয়া কঠিন স্বরে কহিল—"আর যে যা' বলে বলুক, মা! তুমি আমায় ও কথা আর বলো না! সতী-সাধ্বীর মেয়ে আমি, আমায় আট বছর বয়স থেকে এক জনের কাছে উৎসর্গ করে রেখে আজ যদি তোমরা সে দান ফিরিয়ে নিয়ে অপরকে দিতে চাও, তোমরা না হয় দত্তাপহারী হবে কিন্তু আমি হবো—অসতী—তা'কি ভেবে দেখেছ?"

"লেখা! লেখা!—অমন কথা বলিস্‌নে!" মেয়ের কথায় সত্যবতীর বুকে যেন মুগুরের ঘা পড়িল। আর্ত্তরব করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে গেলেন—"বিয়ে ত আমরা দিইনি, শুধু মুখের কথাই দিয়েছিলুম তার জন্য—"

সুলেখার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদে ম্লান হইয়া গেল, সে এবার মায়ের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক নতনেত্রে মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "তোমাদের পক্ষে হয় ত সেটা শুধু মুখের কথাই হবে মা! কিন্তু আমি ত তাকে মুখের কথাই মনে করতে পারিনি! এতদিন ধরে যে বাড়ীকে আমার শ্বশুরবাড়ী ভেবে এসেছি, যাকে আমার—"

সুলেখার আকুল কণ্ঠ অস্ফুট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া আসিয়াছিল, আবার সেই মূর্চ্ছিত মূর্চ্ছনাকে সন্তর্পণে জাগাইয়া তুলিয়া সে নিজের বক্তব্য সমাধা করিল, কোন বাধাই মানিতে পারিল না;—"যাকে আমার

স্বামী ভেবেছি, কেমন ক'রে সেই সমস্ত বদলে—আর এক জনকে আবার তারই জায়গায়—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে যেন সেই সম্ভাবনা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া সচমকে বলিল, "তা' কোন মতেই হবে না, মা! আর কারুকে বিয়ের কথা মনে হ'লে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়—সে কিছুতেই পারবো না। বাবাকে তুমি বুঝিয়ে বলো, তুমি বুঝতে পারছো তো যে, সে হ'তে পারে না?"

মেয়ের সতীত্বের প্রভাবদীপ্ত অনৈসর্গিক মুখের দিকে অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া সত্যবতী মূর্ত্তির মতই স্তব্ধ রহিলেন। তার প্রত্যেক কথাটি যেন অনির্ব্বচনীয় সত্য, সঙ্কল্পে সুদৃঢ় ও অকাট্য। সতী নারীর অন্তর দিয়া ইহার যৌক্তিকতাকেও তিনি তো অস্বীকার করিতে পারেন না!

এর পর সুলেখার মা বাপে মিলিয়া কি পরামর্শ হইল, জানা নাই, কিন্তু সুলেখার মায়ের পাত্রান্তরে কন্যাদানের সঙ্কল্প শিথিল হইয়া গেল। এক দিন কথায় কথায় আবার এই কথাটাই তুলিলেন। একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "তা হ'লে সুশীলের সঙ্গেই বিয়ে হোক, এঁর ত বরাবরই সেই ইচ্ছে, বলেন, বিয়ে হলেই সব শুধরে যাবে, তাই বা কি, খবর নিয়েও তো জেনেছেন, তা'তে তার দোষও ছিল না, হতভাগা ছোট লোকটা ফন্দি করে ওকে—"

শুনিয়া সুলেখা বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত ছিটকাইয়া উঠিয়া তেমনই জ্বালাভরা ত্বরিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ও কথা আমায় বলো না মা! বিয়ে আমার হওয়া সম্ভব নয়! যার মাথায় অত বড় কলঙ্কের বোঝা, তাকে তোমরা কোন্ হিসেবে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও?"

মা তখন ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "তবে আমরা কি কর্‌তে পারি, তাই বল্ মা? ওকেও বিয়ে করবি না, অন্যকেও না, এর কি উপায় করি লেখা?"

স্নলেখা মৃদু শ্বাস লইয়া উদাস কণ্ঠে উত্তর করিল, "তাই ত বল্ছি মা, এর কোন উপায় নেই! তাই বলছি এমনই করেই কাটাতে দাও মা, আমায়। করবার পথ কি আছে যে, করবে তোমরা?"

"চিরদিন আইবুড় থাকবি তুই? লোকে কি বল্‌বে স্নলু?"

স্নলেখা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "আর যা' বলে বলুক মা? তোমার মেয়েকে দ্বিচারিণী তো কেউ বল্‌বে না—হিঁদুর মেয়ের পক্ষে সেই যথেষ্ট!"

সত্যবতী বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহে কত সাধ, কত আশাই যে তিনি মনের মধ্যে রাখিয়াছিলেন! উঃ, পৃথিবীটা কি? যেখানে বেশী আশা সেইখানেই কি সেই ওজনের মাপে মাপিয়া নিরাশার নিরানন্দ পুঞ্জীভূত হইয়া জমিয়া উঠে? কে' জানিত তাঁর অত আদরের স্নলেখার ভাগ্যে এমন ধারা বিড়ম্বনা লেখা ছিল।

বিপ্রদাস বাবু নিজেও বিধিমতে মেয়েকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন স্নলেখার এ যে একেবারেই অস্তিত্বহীন অনাবশ্যক খেয়ালমাত্র—তাহা তিনি বহু প্রকারের যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্নলেখার শান্ত মুখে সেই একটু বিনীত অথচ সুদৃঢ় বাণী—"আমি মাকে সব কথা বলেছি বাবা, তিনি আমার হয়ে আপনাকে বুঝাবেন।"

এর আর রদ-বদল হইল না। মা মনের দুঃখে অশ্রুপাত সম্বরণ করিলেন, পিতা ক্রোধ-কঠিন মুখে নীরব দৃঢ়তায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া রহিলেন—শুধু তার সারা চিত্ত অসহ্য ক্রন্দনে ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া নীরব হাহাকারে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "তোমায় যত দূরেই ঠেলে ফেলি না কেন, তুমি আমারই!—তুমি আমারই! তুমি আমারই!"

# পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সুশীতল বর্ষাধারায় চোখের জলের তপ্তধারা মিশাইয়া দিয়া নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি অবসানে ক্লান্তদেহে শ্রান্তচিত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই দাসী আসিয়া একখানা খামে মোড়া চিঠি সুলেখার হাতে দিয়া বলিল, "ডাকপিয়ন ভোরের বেলা দিয়ে গেছলো, আপনি ওঠেন নি ব'লে এতক্ষণ দিইনি।" মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, "জামাই বাবুর চিঠি না দিদিমণি?"

সুলেখার চিন্তা ম্লান পাণ্ডু মুখ এই ইঙ্গিতে একবারের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সেই আকস্মিক তপ্ত শোণিতোচ্ছ্বাসটা একেবারে নিঃশেষে যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়া তার সেই বেদনাপাণ্ডুর মুখখানাকে কে' যেন এক পোঁচ হলদে রং মাখাইয়া দিল। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মাটির ঠাকুরের সুগঠিত মুখকে যেমন দেখায়—সুলেখার সুন্দর মুখখানাকেও ঠিক তেমনই প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইল। একটু একটু করিয়া তার মধ্য হইতে জীবনের তেজ যেন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। দাসী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে, সে এক পা এক পা করিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছা-মন্থর গতিতেই নিজের সদ্য পরিত্যক্ত শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বারে খিল লাগাইয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিতেও তার যেন ভরসা হইতেছিল না, মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল, বাহিরের দিক হইতে হাতের আঙ্গুলগুলা যেন ততই শিথিল হইয়া গিয়া তাহাকে ঐটুকু সহায়তা করিতেও অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তার কেবলই যেন ভয় করিতে লাগিল, চিঠি

খুলিয়া সে হয় ত দেখিবে, সুশীল লিখিয়াছে—তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং এখন সে সুশীলের বিবাহিতা স্ত্রী—এই দুটো খবরই যেন সুলেখার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। একে সুশীলের দ্বারা একটি নারী-হত্যার সহায়তা হওয়ায় তার আশা—তার চিন্তা—তার প্রতীক্ষা ইহ-পরলোকে চিরদিনের মত নিঃশেষ!—আর অপরে এ জন্মের মত তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধের উচ্ছেদ!

কিন্তু হোক তা, চিরদিনের মত হারাণোর চেয়ে বুঝি সেও ভাল। তবু ত সুলেখা নীলিমার স্বামীর চিন্তা করিয়াও জীবনের দিনগুলা এক রকমে কাটাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এই চিন্তা করিতেই সহসা সুলেখার সমস্ত জীবনটাই যেন শূন্যময় হইয়া গেল। তার মনে হইল, এর পর লোকসমাজে আর বুঝি সে নিজেকে কোনদিন বাহির করিতেই পারিবে না—এমন কি নিজের মা বাপের সাক্ষাতেও না।

এই পত্র আসার সংবাদে মা আসিয়া যখন নিঃশব্দ প্রশ্নে ব্যথিত দৃষ্টি ভরিয়া তার কাছে দাঁড়াইবেন, তখন তাঁকে সে কি উত্তর দিবে, তাহা হাতড়াইয়াও খুঁজিয়া পাইল না। নিজেকে সে ত শেষ করিয়াই দিয়াছে; কিন্তু বাপ মায়ের যে কত বড় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ হইয়াই জন্মিয়াছিল, সেই কথা ভাবিয়াই আজ বুক তার ফাটিতে লাগিল। এই প্রকার অনিশ্চিত মানসিক অবস্থায় পড়িয়া সে বহুক্ষণ চিঠিখানা খুলিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। যেন. উহার মধ্যে একটা বিষধর কালসর্প লুক্কায়িত রহিয়াছে, খুলিতে গেলে সে তাহাকে ছোবল মারিবে!

বর্ষাদিনের ক্ষণিক সূর্য্য প্রকাশ ইতোমধ্যেই কজ্জল-কৃষ্ণ মেঘব্যাপ্তিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্যামল জলদের ঘনচ্ছায়ায় বিশাল বিশ্বকে সঙ্কীর্ণতর প্রতীয়মান হইতেছিল। গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে ঘর বাড়ী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সুলেখা পত্রহস্তে সেইরূপ গুরু স্পন্দিত

বক্ষে মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে ফুটন্ত কদম্বগাছের উপর দিয়া প্রমত্ত পবন যেন তাহারই গোপন-সঞ্চিত বেদনা বহিয়া আর্ত্ত হা' হা' রব তুলিয়াছিল। তাহারই নির্ম্মম পীড়নে ফুটন্ত কদম্বকেশর বিরহিণী নারীর অশ্রু-বরিষণের মতই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঝড়ের হাওয়া জানালা দিয়া ঝরা পাতা, খসা পাপ্‌ড়ি অজস্র পরিমাণে উড়াইয়া আনিল।—সুশীলের সে পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ;—

"সবিনয় নিবেদন,

তোমার অনুমানই সত্য, নীলিমা মরে নাই—বাঁচিয়াই আছে।"—সুলেখার হৃৎপিণ্ড সহসা দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল, আঃ, তবে সুশীলের কার্য্য নারী-হত্যার সহায়ক হয় নাই ? ওঃ ভগবান্!—পরক্ষণেই চলন্ত মেঘের কবলে পতিত সূর্য্যালোকের প্রভার মতই তার সেই আকস্মিক লোহিত সমুজ্জ্বলতা মসীময় হইয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল, তার চারিদিক বেড়িয়া একটা প্রলয়-রাত্রির বীভৎস দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। প্রমত্ত-প্রমথের চরণভঙ্গে তার বুকের পাঁজরাগুলা শুদ্ধ যেন মড়মড়িয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল !

প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া সুলেখা আবার পড়িল—"সে এখন * * * এর মিশনে বাস করিতেছে। সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, আমার প্রস্তাব সে গ্রহণ করে নাই এবং সে এখন দীক্ষিত খৃশ্চান—"

সুলেখার হাত হইতে পত্রখানা স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তার মনে হইল সেও যেন মাথা ঘুরিয়া এখনি পড়িয়া যাইবে। তার বুকের মধ্যে একসঙ্গে দুই দিক হইতে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের বন্যা দুকূল প্লাবিত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিল। হর্ষ ও শোক, আশা ও নিরাশা, আগ্রহ ও নিরুদ্যমতা এই উভয়ে মিলিয়া তাহাকে যেন

একইক্ষণে পীড়িত ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে লাগিল। নীলিমার ঐ প্রকার একটা ভুল পরিণতিই যে শেষ পর্য্যন্ত ঘটিল, সে জন্য তার এই দুঃখবোধ, কিন্তু সেটা যে আরও বেশী মন্দ হয় নাই এবং সুশীল যে তার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত চেষ্টা করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিতে পারিল, সেই আনন্দে তার সকল দিনের সকল কষ্টই যেন সে ভুলিয়া যাইতে বসিল। চিঠিখানার শেষ পর্য্যন্ত আর সে মন দিয়া পড়িবার দরকার মনেও করিল না, সে কথা আর মনেই রহিল না, কেবল এতদিন ধরিয়া সে সুশীলের প্রতি যে সকল নির্ম্মম ও কঠোর ব্যবহারগুলা করিয়া আসিয়াছে, সেইগুলার কথাই মনে করিয়া এখন তার মর্ম্মের বাঁধন যেন চড়চড় করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। সে একটুখানি সুখের সহিত বিগত বিরাট শোকের বিপুল অশ্রু একত্র করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার মনে হইল, এই জ্বলন্ত স্মৃতি তাদের মাঝখানে যে পাষাণ-প্রাচীর তুলিয়াছিল, ইহাকে ভাঙ্গিয়া আর কি কখন এ ব্যবধান দূর করিতে পারা যাইবে? না, না—সে দুরাশা! যা গিয়াছে, তা আর ফিরিবে না। কিন্তু—কিন্তু তবু—তবু কি সুশীলের সে দিনের সে নিগ্রহ সে কখন ভুলিতে পারিবে? পাপ ত করে অনেকেই, প্রায়শ্চিত্ত করে ক'জনে? সুলেখার আদেশের এ সম্মান আর কে' রাখিত? হায় হায়—কি দুর্ভাগিনী সে, এমন স্বামী হারাইল!

# ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন নীলিমার সহিত সাক্ষাতের পর সুশীলের মনে হইল, এ জন্মের মত তার সকল কার্য্যই সমাধা হইয়া গিয়াছে, অতঃপর এ পৃথিবীতে আর কিছুই তার করিবার নাই। মনে হইল এখন এই অনাবশ্যক জীবনের গুরু ভারটা তার বহিয়া বেড়াইলেও চলে, না বহিলেও কিছু আসে যায় না। বর্ষার নদী গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে শুকাইয়া গিয়া ক্রমেই যেমন দুই ধারে বিস্তৃত বালুকারাশির অভ্যন্তরে মিলাইয়া আসিতে থাকে, সুশীলের শ্রাবণ-গঙ্গার মতই কূলপ্লাবী স্নেহ-প্রেমে ভরা ভক্তি প্রীতি পরিপূর্ণ উদার চিত্তও এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত প্রতিঘাতে তেমনি শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্ব সুখের আধার স্থল এই আনন্দময় বিশ্ব-জগৎ তার মনের কাছে একখানা কালো কয়লার চেয়ে আর এতটুকু আনন্দপ্রদ ছিল না। তার সারা চিত্ত নিদারুণ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া এখানের সমুদয় কারবার তুলিয়া দিয়া একটা বিরাম শয্যা খুঁজিতেছিল; আর যেন সে পারিতেছিল না।

বাড়ী ফেরায় প্রবৃত্তি নাই, দূরে—দূরে—দূর হইতে দূরান্তরে—পৃথিবীর কোন নিভৃত প্রান্তে আত্মগোপন করিয়া, জীবনের এই অন্ধকারময় দিনগুলাকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে তার অপমান-পীড়িত আহত অন্তরাত্মা তাকে উগ্র আগ্রহে প্রলোভিত করিতে লাগিল। করাচী হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া সাউথ আফ্রিকা বা আরও কোন সুদূর অজ্ঞাত অখ্যাত রাজ্যে অসভ্য বন্যদিগের মধ্যে আত্মনির্ব্বাসন দিতে সে মনে মনে বদ্ধ পরিকর হইতেই সহসা পরিত্যক্ত গৃহে একটিমাত্র দীপশিখার প্রতি অশ্রু-অন্ধ নেত্রের দৃষ্টি নিপতিত হইল। যে মাতৃ-প্রতিমা পিসীমা—মাতৃ-

স্নেহের নির্ঝর ঢালিয়া মাতৃহীন তাহাকে পালন করিয়াছেন, সেই একমাত্র বিশ্বস্ত স্নেহ আজও তার জন্য অকলুষিত আছে। তিনি যে আজও মাথা খাড়া করিয়া বলিতেছেন, "কখন না, আমার সুশীল সে ছেলে নয়, প্রাণ দিবে, তবু সে এতটুকু অন্যায় করিবে না—এ আমি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলবো!" সেই মহিমময়ী মায়ের কথা কি সুশীল জীবনের শেষ দিনেও ভুলিবে? এ পৃথিবীতে আজ সে নিঃস্ব নিঃসহায় ফকির! কারও কাছে কোন সম্বল তার নাই, তাই এইটুকু পাওনা তার পক্ষে আজ সাত রাজার ধনের মতই অমূল্য। তাঁর পায়ের ধূলাটুকু যে তাকে সঞ্চয় করিতেই হইবে। সুশীল বাড়ী ফিরিল। মনের অতি নিভৃত কোণে আরও কাহারও দর্শনাকাঙ্ক্ষাও হয় ত অতি সূক্ষ্মভাবেই লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু সে কথা সে নিজের মনকেও ভাল করিয়া জানিতে দিল না, দিলে অভিমানের সহিত দ্বিধাদ্বন্দ্বে হয় ত বা তাহারই জয়পতাকা খাড়া হইয়া উঠিতে পারে, বুঝি বা মনে সে ভয়ও তার ছিল।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া বুক তার ধ্বসিয়া পড়িল। পিতা তার জরা-বার্দ্ধক্যে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। নিজের ঘর হইতে বাহির হন না, দৃষ্টি একান্ত ক্ষীণ, কণ্ঠের অতি বিরল স্বর তদপেক্ষাও ক্ষীণতর। সুশীল গিয়া প্রণাম করিতে তাঁর ঠোঁট একটু কাঁপিল, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। অসংবরণীয় মর্ম্মভেদী ব্যথায় অভিমানী বালক বেত্রাহত অপরাধীর মত আর্ত্তবক্ষে ফিরিয়া আসিয়া নির্জ্জন ঘরের আলু থালু বিছানার উপর নিজেকে বিবশভাবে লুটাইয়া দিল। না, না, এমন করিয়া সে বাঁচিতে পারিবে না—এ অসহ্য, এ অসহ্য, এর চেয়ে শতবার মৃত্যু ভাল!

চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া কেহ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, কাছে আসিয়া সংশয় ভীতকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "সুশীল!"

গলা তার এতই কাঁপিতেছিল যে, কার যে সেই কণ্ঠস্বর, তাও যেন চেনা যায় না! বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া সুশীল ততোধিক বিস্ময়ের সহিত অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিল, "শুভুদা!"

সুশীলের বুকটা নিমিষে ধ্বক্ করিয়া উঠিল। না জানি, আজ আবার কি উদ্দেশ্যে শুভেন্দুর আগমন! তথাপি মন কিন্তু সুশীলের তেমন ভাবে আর শঙ্কিত হইল না। ভয় ভাবনা, লজ্জাতঙ্ক আজ সবই যে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। কারও কোন অন্যায়ে অবিচারে, কোন অমানুষিক অপ্রত্যাশিত অত্যাচারে তার আর এখন কিছুমাত্র যায় আসে না। ক্ষতি তার যা হইবার, সে ত সবই হইয়া চুকিয়াছে। বেশী করিয়া আর কি হইবে?

শুভেন্দু কিন্তু আজ সে ভাবের কিছুই দেখাইল না। সে ছুটিয়া আসিয়া সুশীলের পা দু'খানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ভয়ার্ত্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "সুশীল! সুশীল! আমায় বাঁচাও! আমায় বাঁচাও ভাই!"

শুভেন্দুর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সুশীলের বিস্ময় সীমাতিক্রম করিল। ইহাকে সে তার চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া গালি দিতে দিতে প্রহার করিতে দেখিলেও ইহার অর্দ্ধেকটুকুও আশ্চর্য্য হইত কি না সন্দেহ! কিন্তু এই যে তার পায়ে ধরিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে দেখিল ও শুনিল, ইহাতে সে বিস্ময়-সাগরের তলদেশে তলাইয়া গেল। বহুক্ষণ মুখ দিয়া তার ভাষা সরিল না, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তাহাকে উঠাইবার চেষ্টার সঙ্গে স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করছো কেন শুভুদা? কি হয়েছে?"

শুভেন্দু ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, "পুলিশ এসে আমায় ধরেছে। চার্জ্জ গুরুতর, জাল সইতে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বার

করা—এখনই আমায় নিয়ে যাবে, তুমি আমায় বাঁচাও ভাই! তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবে না।" শুভেন্দু গম্ভীর ক্রন্দনে ফুলিতে ও হাঁপাইতে লাগিল।

সুশীল তখনই অতীতের সব কথা ভুলিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া শুভেন্দুর গায়ে হাত দিয়া সস্নেহে সযত্নে সান্ত্বনা দিতে চাহিয়া কহিতে লাগিল, "তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন শুভুদা? জাল ত আর তুমি কর নি, সে ত অনায়াসেই প্রমাণ হয়ে যেতে পারবে। বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টারের অভাব হবে না—"

সহসা ভূতাহতবৎ সুশীল শুভেন্দুর হাত ছাড়িয়া দিয়া পিছাইয়া গেল। কি ভীষণ ও অকথ্য লজ্জা পূর্ণ ইঙ্গিত সেই মুহূর্ত্তে শুভেন্দুর দৃষ্টিমধ্যে সে লক্ষ্য করিল! সুশীলের চারিদিকের বিশ্বসংসার বিরাট লজ্জায় যেন নিকষ পাথরের মতই নিবিড় কালো হইয়া গেল।

শুভেন্দু উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া সুশীলের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। "আমি সাধ করে কিছু করি নি সুশীল! তোমার বোনকে বিয়ে ক'রেই আমি মারা গেলুম। সেই এ বাড়ী থেকে আমায় জোর ক'রে বার ক'রে নিয়ে গেল, তার এখানে থাকতে লজ্জা করে। মোটে আড়াই শো খানি টাকা তোমার বাবা আমাদের দেন, এতে কি কুলোয় সুশীল? তুমিই বল? এ দিকে রোজগার করি না ব'লে বিনতা চব্বিশ ঘণ্টা আমায় খোঁটা দিচ্ছে, তাই না ব্যবসা করবো ব'লে আমায় ঐ ২৫০০০৲ হাজার টাকা আপাততঃ নিতে হয়েছিল। ভেবেছিলুম, লাভ হ'লে ওটা ফিরিয়ে দোব। কিন্তু মোটর কেনায় আর সংসার খরচেই সব ফুরিয়ে গেল। ব্যবসা করা হলো কৈ, বিনতাকে খুসী করবো ভেবে তাকে বলেছিলুম যে, টাকা আমি ব্যবসা করে পাচ্ছি। এমন সময় এই ব্যাপার! এখন

কি হবে ভাই? আমি মরতে তোমাদের বাড়ী এসেই জন্মের মত গেলুম। এর চাইতে গরীব হয়ে থাকাও আমার ঢের ভাল ছিল।”

শুভেন্দু হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বিনতার উদ্দেশ্যে একটা অকথ্য লঘুভাষা প্রয়োগ করিল। তাহা শুনিয়া সুশীলের সর্ব্বশরীর ঘৃণায় ও বিরক্তিতে ঝিন্ ঝিন্ করিয়া উঠিল। তার মনে হইল, এর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেও তার অন্তরাত্মা সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। আর এ তাহারই ভগ্নীপতি।—বোন্ তার মরিল না কেন!

সুশীলকে বাক্য-বিমুখ দেখিয়া শুভেন্দু রাগে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু আজ আর ক্রোধ প্রকাশ করিবার ভরসা তার নাই, তাই কোন মতে নিজেকে শান্ত করিয়া শ্লেষ গম্ভীর স্বরে অনড় অস্পন্দ সুশীলের বুকের উপর সজোরে খড়্গাঘাত করিল।

“আমার মরণে তোমাদের আপত্তি নেই—তা’ আমি জানি বরং তা হ’লে নিশ্চিন্ত হয়ে বোনের আর একটা ভাল দেখে বিয়েও দিতে পারবে, এ’ও হয়ত তোমরা মনে ক’রে খুসী হচ্ছ, তাও বুঝলুম!—কিন্তু তোমার অভিমানী বোন কি এ অপমানের পর বেঁচে থাক্‌বে? গর্ভে তার সাত মাসের সন্তান, এ অবস্থায় যদি সে আত্মহত্যা করেই মরে—”

সুশীলের অবিচল দেহ সঘনে কাঁপিয়া উঠিল, অতিকষ্টে সে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কি করতে পারি?”

শুভেন্দু বিজয়ী বীরের মত সদম্ভে বারেক সুশীলের শব-শুভ্র মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, “আমার দোষটা তুমি নিজের ব’লে স্বীকার ক’রে নাও। তোমার বাবা তো তোমায় পুলিসে যেতে দেবেন না। তাঁরই ত টাকা—তিনি মকদ্দমা তুলে নিলে কে

চালাবে? এইটুকু উপকার কর ভাই, তোমার পায়ে আমি চিরদিনের মত গোলাম হয়ে থাকবো ব'লে দিলুম—এ তুমি দেখে নিও। আর তোমার বোনের প্রাণটা হয় ত এ'তে রক্ষা পাবে। আমায় দোষী জানলে সে নিশ্চয় মরবে জেনো। তাকে কি তুমি চেনো না?"

সুশীলের রক্তশূন্য মুখে তীব্র বেদনার সহিত অকথ্য ঘৃণার রাশি অসীম হইয়া ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠে তার অতি সহজ শান্তভাবেই উত্তর বাহির হইল, "তাই হবে।"

* * * * *

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে আসিয়া সেলাম দিয়া যখন ভুবন বাবুকে চেক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই চেক এবং চেকের উপরকার নামসই তাঁহার কি না?

বিস্ময়মূঢ় ভুবন বাবু তখন এ প্রশ্নের অর্থবোধ করিতে না পারিয়া নিঃসংশয়েই উত্তর দিয়াছিলেন, চেক তাঁরই বটে; তবে নাম সইয়ে কিছু গলদ আছে, নিশ্চিতই উহা তাঁর হাতের সহি নয়। চেক-বহি বাহির করিয়া দুই জনে মিলিয়া তাহা মিলান করা হয় এবং অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কেহ তাঁর চেক ছিঁড়িয়া লইয়া জাল-সইয়ে টাকা বাহির করিয়াছে। ব্যাঙ্কের মনে হঠাৎ এই সন্দেহ হওয়াতে তারা পুলিসে খবর দিয়াছিল। ভুবন বাবু কিন্তু তখন স্বপ্নেও জানিতেন না, সেই অনুসন্ধান ফলে তাঁরই এত বড় সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে!

* * * * *

সুশীল আসিয়া যখন পুলিস-সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে বলিল, "শুভেন্দু নয়—আমিই জাল করেছি, আমাকেই আপনারা চালান দিতে পারেন।"

তখন সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সাহেব

বিস্মিত মৃদু স্বরে আত্মগতভাবেই কহিলেন, "শুভেন্দু বাবু আমাদের এই কথাই বলেছিলেন বটে, যে, খুব সম্ভব এ সই সুশীলের। কিন্তু আপনি শিক্ষিত লোক সে জন্য আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করি নাই।"

সুশীল জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া উত্তর করিল, "যেটা পৃথিবীতে সব চেয়ে অবিশ্বাস্য, কোন্ সময় সেইটাই হয় ত সব চেয়ে বিশ্বাসের হয়ে দাঁড়ায়।—চলুন কোথায় যেতে হবে।"

পুলিসের কাজে যে ব্যক্তি মাথার চুল পাকাইয়াছে, তার কাছে দোষী নির্দ্দোষ সহজেই ধরা পড়ে। ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুলিস সাহেব ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি হয় ত জানেন না, যে চার্জ্জে নিজেকে জড়িত কচ্ছেন, তার দণ্ড কত বেশী।"

সুশীল পুনশ্চ সেইরূপ বুকফাটা উচ্চ হাসি হাসিল—হাসিয়া কহিল, "জানি বৈ কি! হয়ত যাবজ্জীবনও হ'তে পারে, তাই না?—চলুন।"

ভুবন বাবু দুই হাতে মুখ লুকাইয়া পাথরের মত স্থির বসিয়া আছেন, মুক্ত দ্বারপথে সবই তাঁর কানে আসিতেছিল। সাহেব ভিতরে আসিয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, "আর একবার সইটা ভাল ক'রে দেখবেন কি?"

ভুবন বাবু মুখের ঢাকা না খুলিয়াই জবাব দিলেন, "না।"

"এঁর জামিন কি আপনি হ'তে চান?"

ভুবন বাবু তদবস্থাতেই উত্তর করিলেন, "না।"

সুশীল স্তব্ধ স্থির দাঁড়াইয়া ইহাও শুনিল এবং এরপর বর্দ্ধিতোৎসাহে জোরে জোরে পা ফেলিয়া সকলের অগ্রবর্ত্তী হইল।

# সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জগতের কর্ম্মপ্রবাহ অনন্ত বলিয়া মানুষ তার শরীর মনের কোন অবস্থাতেই কর্ম্মহীন থাকিতে পারে না। যত বড় অনিচ্ছা ও অনাগ্রহই থাক, কাজ তাহাকে করিতেই হইবে, বাহিরটা যদি নিশ্চেষ্ট থাকে, মানস-জগৎ একটু ক্ষণেরও জন্য সৃষ্টিহীন থাকিবে না।

নিজের বেদনা-বিধুর চিত্তকে কোন উপায়ই যখন সান্ত্বনা দিতে পারা গেল না, তখন নিজের উপরে একান্তই বিরক্ত হইয়া সুলেখা মাকে আসিয়া বলিল, "অনেক দিন ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন দেওয়া হয় নি, দিলে হয় না?"

মেয়ের মুখে বহুকাল পরে পূর্ব্বের মত একটুখানি আবদারের কথা শুনিয়া সত্যবতী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দে চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কীর্ত্তন ও পূজা আর্চ্চার কালই আমি বন্দোবস্ত করিয়ে দে'ব।"

কীর্ত্তনের পালা নির্ব্বাচন লইয়া খানিকটা গোল বাধিল। মেয়ের ইচ্ছা মাথুর, কিন্তু ঐ পালাটায় না কি বড়ই কান্না পায়, তাই সত্যবতী রাজী হইলেন না। তখন মানই স্থির হইল, যেহেতু এর শেষটাতো তবু মিলনান্ত।

যথাকালে প্রশস্ত অঙ্গনে আসর সাজাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পাড়া-প্রতিবাসী নারী পুরুষ দলে দলে আসিয়া আসর ভর্ত্তি করিয়া বসিল। তাদের সঙ্গে ছোট বড়, মেজ সেজ বহু আকারের বহু বয়সের ছেলে-মেয়ে আসাতে ক্রন্দনে চীৎকারে, কলহে দেখিতে দেখিতে আসর সরগরম হইয়া উঠিল। কাহার কোলে তিন মাসের খোকার ঘাড়ের

উপর দিয়া কাহারও সঙ্গের এক বৎসর বয়সের মেয়ের জুতা পরা পা চলিয়া গেল, ফলে আঘাত পাইয়া কচিটা ও মার খাইয়া এক বৎসরেরটি চেঁচাইতে লাগিল, এবং দুই মায়েতে এতদুপলক্ষে রাম রাবণের যুদ্ধ লাগিল। কোথাও বসিবার স্থান লইয়া পরস্পরে বাগযুদ্ধ ও ঠেলাঠেলি চলিতেছিল। এক জন বলিলেন, "এ যায়গা আমার, তুমি এসে দখল করলে কেন গা?" অপরা কহিলেন, "কেন, যায়গা কি তুমি ইজারা নিয়েছ না কি যে, তোমার হয়ে গেছে?

ইহার পর বিবাদ চরমে গিয়া পৌঁছিল।

সুলেখা এই সকল বিবাদ বিসংবাদ ও বিশৃঙ্খলা দূর করিবার চেষ্টায় চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, স্থির হইয়া বসিয়া গান শুনা তার ভাগ্যে ঘটিয়াই উঠিতেছিল না, তথাপি সে জন্য সে বিশেষ দুঃখিতও হয় নাই। যেমন করিয়াই হউক, তার মনটাকে সে একটুখানি ব্যাপৃত রাখিতে চায় বৈ ত নয়। সেটা যে দিক দিয়াই ঘটে ঘটুক না কেন?

সেটা জ্যোৎস্না রাত্রি, আকাশে দুই এক খণ্ড পাতলা মেঘ মন্থরগতি করি-শিশুর মতই স্বাচ্ছন্দ্য-বিহারে ইচ্ছা সুখে শুণ্ড দুলাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া ফিরিলেও বিশালকায় গজ-যূথ দেখা দেয় নাই। চাঁদের আলো সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘপথে নানারূপে নানা আকারে ধরণীর বুকে আলিপনা কাটিতেছিল। কীর্ত্তন-সভার চন্দ্রাতপতল স্ফটিক ঝাড়ের উজ্জ্বল বর্ত্তি দ্বারা সমুজ্জ্বল রূপে আলোকিত। কীর্ত্তনীয়াগণের কণ্ঠমাল্য হইতে বেল-যুঁইয়ের সৌরভ সঘনে উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাদের সুকৌশল কথনভঙ্গী ও মিষ্ট স্বর এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির অপূর্ব্ব রস-রচনা শ্রোতৃবর্গের অনেকেরই মনে ভাবাবেশ আনয়ন করিয়া দিয়াছিল, আবার কেহ কেহ তখনও ছুতায় নতায় কলহের কাকলী তুলি নিজের সঙ্গে অপরেরও শ্রবণেন্দ্রিয়কে

সঙ্গীত সুধাপানের পরিবর্ত্তে কর্কশ চীৎকারে অপরিতৃপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। কোন কোন সুগৃহিণী এতগুলি শ্রোত্রীসমাগমে পুলকিত হইয়া এই সঙ্গে আলু পটলের দরটা জানিয়া রাখিতেছিলেন, কেহ বা রান্নার ফিরিস্তি দাখিল করিয়া নিজের অপরিমিত কার্য্যশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে বসিয়া গিয়াছিলেন।

সুলেখা যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের ভিড়ে বসিবার তিলমাত্র স্থান নাই—সে সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। তখন শ্রীরাধিকা গভীর মানের দায়ে শ্যাম হারাইয়া অব্যক্ত বেদনায় গুমরিয়া মরিতেছেন—

"ধনীকে জিউ ধসই ক্ষীণ ধরণীপর গিরত,
প্রাণ বঁধুয়ারে মনে পড়ে টুটল মানিনীকো মানে--
আর মান নাই,—
এখন মান গিয়ে বিরহ এল, ধনীর কৃষ্ণবদন মনে প'ল !"

সুলেখার বড় ভাল লাগিল। বাস্তবিকই তাই নয় কি? অভিমান যতই মনকে অধিকার করিয়া রাখুক না কেন, গভীর প্রেম তাহাকে যে নিয়তই ধিক্কার দিতে ছাড়িতেছে না, সে নিজে আহত হইয়াছে বলিয়াই কি আজ প্রতিশোধ-স্পৃহায় উহাকেও অনবরত আঘাত দিয়া দিয়া পাগল করিতে বসিয়াছে?

গায়কেরা আবার গাহিতে লাগিল—

"যেমন কাজ করেছিলাম, তাহার প্রতিফল পেলাম,
এখন জ্ব'লে-জ্ব'লে জ্বলে ম'লাম—
এখন বিরহদাব-দহনে—
জ্ব'লে জ্ব'লে জ্ব'লে ম'লাম।"

সুলেখা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

এক জনের কচি ছেলে চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল, অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ছেলে লইয়া ছেলের মা বাহির হইয়া আসিয়া সুলেখাকে চিনিতে পারিয়া অনুরোধের স্বরে কহিলেন, "ছেলের বড্ড জ্বর এসেছে মা, কোনমতে আর কোলে থাকতে চায় না, যদি সঙ্গে একটি লোক দাও মা, ছেলে নিয়ে বাড়ী যাই। এমন পোড়া বরাত মা, এমন দিনের জন্যে জ্বর যেন মুখিয়ে বসে ছিল!"

সুলেখার আর কীর্ত্তন শুনা হইল না, সে একটা দাসীর সন্ধানে চলিল।

"দিদিমণি! আপনাকে বাবু একবার শীগ্‌গির ক'রে ডাকছেন গো!"

সুলেখা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুই এঁকে একটু আগবাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আয় তো বাপু! আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।"

দাসীর নির্দ্দেশমত সুলেখা পিতার শয়নকক্ষে পৌছিয়া দেখিল, সেখানে শুধু তার বাপই নয়, মাও রহিয়াছেন। এরূপ অসময়ের আহ্বানে, তার উপর মাকে কীর্ত্তন শুনা বন্ধ করিয়া এমন স্তব্ধ ও নতমুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বাপের মুখের স্তব্ধ গম্ভীর ভাব দেখিয়া সে মনে মনে ভয়ও পাইল।

"বাবা, আমাকে ডেকেছ?"—সুলেখা থামিয়া থামিয়া ভয়ে ভয়ে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল। পিতার এরূপ মেঘ-মণ্ডিত পর্ব্বতের মত স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি সে অনেক দিন দেখে নাই। হয় ত বা এতটাই জলদ-জাল-মণ্ডিত ভীমকান্ত মূর্ত্তি কখনই দেখে নাই। কি একটা অজ্ঞাত মহাভয়ে তার বালিকা-চিত্ত শিহরিয়া উঠিল। না জানি আবার কি অমঙ্গলের এ সূচনা!

বিপ্রদাস যখন কথা কহিলেন, তাঁর কণ্ঠশব্দে সুলেখা সুস্পষ্ট চমকে

চমকিয়া উঠিল। যেন বর্ষার ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন স্তব্ধ আকাশে অকস্মাৎ গুরু গুরু শব্দে মেঘ গর্জ্জন হইল।

"সুলেখা! ভুবন বাবুর পুত্র জাল সইএ ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙ্গা চার্জ্জে অভিযুক্ত, তুমি ভালই করেছিলে, তাকে বিয়ে করনি। আজ থেকে আমি তোমার জন্য পাত্রান্তরের চেষ্টা করবো, তার সমস্ত স্মৃতি আজ থেকে মন হ'তে নিঃশেষে মুছে ফেলে দাও। মহাপাপীর স্মৃতি-পূজায় পূজার অবমাননা কোরো না।"

স্তম্ভিত সুলেখার সমস্ত বিশ্ব যেন আবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। বিপুল জগৎ ভূমিকম্পে নাড়া পাইয়া এদিক ওদিক দুলিতে লাগিল। জলস্থল অন্তরীক্ষ অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে স্তম্ভিত নিঝুমভাবে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেই গর্জ্জিত মেঘের মধ্য হইতে নির্ম্মুক্ত অশনি ভাঙ্গিয়া যেন তারই মাথার উপর পড়িয়াছিল!

ঘর গভীর নিস্তব্ধ, গৃহবাসী তিন জনেরই অন্তর্রাজ্যে তখন প্রবল বিপ্লবস্রোত বহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তাহারা আকস্মিক ভয়ভীত মূক জড় প্রকৃতির মতই নির্ব্বাক হইয়া পড়িয়াছে। এই তিনটী প্রাণীর মনের কথা পরস্পরে বিনিময় করিবার মত ভাষাও হারাইয়া গিয়াছে। বলিবার রহিয়াছে বলিয়াই বলিবার ভাষা তাদের নাই।

বাহিরের ছিন্নভিন্ন মেঘগুলা এতক্ষণে একসঙ্গে জমা হইয়াছিল, এতক্ষণে যেন কোন অদৃশ্য হস্তধৃত বিদ্যুৎ বর্ষার মুহুর্মুহুঃ প্রহার-ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা অসহায়ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত ঝড়ের বেগে পৃথিবীর উপর আছড়াইয়া পড়িল। চারিদিক দিয়া একটা উন্মাদ শোকের আর্ত্তনাদ যেন ক্ষণে ক্ষণে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্তর্বাহিরের সেই অ[illegible] ভয়াবহ শোক ও হতাশা লইয়া এই তিনটী প্রাণী নির্ব্বাক ও নি[illegible] হইয়া কাছাকাছি বসিয়া নীরবে

অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল, কথার আদান প্রদানে পরস্পরের কাছে একটু সান্ত্বনা ভরসা কাহার ছিল না।

পরদিন অনেকখানি সুস্থ ও সংযত হইয়া সুলেখার সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, এ সংবাদ হয় ত মিথ্যা! সুশীল জাল সইএ টাকা ভাঙ্গিয়াছে, তার মন ইহাতে সায় দিতে পারিতেছিল না। সুশীল এত বড় পাপিষ্ঠ এ'ও সম্ভব? যতই ঘৃণার সহিত সে তার দিক হইতে মুখ ফিরাইতে যায়, ততই যেন তার সঙ্গে সেই শেষ বিদায় দৃশ্যটা চোখের উপর সদ্য দেখা ছবির মতই জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠে, দুই কান ভরিয়া বাজিয়া উঠে—"সুলেখা! অবিচারে দণ্ড দিয়ে চ'লে যেয়ো না!" কি সে আর্ত্তস্বর! ওঃ! সুলেখার কান যেন তারই ঝাঁজে অহোরাত্র পুড়িয়া যাইতেছে!

কতবারই সে নিজের মধ্যে জোর করিয়া বল আনিতে চাহিল, বিচার বিতর্ক আত্ম প্রবোধার্থ অনেকই করিল, কিন্তু কিছুতেই নিজের মনকে বুঝাইতে পারিল না। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এর আগাগোড়াই একটা অন্যায় অবিচার, আগাগোড়াই একটা প্রকাণ্ড ভুল! আর সেই দণ্ডিতের জন্য তৈরি করা দণ্ডটা তার নিজের বুকে পড়িয়া তাকে অতিষ্ঠ করিবার উপক্রম করিল।

অবশেষে নিশ্চেষ্ট থাকিতে না পারিয়া, সুলেখা সকল দ্বিধা ঠেলিয়া বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস অন্যমনস্ক ভাবে ফুরসীর নলে টান দিতে দিতে কি একটা ভাবিতেছিলেন।—হয়ত তারই কথা—অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে ডাকিল, "বাবা!"

বিপ্রদাস মুখ তুলিলেন, মুখ আজ বড়ই ম্লান, দেখিয়া সুলেখা কিছুই বলিতে পারিল না।

সে কিছু বলিতে চায়, বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিপ্রদাস নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে, লেখা ?"

সুলেখা একবার মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, সঙ্কোচ ও লজ্জায় কণ্ঠ হইতে ভাষা বাহির হইতেছিল না, অথচ এ সব বিষয়ে মায়ের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নহে জানিয়া এই একমাত্র উপায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

"কি বলবে বল মা ! এসো, আমার কাছে এসে বসো।"

বাপের স্নেহ সম্ভাষণে ভরসা পাইয়া মেয়ে আসিয়া হেঁটমুখে পায়ের কাছে বসিতেই পিতা হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন ; স্নেহভরে কহিলেন, "কোথাও যাবি ?"

এই কথার সুযোগ পাইয়া সুলেখা ঘাড় না তুলিয়াই অধো-দৃষ্টিতে অস্পষ্টভাষায় এক নিশ্বাসে কহিয়া ফেলিল, "আমাদের একবার কল্‌কাতায় গেলে হয় না বাবা ?"

"কলকাতায় ? কোথায় ? কেন ?" বিপ্রদাসের কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

সুলেখা বুঝিল এবং তার সঙ্কোচ আরও বাড়িল, তথাপি সে কোন-মতে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "তাঁদের এমন বিপদের সময় একবার যাওয়া কি উচিত নয় ?"

বিপ্রদাস মেয়ের কথার অর্থ বুঝিয়া দুঃখ-গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "তাঁদের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক কি লেখা ?"

সুলেখার মুখ আরও খানিকটা নামিয়া আসিলেও নত মুখের নত-দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল ও কঠিন হইয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, অনেকখানি সঙ্কোচ কাটাইয়া নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইল, একটুখানি স্পষ্টস্বরে কহিয়া উঠিল, "কিন্তু এ'ত মিথ্যাও হ'তে পারে বাবা ?"

"কি মিথ্যা হ'তে পারে, মা ?"

"এই জাল করার কথা ?"

"কেমন ক'রে তা' হবে মা ? সে যে নিজমুখেই দোষ স্বীকার করেছে। খবরের কাগজে এ সব কথা যে বেরিয়েছে, তুমি কি দেখনি ? দেখতে চাও ?"

সুলেখা দুই হাতে নত মুখ ঢাকা দিল, তার হাত দুখানা কাঁপিতেছিল—সে অসহায়ভাবে শুধু সবেগে মাথা নাড়িল। অমনি করিয়াই তাঁহাকে জানাইয়া দিল—না, না, না সে দেখিতে চাহে না।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুঃখের দিন মানুষের বড় সহজে কাটিতে চাহে না, কিন্তু সুলেখার সে দিন রাত্রিও অবশেষে কাটিয়া গেল। কাটিল বটে, কিন্তু কি করিয়াই যে কাটিল, সে শুধু সে-ই জানে ! এত দিন অত্যাচারিত নীলিমার প্রতি করুণায় সে যে নিজের কথা ভাবিতে অবসর পায় নাই, বরং তার সূচনা দেখিলেই সযত্নে পরিহার চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু যে দিন জানা গিয়াছে নীলিমার ক্ষতি প্রতীকারের সীমা ছাড়া, সেই হইতে সযত্ন রুদ্ধ আত্মচিন্তা তার কাছে প্রবলমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। তার যে কত বড় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে সেই কথাটা তখনই ভাল করিয়া ধরা পড়িল। আর সেই সঙ্গে অসহ্য বিয়োগ দুঃখে প্রাণ যেন ফাটিতে লাগিল। এর উপর এই সংবাদ সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, সুশীলের প্রতি এক দিকে যত বড় প্রচণ্ড বিরাগ, আর এক দিকে তেমনই প্রবল করুণা, এর মাঝে পড়িয়া সে পাগল হইতে বসিল। সেই বিপন্ন, অবমানিত, ঘৃণিত লোকটাকে একবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য তার বুভুক্ষিত চিত্ত তীব্র হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। সে আর্ত্তনাদকে সে যে কোনমতেই দমন করিতে পারিতেছে না। অথচ এ'কি ভীষণ লজ্জা। একে লুকাইবার স্থান কোথাও যে নাই !

কিন্তু এক দিন ইহারও সমাধান ঘটিল। হঠাৎ সে এই চিঠি পাইল। চিঠিখানা অপরিচিত হাতের লেখা, কিন্তু লেখিকা তার অপরিচিতা নয়। সাগ্রহে পড়িল ;—

"স্নেহের ভগিনী সুলেখা !

হতভাগিনী নীলিমাকে তুমি তো জান—আমি নীলিমা। আমার জন্য তুমি যা' করিয়াছ, জগতে দ্বিতীয় কেহ করে নাই। তোমার অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতায় তোমার নিকট চিরবিক্রীত হইয়া গিয়াছি।

আমার অবস্থা বুদ্ধি দোষে, শিক্ষা দোষে অথবা ভাগ্য দোষে —অপ্রতিবিধেয় করিয়া তুলিয়াছি, সে জটিলতার পাক ছাড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। যাক্ সে কথা—স্বকর্ম্মের ফলভোগ—অনিবার্য্য, সে জন্য আমার কাহারও সম্বন্ধে কোন অনুযোগ করিবার নাই। বড় বেশি চড়াদামে এই অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি, মানুষ স্বকর্ম্মফলে সুখদুঃখ ভোগ করে, অদৃষ্ট যার জন্মক্ষণেই বাম, তার পরিণাম শুভ হয় না। আমার বলিবার কথা এই, আমি যে দুঃখ পাইতেছি সে আমারই থাক ; আমার সঙ্গে নিরপরাধে তোমরা কেন এত দুঃখ ভোগ করিতেছ, এ কার ভাগ্যলিপি, জানি না ! আমি তোমাদের জীবনের দুষ্টগ্রহ, আমার সংস্পর্শে তোমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের অনেকগুলি দিন দুর্ব্বিপাকে জড়াইয়া বিপ্লবময় হইয়া গেল।—কিন্তু বোন ! আমি যদি এর বিন্দু-বিসর্গ জানিতাম, তবে হয় ত এত কষ্ট তোমাদের পাইতে দিতাম না। আমার পোড়া অদৃষ্টের লেখা লইয়া আমিই যা' কিছু বিড়ম্বনা ভোগ করিব, আমার জন্য জগতের আর কাহাকেও অংশভাগী করিতে আমার অধিকারও নাই, প্রবৃত্তিও ছিল না। ভাবিয়াছিলাম, আমি সরিয়া গেলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।

"সুশীল বাবুকে আমি আমার জীবনে কদিন মাত্র দেখিয়াছি,

কিন্তু তুমি না কি তাঁর চিরপরিচিতা? কেমন করিয়া বিশ্বাস করিলে যে তাঁর দ্বারা এত বড় ঘৃণিত কার্য্য ঘটিতে পারে? তুমি না হয় ছেলে-মানুষ, মানুষ চিনিবার শক্তি তোমাতে আজও না হয় দৃঢ় হয় নাই, কিন্তু তোমার অভিভাবকরাই বা কেমন? তাঁর নিজের বাপই বা কি! তিনিও এই হেয় চক্রান্তে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন না কি? হায় হায়! সেই বাপের ও তোমার মনোভঙ্গের ভয়েই যে তিনি আমার বাপের কবলে পড়িয়া সব চেয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, পিতৃবৎসলতারও যে তাঁর সীমা দেখি নাই! আমার মত দুর্ভাগ্য জীব তাঁর এ ভক্তি ভালবাসার অর্থই বোধ করিতে পারে নাই। বিস্ময়ে, ঈর্ষায়, অভিমানে দগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছি, না জানি সে কেমন বাপ, যার পরে সন্তানের এত বড় নির্ভর শ্রদ্ধা! কিন্তু ক্ষমা করিও, এই কি তার পরিচয়? নিজের সন্তানকে না চিনিয়া তার পরে এত বড় কঠিন আঘাত তিনি দিতেও ত পারিলেন? ধন্য তিনি!—তবে কি তোমাদের বিশ্বাসে দেবতাও পিশাচ হয়। অথবা অত বড়কে ধারণা করা বুঝি স্বাভাবিক নয়। আমি এ বয়সে অনেক দেখিলাম, কিন্তু এমন পবিত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্নেহময় দেব-চরিত্র দেখিলাম নাতো!

"আরও কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, আমার বাপের এই ঘৃণ্য রটনা—সর্ব্বৈব মিথ্যা? বিনা খরচায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তিনিই তাঁকে এই কলঙ্করটনার ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া বিবাহে বাধ্য করেন, অসম্মত হইলে আদালতে মিথ্যা নালিশ করার ভয় দেখান, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই আমি তাঁকে গোপনে পলাইবার সহায়তা করি। কেন করি? তাঁকে তোমা-ময় জানিয়া। যদি তিনি আমারই ক্ষতিকারক হইতেন, আমি কি নিজের সেই তত বড় সর্ব্বনাশের সমর্থন করিতে পারিতাম? নারী তুমি, তুমিই বিচার করিও, আর করিতে

দিও, তোমার যদি মা থাকেন, তবে তাঁকেই। সুশীল বাবুর মা থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ছেলেকে এত বড় অবিচার করিতে পারিতেন না।

"আর কি বলিব? বড় নির্ব্বোধের কাজ তোমরা করিয়াছ! সোনায় খাদ থাকিলে পোড়াইতে হয়, তোমাদের খাঁটি সোনা তোমরা কিসের দুঃখে পোড়াইলে জানি না। বেশী পাইলে হয় ত পাওয়ার মূল্যও থাকে না। যাক, যার যা ভাগ্যে ছিল ঘটিয়াছে, তোমার হারানিধি তুমি অকুণ্ঠিত চিত্তে ফিরাইয়া লও। আমার তাহাতে লোভ নাই। আমার করতলায়ত্ত রত্ন আমি যে বহুদিন পূর্ব্বেই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম আর সে শুধু তোমারই জন্য। তোমাহীন জীবনে তাঁর সুখ হইবে না বুঝিয়াই সে কাজ করিয়াছি, নতুবা ভিখারী কি রত্ন ত্যাগ করে?

"আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ লইও। আমার স্নেহ-প্রতিমা ছোট বোন্‌টি! ঈশ্বর তোমার সমস্ত অমঙ্গল মুছিয়া লউন। ইতি—

তোমার অভাগিনী দিদি
নীলিমা।"

পাঠশেষে অধীর সুলেখা প্রাণপণে ছুটিয়া সুপ্তিমগ্ন মা-বাপের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা! মা! বাবা! বাবা!"

একসঙ্গে দুজনের ঘুম ভাঙ্গিল। সত্যবতী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, "কি লেখা? কি হয়েছে, মা? অমন করচো কেন? কি রে?"

"দেখ কি চিঠি পেলুম—মা! আমি আজই এক্ষণি আমার শ্বশুরের কাছে যাবো, বাবা তুমি দুজনেই আমার সঙ্গে চল।"

নীরবে পত্রপাঠ সমাধা করিয়া এক সঙ্গেই দুজনে হর্ষবিষাদে মুখ তুলিলেন। পিতা কহিলেন, "এ ত বুঝলুম, এর জন্যে আমার আপত্তি ত

খুব বেশী ছিলও না ; কিন্তু এটা যে এর চেয়েও ঢের শক্ত, জালিয়াতের হাতে ত মেয়ে দেওয়া যায় না।”

সুলেখা তার স্বভাব বহির্ভূত অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, “মেয়ে দাও না দাও, সে সব কথা পরে। আজই সেখানে গিয়ে ক্ষমা ত আমাকে চাইতেই হবে। আমি যে তাঁর সকল দুর্দ্দশার মূল। ওঠো মা শীগগির তৈরি হয়ে নাও, আমি বল্‌ছি, এও মিথ্যা কলঙ্ক—এ হ'তেই পারে না—আমার উপর রাগ করেই হয়ত—মা! মা! তুমি কিছু বলো মা! বাবা তুমিও ভাল করে বুঝে দেখ।”

## অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অত্যন্ত উত্তেজনার পরেই একটা সুগভীর অবসাদ বড় অতর্কিতে দেখা দেয়। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে অগ্নিতপ্ত ধূলি রাশি উড়াইয়া ঝড়ের বাতাস দাপাদাপি করিয়া নিজেও জ্বলে, পরকেও জ্বালায় ; কিন্তু সন্ধ্যার ম্লান স্নিগ্ধ বিষণ্ণতার মধ্যে যখন স্তব্ধ হইয়া থামিয়া যায়, তখন শ্বাস টানিবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত যেন তার বাকি থাকে না। সুশীল এত দিন মনের ঝোঁকে এবং সুলেখার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অসাধ্য সাধন করিয়া বেড়াইয়াছে ; কিন্তু সে কর্ত্তব্য যেই সমাধা হইয়া গেল, অমনই তার বোধ হইল, যেন তার এ জীবনের কর্ম্মসূত্র নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এইবার এই নষ্টশ্রী ও কর্ম্মভ্রষ্ট জীবনটাকে শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলেই চুকিয়া যাইবে। তাই যখন অকস্মাৎ সেই সুযোগই মিলিয়া গেল হাজতে

বসিয়াও সে পরম নিশ্চিন্ততা বোধ করিতেছিল। সংগ্রাম বিধ্বস্ত ক্লান্ত সৈনিক যুদ্ধশেষে যেমন অসহ্য ক্ষত-জ্বালাকেও বিস্মৃত হয়, তেমনই একটা সর্ব্বনাশের শান্তি যেন সে বড় স্বস্তির মতই এত বড় সর্ব্বনাশের মধ্যেও অনুভব করিল। সে ত খুঁজিতেছিল মরণকেই, তা' তার চাইতেও তার ভাগ্যে এ বড় বেশী পুরস্কার মিলিয়া গিয়াছে! হয় ত বা ইহা ভালই হইল। মরিলেই ত সব চুকিয়া যায়, জীবনের শাস্তিটা ত আর ভোগ করা হয় না। বিধাতা পুরুষের রচনায় মৌলিকতা আছে, বলিতেই হইবে?

লোহার শিক আঁটা ছোট্ট জানালার দিকে মুখ করিয়া সুশীল মাটীতে বসিয়া ছিল, বাহিরে দৃষ্টি ছিল না। নিজের দীর্ঘব্যাপী ভবিষ্যতের দিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বারেক চাহিয়া দেখিল। সে আজ গৃহহীন, স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা সুনামহারা হীন চরিত্র অপরাধী! সুশীলের ওষ্ঠপ্রান্তে অতি তীব্র জ্বালাময় মৃদুহাস্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তার কালিমা লিপ্ত চোখের তারা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে এক মুহূর্ত্তে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল। কঠোর ব্যঙ্গে আপনাকে আপনিই অভিনন্দিত করিয়া মনে মনে বলিল, "জগতে বেশ পরিচয়টা রেখে যাচ্চিস্! খুব একটা নাম করলি। এমনটী ক'জনের কপালে জোটে!"

সুশীলের মনে পড়িল সুদূর অতীতের্ একটা সুবিস্তৃত ইতিহাস। সুলেখার চাকর গোপাল আগুন দেওয়ার মিথ্যা অপরাধে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া সে একদিন ভয়ে লজ্জায় মরিতে বসিয়াছিল, মনের মধ্যে বিস্ময় উথলিয়া উঠিল, সেই মানুষই কি সে?

বদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল। কারা-প্রহরীর নিত্য কার্য্যে আগমন ভাবিয়া সুশীল মুখ ফিরাইল না, সহসা-চ্ছিন্ন চিন্তাধারাকে সংযুক্ত করিয়া লইয়া আত্মচিন্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু সে ধারা অব্যাহত রহিল না।

অর্দ্ধ-অন্ধকার কারাকক্ষে দীপ্ত বিদ্যুৎ শিখার মত সহসা এক রূপসী তরুণী ছুটিয়া আসিয়া তার পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

"এ'কি! সুলেখা!"

স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় বিস্মিত মৃদুস্বরে কোনমতে কথা কয়টা বলিয়া সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। তার পা দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল এবং শুধু তাই নয়, সেই কম্পনটা তার সমস্ত শরীরেই ছড়াইয়া পড়িল।—কিন্তু সে উঠিতে পারিল না, প্রাণপণ বলে তার পা দুখানা তখন সুলেখার দুহাত দিয়া বাঁধা এবং সেই পায়ের উপরেই তার মুখখানা সবলে লুকানো। সুশীলের সর্ব্বশরীর সেই স্পর্শে শিথিল হইয়া আসিলেও সে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিল যে, সেই মুখখানা হইতে উষ্ণ অশ্রুস্রোত ঝরিয়া পড়িয়া তার ধূলি মলিন শুষ্ক রুক্ষ পা-দুখানাকে ধৌত করিয়া দিতেছে। সুশীল কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় থাকিল। তারপর নিজের এই অবস্থায় যেন ব্যাকুল হইয়া বলিল, "ওঠো সুলেখা!"

সুলেখা দ্বিগুণ বলে পা-দুখানা চাপিয়া ধরিয়া তার নিজের মুখ ঘসিয়া গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা করতে কি পারবে না?"

সুশীল একান্ত অধীর হইয়া কহিল, "তুমি আগে উঠে বসো সুলেখা!"

সুলেখা উঠিয়া বসিল, কিন্তু তার চোখ দিয়া যে শ্রাবণ-ধারা বহিতেছিল, তাহা সে রোধ করিল না, নত মস্তকে নিঃশব্দে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সুশীল ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, "তুমি এখানে কেন এলে, সুলেখা?"

সুশীলের কণ্ঠে প্রচুরতর বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

সুলেখা এবার আঁচল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া নিজের চোখ দুইটা মুছিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে অশ্রু-স্তম্ভিত ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল, "আমার যা বলবার আছে, ব'লে যেতে এসেছি, দয়া ক'রে শুন্‌বে কি ?"

"তোমার বাবা যে তোমায় এখানে আসতে দিলেন ?"

সুশীলের কণ্ঠ তখনও অকথ্য বিস্ময়ের ভার মুক্ত হইতে পারে নাই।

"সহজে কি দিয়েছেন ? দুদিন উপোস ক'রে প'ড়ে থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করবার অনুমতি পেয়েছি।"—সুলেখার কণ্ঠ সহসা অস্পষ্ট হইয়া গেল।

"কেন এলে, সুলেখা ?"

সুলেখা উত্তর দিল না, নীরবে তার গণ্ড বহিয়া জলধারা ঘরের মেঝেয় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুশীলের বিস্ফারিত আশ্চর্য্য নেত্র সেই দৃশ্যে নিবদ্ধ হইয়া রহিল, সেও কথা কহিল না।

ছোট জানালাটার বাহিরে তখন পত্রবহুল একটা প্রকাণ্ড নিম গাছকে অসংখ্যজাতীয় পাখীর দল বহুবিধ কলতানে শব্দমুখর করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতার অপর শব্দসমূহকে এখানের দুষ্প্রবেশ্য করিয়া তুলিলেও ঐ আনন্দ-কলরবটুকুকে চাপিয়া রাখা যায় নাই। গাছটির মাথার উপর দিয়া যেটুকু নীল আকাশ দেখা যায়, সেটুকু আজ গভীর নীলিমায় নিবিড় দেখাইতেছিল, ক্ষুদ্র এক খণ্ড পীতাভ সূর্য্যালোক মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া অনাবৃত ভূমিতলে এ গৃহের আগত অতিথিকে বুঝি স্বাগত জানাইবার জন্যই আসনের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘর গভীর নিস্তব্ধ সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা কাহারও সফল হইতেছিল না ;—যদিও দুজনেই বুঝিতেছিল যে, বলিবার সময় প্রতি মুহূর্ত্তেই নির্ম্মমভাবে বিগত হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা দুই জনেই জানে যে

তাহাদের বলিবার শুনিবার দুই-ই এখনও যথেষ্ট বাকি রহিয়াছে, হয় ত এ জীবনে এ সুযোগ দ্বিতীয়বার আসিবে না।

অবশেষে সেই অন্তর্গূঢ় অসহ্য নীরবতা সুলেখাই ভঙ্গ করিল।

"আমার এই বলবার আছে যে, তোমার আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, তুমি এর পর যেখানেই থাক বা যাও, শুধু জেনে রেখো, আমি তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রইলুম। এক দিন আমাদের মিলন হবেই—তা'হোক এ জন্মে, হোক জন্মান্তরে। আমি তোমায় অন্যায় সংশয় ক'রে অনেক দুঃখ দিয়েছি, তুমি যদি ক্ষমা করতে পার, ক'রো ; যদি না পার, তাতেও আমার দুঃখ নেই ; এ জন্মটা না হয় তার প্রায়শ্চিত্তেই কাটাব। —কিন্তু তোমায় হারালে আমার চলবে না।—যদি এ জন্মে দেখা না হয়, যদি মরে যাই, জেনো, মরবার সময় তোমায় পাবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও কামনা নিয়েই আমি মরেছি। আর আমার কিছুই বলবার নেই।"

"সুলেখা! কেমন ক'রে জানলে আমি—"

"নির্দ্দোষী? সে আমি জেনেছি—নীলিমার চিঠি পেয়ে জেনেছি—"

"কিন্তু এই জাল করা, টাকা ভাঙ্গা, এর ত তুমি কোন—"

"না, প্রমাণ পাই নি—জানি না, হয় ত তা' কোন দিন পাবোও না, কিন্তু এ যে তুমি করোনি, এ আমি প্রথম দিনই বুঝেছিলুম। এ শুধু আমার উপর আর বাপের উপর অভিমানে তুমি অন্যের অপরাধ ঘাড়ে নিয়েছ, কেমন না? তুমি বলো আর নাই বলো—এ আমি সমস্ত পৃথিবী এক হলেও বিশ্বাস করবো না। কিন্তু কেন তুমি আমার কাছে সে দিন সব কথা খুলে বল্লে না? কেন বিনা দোষে শুভেন্দুর দেওয়া দণ্ড মাথায় নিয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে তুল্লে?"

সুলেখার কণ্ঠ শেষের দিকে যত লজ্জা, ততই বেদনায় অস্ফুট ও

করুণতর হইয়া আসিল। সে একখানা হাত সুশীলের পায়ের উপর রাখিয়া ব্যগ্র দুটি চক্ষু তার মুখে তুলিয়া ধরিল—"কেন আমায় ভুল বুঝতে দিলে? কেন বুঝিয়ে দিলে না?"

সুশীল ব্যস্তে সুলেখার হাতখানা পায়ের উপর হইতে তুলিয়া লইল, একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা তার বিশুষ্ক অধর প্রান্তে চকিত হইয়া উঠিল—"বল্লেই কি তখন বিশ্বাস করতে? সে যা' হবার হয়েছে, সুলেখা! যদি আমি যাই, তুমি—"

যে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা সে কথা সুশীল সংবরণ করিয়া লইল। তার পিতাকে দেখিতে ইহাকে অনুরোধ করা হয় ত অসঙ্গত এবং—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজনও।

"আমি তখন কি করবো, বল্‌লে না ত? না বল্‌তেই হবে, হ্যাঁ, বল?"

দ্বারের নিকট হইতে সুলেখাদের পুরাতন সরকার ও ঝি একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "জমাদার সাহেব বল্‌ছেন, আর সময় নেই, চলে আসুন দিদিমণি! ওরা রাগ করবে।"

সুলেখা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "চল্‌লেম! আমার মনে কোন দুঃখ নেই, তোমার স্মৃতি নিয়ে—যদি দরকার হয়—এ জন্মটা আমি কাটিয়ে দিতে পারবো। আজ যে গ্লানির মধ্যে তোমায় আমরা নামিয়ে দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্তও ত হওয়া চাই। হোক তাই!—ক্ষমার কথা তোমায় ব'লে ফেলেছিলুম—সে আমার ছেলেমানুষী—ক্ষমা পেলে আমার কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না। পারতো ক্ষমা আমায় করো না।"

"দিদিমণি! জমাদার বলছেন—"

"এই যে যাচ্ছি—"

সুলেখা নত হইয়া সুশীলের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল—“আবার দেখা হবে—হয় এখানে, না হয়—ঐখানে—”

ঝন্ ঝন্ শব্দে লোহার শিকল যথাস্থানে আঁটিয়া বসিল। নির্জ্জন স্তব্ধ গৃহে অশরীরী রূপে প্রতিধ্বনি ধ্বনিত করিল, “না হয়—ঐখানে—”

# ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সুশীল চলিয়া গেলে কি অসহ্য শোকাহত শরীর মন লইয়াই যে নীলিমা তার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ফিরিয়া আসিল, সে শুধু সেই জানে—আর যদি কেহ চিরদিনের কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধির মুহূর্ত্তে ইষ্টদেবতাকে এমনই বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তবে সেই শুধু এ ক্ষতির পরিমাণ বোধ করিতে পারিবে। শয্যাহীন তক্তপোষের উপর সে অসহ্য যন্ত্রণায় অব্যক্ত রব করিয়া লুটাইয়া পড়িল এবং তার পর সে কি কান্না! তখন নিখিলের সমুদয় বেদনা যেন এককালে পুঞ্জীভূত হইয়া আসিয়া তার দুই নেত্রপথে অজস্র ধারাকারে প্রবাহিত হইতে থাকিল—সে কান্না অফুরন্ত, তার যেন শেষ নাই! তার করতলগত অমূল্যনিধি, তার সাধনার সিদ্ধি, সে আজ নিজের হাতে অতল জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, চির-জন্ম-জন্মান্তরের মতই তার সর্ব্বস্ব সে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তার এ ছার জীবনেই বা প্রয়োজন কিসের? কি লইয়া এই দীর্ঘতর, সুখহীন, শান্তিহীন, নির্ব্বান্ধব, নির্জ্জন জীবনভারকে সে বহিয়া বেড়াইবে এবং তাহাতে লাভই বা কি?

নীলিমার মনে পড়িল, এক দিন সে আত্মহত্যা করিতে পারে নাই, পূর্ণ সুযোগ সত্ত্বেও মরণের দ্বার ঠেলিয়া আবার সেই জীবন্ত জগতে

ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এখন হয়ত সে পারে। মনে হইল, এমনই কঠিন প্রাণ তার যে, মরণও তাকে ছুঁই ছুঁই করিয়াও ছুঁইতে পারে না। যে মৃত্যুর ভয়ে উচ্চ নীচ সমুদয় জীবজগৎ সদা শঙ্কিত তাকেই সে সমাদরের সহিত বরণ করিতে উদ্যত, অথচ সেও তাহাকে আলিঙ্গনদানে অসম্মত, এ রহস্য বড় মন্দ নহে! অথবা যে অনাবশ্যক, মৃত্যুর রাজ্যেও বোধ করি, তার মূল্য নাই!

এই ঘটনার পরদিন প্রভাতে মিস্ রীচের আহ্বান পাইয়া নীলিমা তাঁর ঘরে গিয়া দেখিল, শুধু তিনিই নহেন, তাঁহার সঙ্গে সে ঘরে আজ প্রধান পুরোহিত মহাশয়ও উপস্থিত আছেন। এঁর উপস্থিতিতে নীলিমা সঙ্কোচ বোধ করিল। মিস্ রীচ তাকে আদর করিতে ডাকেন নাই, নিশ্চিত জানা কথা;—অথচ একজন অপর লোকের সান্নিধ্যে অপমানিত হওয়াকে পছন্দ করে? দুই জনের প্রতিই নীলিমার জ্বালাভরা, অসহিষ্ণু চিত্ত সমানভাবেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং সে একটা আসন্ন সংগ্রামের জন্য নিজেকে তৈরী করিয়া লইল। অন্তর হইতেই বুঝিয়াছিল, আজ যদি মিস্ রীচ তার প্রতি বিশেষ কোন অন্যায় করেন, তাহাকেও সমর ঘোষণা করিতে হইবে। শরীর মনের এত বড় মন্দ অবস্থায় আর কোন কিছু তার সহ্য হইবে না।

মিস্ রীচ স্বতঃ গম্ভীর ও কঠিন কণ্ঠে কথা কহিলেন; বলিলেন, "মিস্ চক্রবর্ত্তী! তোমার বিষয়েই এঁর সঙ্গে আমার এতক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। তোমার যেমন চরিত্র, তাহাতে বিবাহই একমাত্র প্রতিষেধক। তাই আমরা তোমারই মঙ্গলের জন্য তোমার বিবাহ বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি; অতএব তুমি প্রস্তুত হও, এই সপ্তাহেই মিঃ চিনিবাস পলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে।"

নীলিমার বিদ্রোহ-বিষে বিদগ্ধ চিত্ত ঘোরতর বিস্ময়ের আঘাতে

স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সে এ দিক দিয়া আক্রমণের ভয় আদৌ করে নাই। ভাবিল—"এই খ্রীষ্টধর্ম্ম! উদার ও মহৎ বলিয়া এরই এত বড় নাম! এতেই এদের এত গর্ব্ব? সে যে এ কথা বিশ্বাস করিতেই পারে না। না না, হয় ত বুঝিবার ভুল, মিস্ রীচ যতই যা হউন, নিশ্চয়ই এমন কথা তাহাকে বলেন নাই!" সে প্রায় নিরুদ্ধশ্বাসে মিস্ রীচের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিল—না, কই, না, কিছুই বুঝা যায় না; মুখ সেই যথাপূর্ব্ব পাথরের মতই কঠিন ও নির্লিপ্ত। সাহসভরে প্রশ্ন করিল, "বিবাহের কথা আপনি কি বলছেন? আপনি জানেন, আমি জর্জ্জ ওকবর্ণকেই বিবাহ করি নাই—"

"ওঃ, তোমার ত বড়ই স্পর্দ্ধা দেখিতে পাই! নেটিব নিগার হইয়া উচ্চবংশীয় আইরিশম্যানকে তুমি বিবাহ করিতে চাও না কি? বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবার জন্য উদ্বাহু হওয়া আর কি। শোন নীলিমা! তোমার কুচরিত্রের দৃষ্টান্তে আমি আমার মিশনের মেয়েদের নষ্ট হইতে দিতে পারি না, তোমায় এক জন শক্ত লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া এই মিশনবাড়ীর বাহিরে পাঠাইতেই হইবে। এমনই মায়াবিনী তুমি যে, তোমার হাতে আইরিশ যুবক, বাঙ্গালী যুবক কাহারও রক্ষা নাই! কি লজ্জা! যাও, এখন নিজের স্থানে যাও, বিবাহের পোষাকের জন্য কাপড় আনাইয়া দিব, শেলাই করিয়া লইও।"

নীলিমার শরীরের রক্তে ক্রোধের অগ্নি বাড়বাগ্নির মতই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার বিয়ে দিতে চান জোর ক'রে? যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকে আমি কখন দেখিও নি, সেও আমায় নয়! হিন্দুসমাজ এর চেয়ে বেশী আর কি ক'রে থাকে? তবু ত তারা আত্মীয়, আর তোমরা সম্পূর্ণ পর। যাই হোক, বিয়ে আমি কিছুতেই কর্‌বো না।"

মিস্ রীচের ভূগোলশাস্ত্রে প্রদর্শিত ভূ-গোলের মতই সুবৃহৎ এবং সুগোল মুখমণ্ডল কঠোরতর হইয়া উঠিল, গম্ভীরতর স্বরে তিনি সবিদ্রূপে উত্তর করিলেন, "তা' করবে কেন? তা'হলে যে প্রজাপতির পাখা খসিয়া যাইবে! কিন্তু আমিও বলিতেছি যে, বিবাহ তোমায় করিতেই হইবে। বর তোমায় দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে, আর তোমার পছন্দের জন্য কিছুই আসিয়া যায় না। পল তোমায় ঠিক জব্দ রাখিতে পারিবে। সে চিনি কুঠীতে কুলী খাটায়, আর তোমার মত একটা মেয়েমানুষকে সোজা করিতে পারিবে না? সে মরিসসেও অনেক দিন কুলী খাটাইয়া খুব পাকা হইয়া আসিয়াছে। জানেন রেভারেণ্ড মশাই! মিঃ চিনিবাস পল সেদিন অনেকগুলি আপনার জাতের সাঁওতালকে খৃষ্টান করেছে, ভারী ভাল লোক।"

নীলিমা সাপের মত গর্জ্জিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "সাঁওতালের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান?"

মিস্ রীচ প্রসন্ন আননে প্রতিহিংসার বক্র হাসি হাসিয়া, পরিতুষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমরা জাতিভেদ মানিনে। ব্রাহ্মণে সাঁওতালে আমাদের কাছে প্রভেদ নেই? তুমি খৃষ্টান, তোমার পক্ষেও সেই কথা।"

শুনিয়া নীলিমার মাথার ঠিক রহিল না, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! জাতিভেদ আপনারা খুবই মানেন। আইরিশ-ম্যানের বিবাহ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে হওয়ায় আপনার এবং আপনাদের ঘোরতর আপত্তি আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ সাঁওতালের সঙ্গে হওয়ায় আপনার বা আপনার জাতির আপত্তি নাই। কেন? আমরা কি আপনাদের সঙ্গে তুলনায় তাদেরও অধম? কিসে শুনি? রংয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যে তফাৎ, আমাদের সঙ্গে

ওদেরও প্রায় তাই। আপনারাও এ দেশে থেকে খুব বেশী দিন রং বজায় রাখতে পারেন না, তাও ত স্বচক্ষে দেখেছেন! তবু তা' বজায় রাখতে কতই না প্রাণপণ চেষ্টা, কত না অসাধারণ যত্ন। পাহাড়ে ঘোরা, মধ্যে মধ্যে 'বাড়ী' ঘুরে আসা। তারপর শিক্ষা, সংযম, চরিত্র কোন বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যা প্রভেদ, আমাদের সঙ্গে এ দেশের অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের তার চেয়ে কম প্রভেদ? আমরা অর্দ্ধো-লঙ্গবেশে নর-নারীতে মিলে—পরপুরুষ ও পরনারী—মদ খেয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে পারি না, পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা এখানেও প্রশ্রয় পায়, নারীর উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের সমাজ, সমাজধর্ম্মের অধিকতর বিরোধী বোধ করে, সন্তানকে সতী-গর্ভজাত রাখতে চায়, এরই জন্য আমরা আপনাদের কাছে অর্দ্ধশিক্ষিত বলে যদি গণ্য হই—তবে ওদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ত গণে শেষ করতে পারা যায় না। আমাদের সঙ্গে শোণিত সম্বন্ধে মিশ্রিত হ'তে আপনাদেরও বলিনে, কিন্তু আমাদেরও আপনারা সেই দয়াটুকু দেখালেই পারেন! এই রঙ্গিন খোলস, এই কথার মালা আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে। ছাড়ুন এই অভিভাবকত্বের ভাণ। এই ভুল পথের ভুল শিক্ষা ছালা ভ'রে এনে ইন্‌জেক্ট ক'রে দিচ্ছেন, আর—"উত্তেজনায় নীলিমার কণ্ঠরোধ হইল; সে সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল।

রেভারেণ্ড গিলবার্ট অটোম্যান এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন। পুরোহিতোচিত ধীর-গম্ভীর স্নিগ্ধ কণ্ঠেই কহিলেন, "বৎসে! ধৈর্য্যহারা হইও-না, তুমি নিশ্চয়ই সেণ্ট ম্যাথিউএর সেই মূল্যবান্ কথাগুলি স্মরণ করিবে যে * * * 'and gathered the good into vessels, but cast the bad away. And shall cast them into the furnace of fire, there shall be wailling and gnashing of teeth—'

অতএব সুস্থিরচিত্তে সকল কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখ। দেখ—ভুল করা মানবধর্ম্মের বাহিরের বস্তু নহে। To err is human, এটি একটি বিশেষ প্রমাণ। আর যীসাস্ ক্রাইষ্ট এই ভুলাক্রান্ত পাপীদের জন্যই সংসারে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কাঁটার মুকুট পরিয়া নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণদান করিলেন, তাহা কেবলমাত্র জগতের পাপীকুলের মুক্তির জন্যই। অতএব তুমি নিজের জীবনের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হও, এবং সম্পূর্ণভাবে যিনি তোমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক তোমার জন্য বিহিত তোমার এই একমাত্র উদ্ধারের পথকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ কর। হিন্দুর জাতিভেদে ও খৃষ্টানের জাতিভেদে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। হিন্দু তার সহিত সমানধর্ম্মী, সমবর্ণ ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যেও আহার করে না, আর আমরা নিগ্রো, বাগ্দী বা তোমাদের সব্বার হাতেই নির্ব্বিকার ভাবে খাই। ও সব সঙ্কীর্ণতা মিথ্যাভেদবুদ্ধি মন হইতে পরিত্যাগ কর। পলকে আমিও চিনি, সে তাহার কুলীদের খুব খাটায় ও তাহাদের মধ্যে বাইবেল প্রচার করে; এতে তাদের খুব ভাল হয়। উপার্জ্জনও সে কম করে না। আমার বিশ্বাস, এ বিবাহে তোমার আত্মারও কল্যাণ হইবে এবং সুখীও যে হইবে না, তা নয়। আর তুমি কি বেশী আশা করিতে পার?"

এরই নাম উদারতা! আর এই সমুন্নত য়ুরোপীয় উদার সমাজ? এতটুকুমাত্র সঞ্চয় লইয়াই ইহারা পরধর্ম্মের প্রতি পদে পদে আক্রমণ পূর্ব্বক পরের শান্তিপূর্ণ সমাজ-ধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিতে বসিয়াছে? য়ুরোপীয়ের জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপেই বর্ণভেদ, একজন ইংরাজ একজন ইটালিয়ানকে বিবাহ করিলে জাত যায় না, কিন্তু এক জন ভারতবর্ষীয়কে করিলে যায়। অবস্থাভেদও এই জাতিভেদের একটা প্রধান অঙ্গ। লর্ডের ছেলের

গরীবের মেয়ে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যশালী য়ুরোপের —মিশ্রজাতির—আমেরিকানের ঘরে বিবাহে দোষ হয় না। অথচ তাহাদের প্রতি অবজ্ঞাও নিতান্ত কম নয়। তার পর বিবাহে স্বাধীন নির্ব্বাচনটাও যতদূর হইতে পারে, তাহাও এই জর্জ্জের ব্যাপারেই ত সুস্পষ্ট জানা গিয়াছে। নিজ সমাজমধ্যেও গণ্ডী ছাড়াইবার পথ ইহাদের কাহারও নাই। রাজার ছেলের বিবাহ রাজবংশে হওয়া চাই, সকল ক'নেই বরের ধনৈশ্বর্য্যের মূল্যে আত্ম-বিক্রয় করিতে নিজেকে পণ্যের মতই বিবাহ-বিপণির দ্বারে নিয়মমত সাজাইয়া আনে। পিতার ঐশ্বর্য্য মূল্যে বিক্রয় সহজ হয়। এ সমাজও সেই ত একই সঙ্কীর্ণ চিত্তের সমাজ। সমাজ-ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই কি তবে এক নহে? মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অনুদারতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, এ কি সর্ব্বত্র একই ভাবে বর্ত্তমান নাই? বরং ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু কিছু উদার, সে পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে ছুটে না।—অপর ধর্ম্মে সেটুকুরও অভাব।

বিরক্তি-পরুষ মুখে পুরোহিত মহাশয়ের দিকে মুখ তুলিয়া নীলিমা সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, "আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে আপনারা যে নিজেদের বিজয়গর্ব্বে বিজিত জাতির বিষয়ে কখনও এবং কোন বিষয়েই সুবিচার করিতে সমর্থ নহেন, এ কথা এখন এ দেশে সবাই জানে। এ দেশের মেয়েরা, স্বজাতির বাহিরে ত দূরের কথা, স্বশ্রেণীর বহির্ভাগেই স্বামীপক্ষে বিবাহ করিতে ঘৃণা বোধ করে, এমন কি, যাহারা মুখে জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও মনের এ সংস্কার সহজে দূর হয় না। যাহা হউক, আমি আপনাদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা বরং আমায় বিদায় দিন,

আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতেছি, তাহা হইলে আমার কুদৃষ্টান্তে অন্য মেয়েরা মন্দ হইতে পারিবে না।"

এই বলিয়া নীলিমা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইতেই মিস্ রীচও সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে পদাঘাত পূর্ব্বক সরোষকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "বিদায় তোমাকে নিশ্চয়ই দিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমার বিষদাঁত তুলিয়া লইয়া তবেই তোমায় ছাড়িব। তোমার মত কুহকিনীকে বাহিরে পাঠাইলে অল্পবয়স্ক যুবকবৃন্দের সর্ব্বনাশ করা হইবে, সে কার্য্য জানিয়া শুনিয়া আমি করিতে পারিব না। শক্ত হাতে তোমায় বাঁধিয়া দিয়া তাহার শাসনে রাখিতে পারিলে তোমায় কতকটা ঠাণ্ডা করিতে পারিব আশা হয়। যাও, আর কোন কথা বলিও না; বিবাহের পোযাক তুমি তৈরী না কর চন্দ্রমুখীকে করিতে দিব, যাও—এখান হইতে দূর হও!"

নীলিমা কি বলিবার জন্য মুখ তুলিতে গিয়া আত্মসংবরণ পূর্ব্বক নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। তার বুক তখন জোয়ার লাগা নদীতরঙ্গের মতই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, গরলে ভরা সর্প-শ্বাসের মতই প্রবল বেগে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল; দুই চোখ আগুনের ভাঁটার মতই দীপ্ত হইয়া জ্বলিতেছিল; পাছে মিস্ রীচের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁর টুঁটি টিপিয়া ধরে, পাছে এই প্রবল উত্তেজনা তাঁর কালকূটে ভরা জিহ্বাটা বাহির করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া বসে, তাই প্রাণপণে নিজেকে জোর করিয়া ঠেলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত এখানে নিজেকে রাখিতে ভরসা হইল না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বই কি!—হায় সুশীল!—হায় সুশীল!

# পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলিমা চোরের মত সন্তর্পণে নিজের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি একটি ছোট পুঁটুলীতে বাঁধিয়া নিঃশব্দ-পদে দ্বার খুলিল এবং এদিক ওদিক দেখিয়া ধীর-সতর্কপদে পিছনের বাগানের দিকে অগ্রসর হইল, বিশ্বাস ছিল এ দিকের ছোট দরজাটা খুলিলেই সে মুক্তি পাইবে, কিন্তু কাছে আসিয়া সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল সেই ক্ষুদ্র দ্বারে একটা মস্ত বড় পিতলের তালা লাগানো রহিয়াছে। তখন হতাশায় তার সমস্ত প্রাণ যেন মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, শরীরের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল, সে সেই কপাটের কাছেই দুই হাঁটু ভাঙ্গিয়া বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িল এবং আর্ত্তনাদের মর্ম্মান্তিক বিলাপস্বরে কহিয়া উঠিল, "হে ঠাকুর! তোমায় ছেড়েছি ব'লে তুমিও আমায় ছাড়লে? সুশীলকে ছেড়ে সাঁওতালের গলায় মালা দিতে হবে? আমার এত বড় স্বার্থত্যাগের কি এত ছোট পুরস্কার!"

পিছনে কার মৃদু পদশব্দ শ্রুত হইল, অমনি নীলিমা আঁৎকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পা হইতে মাথা অবধি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল ধরা পড়িলে তার সকল আশার সমাধি ঘটিবে, এ কথা সে ভালমতেই জানে। মিস্ রীচের যে প্রকৃতি, অতঃপর তিনি যে তাকে চাবিবন্ধ করিতেও পারেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কেন এই অহেতুক বিদ্বেষ? সেত তাঁর কোন ক্ষতি করে নাই?—ইহাই হয়ত হিংস্র স্বভাবের গুণ! তার বাপ যা করিতেন তারও একটা অর্থ আছে—সেটা স্বার্থ, কিন্তু মিস রীচের এ অত্যাচার অধীনস্থকে পীড়ন করার সুখ মাত্র, আর কিছুই নয়।

"নীলিমা! ভয় পেয়েছ? আমি চন্দ্রমুখী। তুমি এখান থেকে পালাতে চাও?—পালাবে? আচ্ছা, এসো, এ পথে তো যেতে পারবে না ভাই! মেয়েদের বাথ-রুমের দোর দিয়ে তোমায় বার ক'রে যেন আমি দিতে পারি;—কিন্তু তার পর?"

নীলিমার সর্ব্বশরীরের সে প্রবল কম্পন তখন পর্য্যন্ত থামে নাই, সংশয় তার মনকে তখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তথাপি অন্যের পরিবর্ত্তে চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া এবং এই আশ্বাসবাণীতে কিছু আশ্বস্ত হইয়া সে উত্তেজনা রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "তার পর যা'হয় হবে, আমায় তুমি দয়া ক'রে এই নরক থেকে উদ্ধার ক'রে দাও দিদি! আমি যদি আর কোন উপায় না দেখি, ম'রে গিয়ে বাঁচবো, বিয়ে আমি কিছুতেই করবো না।—স্বর্গের দেবতাকেও না, তা' ঐ ওকে।"

চন্দ্রমুখীর অধরে ঈষৎ সহানুভূতিপূর্ণ দুঃখের হাসি ফুটিয়া তখনই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, সে শুধু সংক্ষেপে কহিল, "এসো।"

বাহিরের মুক্ত বাতাসে রুদ্ধশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলিমা চন্দ্রমুখীকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। অশ্রু গদগদস্বরে কহিল, "দিদি! তুমি আজ আমার মা'র বাড়া হ'লে! নিশ্চয়ই তুমি আমার জন্মান্তরের মা ছিলে। উঃ, কি দুর্ভাগ্য থেকেই আমায় তুমি আজ বাঁচালে দিদি?"

চন্দ্রমুখীর দুই চোখ ছলছল করিতেছিল, সে নীলিমার ভয় পাণ্ডুর শীতল গণ্ড দুই হাতে ধরিয়া শব-শুভ্র ললাটে সস্নেহ চুম্বন করিয়া, সজল গাঢ়স্বরে কহিল, "নিজে ম'রে যে মরণের বিভীষিকাকে চিনেছি রে ভাই! ঐ থেকে কেউ যদি বাঁচতে পারে, মনে হয়, তাতে বুঝি নিজেও একটু-খানি শান্তি পাব। যাও ভাই, দেরী করো না, একটা কাজ কর, হিন্দু-স্থানীর মতন ক'রে শাড়ীটা প'রে নাও, আর একটা শাড়ী ছিঁড়ে ওড়না ক'রে মুখে মাথায় ঢাকা দাও, আর এই দাই-এর হুঁকা-কলকেটা এনেছি

এটী হাতে নাও, দেখ, ভুলে যেও না হিন্দীতে কথা বাঙ্গালীর কইতে। মেয়েকে একা এত রাত্রে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে। আচ্ছা, মন্দ হয়নি, হ্যাঁ—যদি কখন নিরাপদ হ'তে পার, আমায় একটু খবর দিও। দাঁড়াও—সব কথা বলে দি, এখন যেন দিও না।"

দুই জনে দুই দিকের পথ ধরিল।

কোন্ দিকে ষ্টেশন নীলিমার জানা নাই। মিস্ ওকবর্ণের জীবিত-কালে কয়েকদিন গাড়ীতে বাহির হইয়া সহর কোন্ দিকে, দেখিয়াছিল, পোষ্ট আফিসেও একদিন তাদের গাড়ী থামে, আন্দাজ করিল, ষ্টেশন সেই দিকেই হইবে। উত্তরের পথকে সে সভয়ে বর্জ্জন করিল, সেই পথ দিয়াই সে এমনই অসহায় অবস্থায় আর এক দিন এদেশে আসিয়া পৌছিয়াছিল, সেই কথা আজ আবার মনে পড়িল।

ট্রেণের থার্ড ক্লাস টিকিট কিনিয়াছিল; কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বেই একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল—যাহাতে সে কামরায় ওঠা ঘটিল না। সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের একটা খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটি বঙ্গনারীর অনাবৃত মুখ বাহিরের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া ছিল, তার সাম্‌নাসাম্‌নি হইতেই নীলিমার মাথা হইতে অনভ্যস্ত ওড়নাখানা বাতাসের ঝাপটায় খসিয়া পড়িল, শশব্যস্তে কুড়াইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই সেই বাতায়ন-মধ্যবর্ত্তিনী মুখ তুলিয়া তার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন, তার পর ধীর অথচ সুস্পষ্ট স্বরে ডাকিলেন, "নীলিমা!"—এই অতর্কিত সম্বোধনে নীলিমা ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, তাদের সেই ব্রাহ্ম গার্লস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সুলোচনা দিদি।

সুলোচনা তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ গম্ভীর, অথচ শান্তকণ্ঠে পূর্ণ আদেশের স্বরে কহিলেন, "উঠে এসো।"

নীলিমার একবার মনে হইল ইহাঁর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু সে কাজ করিতে ভরসা হইল না। তাই অনিচ্ছুক ও বিপন্নভাবে তাঁর কামরাতেই প্রবিষ্ট হইয়া তাঁকে নমস্কার করিল।—মন তার বিপন্নতার বিরক্তিতে ভরা। না জানি তার ভাগ্যে আবার কি না কি বিড়ম্বনাই বা ঘটিয়া যায়।

সুলোচনা নীলিমার আপাদমস্তক বার দুই চোখ বুলাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কথা কহিলেন, বলিলেন, "তবে যে শুনেছিলুম্, তুমি ম'রে গেছ ?"

নীলিমা চিরদিনের অভ্যাসমত এই গম্ভীরপ্রকৃতি শিক্ষয়িত্রীকে ভীত-দৃষ্টি প্রেরণ করিল, মুখে কথা সরিতেছিল না, স্কুলে থাকিতেও সে কখনও ইঁহার সহিত বেশী কথা কহে নাই, এমন কি, পাওনা টাকার তাগিদের ভয়ে তাঁকে দেখিলেই তার হৃৎকম্প হইত।

সুলোচনা পুনশ্চ বলিলেন, "দোষ তোমার বাবারই, কিন্তু তার ফলে তুমি আর যা' হোক কর্‌লেই পার্‌তে, এটা ভাল হয় নি।"

এতক্ষণে নীলিমা তাঁর তিরস্কারের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল, এবং পারিয়াই তার মনের সমস্ত সঙ্কোচকে কাটাইয়া অন্তরের সতীতেজ তাকে দীপ্ত করিয়া তুলিল। সে তখন সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল ও অকুণ্ঠস্বরে বলিল, "কোন্‌টা ভাল হয়নি, সুলোচনাদি' ? মা ম'রে যাওয়াতে বাপের কাছে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না জেনে শ্মশান থেকেই আমি নদীর ধারে ধারে চ'লে ক'দিন পরে আধমরা অবস্থায় * * * এর মিশন কুটীর কাছে মাঠের মধ্যে পড়ে ছিলুম। তাঁরা নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে আমায় খৃষ্টান করেছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে আমি টেঁকতে পার্‌ছিনে, তাই আজ সেখান থেকে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্চি। এ ছাড়া আর কি আমি কর্‌তে পার্‌তুম, বলুন ?"

সুলোচনা আবার মোটা চশমার মধ্য দিয়া ভাল করিয়া নীলিমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে আস্তে আস্তে বলিলেন, "তুমি খৃষ্টান ?"

"হ্যাঁ, তাই আমি হয়েছিলুম, এই দেখুন না"—বলিয়া সে পুঁটলী খুলিয়া কাল রং-করা কাঠের ছোট্ট ক্রশ ও একখানা বাইবেল বাহির করিয়া দেখাইল। সুলোচনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুখ পেলে না ?"

নীলিমা ম্লানমুখে মাথা নাড়িল—"না।"

"কোথায় যাচ্চো ? বাপের কাছে ?"

নীলিমা এই প্রশ্নে শিহরিয়া উঠিল। বাপের কাছে ? হ্যাঁ, সেটা যাইবার মত স্থানই বটে, যমের দুয়ারেও তাহা হইলে পৌঁছানটা সহজ হয়, কিন্তু প্রাণের উপকার মমতাটাও যে সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "না, সেখানে নয়। কলকাতার টিকিট নিয়েছি।"

"সেখানে কি কেউ আছেন ?"

নীলিমার মুখ শুকাইয়া ছোট্ট হইয়া গেল, বিপন্নভাবে সে নখ দিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ছাড়া ছাড়া ভাবে উত্তরে কহিল, "কেউ না, শুধু —কোথায়ই বা যাব, তাই জন্যেই নিলুম। শুনেছি, সেখানে না কি অনেক উপায় আছে। স্কুল আছে, বোর্ডিং আছে, কিছু না কিছু হয় ত হয়ে যেতে পারে।"

সুলোচনা ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিলেন, তার পর একটা ছোট্ট রুদ্ধ-শ্বাস মোচন পূর্ব্বক স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "তোমার বাবা যে দিন তোমায় আমাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন, আমার মনে তোমার জন্য কষ্ট হয়েছিল।—যা হোক, তুমি আসতে চাও ত আমার কাছে আসতে পার। ইচ্ছা হ'লে আমার কাছে থেকে পড়াশুনা করতে

পার, আর সেই সঙ্গে ইনফ্যাণ্ট ক্লাসটায় পড়াতেও পার। কিছু কিছু পাবে তাতে। আর কিছু পড়াশুনা করেছিলে কি ?"

এই অপ্রত্যাশিত বন্ধু লাভে নীলিমার দলিত হৃদয় যেন সকৃতজ্ঞ হর্ষোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি চোখের কোণ ছাপাইয়া পড়া জলের ধারাকে রোধ করিতে চাহিয়া জোর করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "আমি ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, এমন কি, একটু একটু ল্যাটিন পর্য্যন্ত শিখেছি—আমায় আপনি স্থান দেন ত আমি নিশ্চয়ই যাব—আপনার কাছে—কিন্তু আমার বাবা যদি আমায় সেখান থেকে জোর করে ধ'রে আনেন, আর আপনাকেও যদি আমার জন্য তিনি অপমান করেন সেই আমার ভয়। জানেন তো তাঁকে—"

সুলোচনা বাধা দিলেন, বলিলেন, "তুমি দেখছি জান না, তোমার বাবা এখন মৃত্যুশয্যায়। ঝড়বৃষ্টিতে বাড়ীর একটা দিক ভেঙ্গে পড়ছিল, তারই মধ্য থেকে লোহার সিন্দুক টেনে আনতে গিয়ে একটা মোটা কড়িকাঠ প'ড়ে তাঁর মাথা ফেটে গেছে—তিনি এখন হাসপাতালে। পরশু আমি এসেছি, সে দিনও তাঁর অবস্থা খুব খারাপ ছিল।"

নীলিমা এই সংবাদে ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল, এ সংবাদে সে দুঃখিত হইল কিনা, সে কথাও সে কয়েক মুহূর্ত্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার পর মনের মধ্যে কিসের যেন একটা প্রবল উত্তেজনা অনুভব করিল। সেটা চির-অত্যাচারী, নির্ম্মম প্রকৃতি পিতার প্রতি সমবেদনা ও শেষ দেখার আকাঙ্ক্ষা বলিয়া বুঝিতে বাকী থাকিল না। এই অভিনব আবিষ্কারে বিস্ময়ে সে বিমূঢ় হইয়া রহিল এবং কাঁদিয়া ফেলিয়া গাঢ় স্বরে কহিয়া উঠিল—"যাই করুন, তিনি আমার বাপ—আমি একবার তাঁরই কাছে যাব সুলোচনাদি'! তার পর যদি জায়গা দেন, তবে আপনার পায়ের তলায় বসে আপনার মত পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেবো।"

আমার এ জন্মটায় আর ত কিছু করবার নেই। কিন্তু একটি কথা সুলোচনাদি! আমি যে খৃষ্টান হয়েছিলুম, এ কথা যদি সম্ভব মনে করেন, দয়া করে কারও কাছে বলবেন না। আমিও না। গৃহস্থ সংসারে তো ঢুকতে যাচ্চিনে যে, এতে কোন পাপ হবে। সমাজের ও সংসারের সেবা করেই তো আমি জীবন কাটাতে চাই, এতে কি ক্ষতি হবে। আমি হিন্দু। কায়মনে আচার-নিষ্ঠায় আমি হিন্দুই থাকব, আপনি সে সুযোগ আমায় দিতে পারবেন না ?”

সুলোচনা কথার জবাব না দিয়া নীলিমার মাথায় হাত রাখিলেন।

তখন সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্তা ও আশান্বিতা নীলিমা কালো রংএর ক্রুশ ও কালো চামড়া বাঁধা বাইবেল জানলা দিয়া তৃণাস্তৃত মাঠে ফেলিয়া দিল। গাড়ী তখন পূর্ণ বলে ছুটিয়াছে।

# একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেও ভুবন বাবুর ঘরে আলো জ্বলে নাই। বাহিরে ভৃত্যবর্গ সন্তর্পণে চলা ফেরা করিতে থাকিলেও কাহারও এ ঘরে প্রবেশ করিতে ভরসা ছিল না। কলিকাতার রাজপথ ব্যতীত সমস্ত প্রকৃতি যেন আকস্মিক শোকভারে অভিভূত—ভয়ার্ত্ত। আকাশ ঘোলাটে, বাতাস গুমোট, গাছপালা নিঝুম, গৃহবাসী ততোধিক স্তব্ধ।

ভুবন বাবু যে সোফায় সচরাচর দ্বৈপ্রহরিক নিদ্রা যান, তাহাতেই অর্দ্ধ-চেতনবৎ পড়িয়া আছেন। আহার কয় দিন ধরিয়াই প্রায় ছিল না, আজ একেবারেই হয় নাই, আহারের কথা বলিতে আসিবার প্রবৃত্তি বা ভরসাই বা এ বাড়ীতে কার আছে। এই চিরসহিষ্ণু সহৃদয়

কোমল প্রকৃতি মনিবের উপর আজ কত বড় বিপদের বজ্রই যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া এ বাড়ীর প্রত্যেক পরিজন আজ কেবলমাত্র গোপন অশ্রুতে অভিষিক্ত হইতেছিল। আর সুশীল? সেও যে এ বাড়ীর ছোট বড় সকলেরই বড় প্রিয়। সকলেরই মনের মধ্যে অস্ফুট অবিশ্বাসে সুশীলের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে পূর্ণ সন্দেহই যে আজও তেমনই জাগ্রত রহিয়াছে। দুই এক জন স্পষ্টই তীব্র ভাষায় প্রতিবাদও করিয়াছে, কিন্তু তাদের সেই অসহিষ্ণু প্রতিবাদ বাহিরের কোন পরিবর্ত্তনই ঘটাইতে পারে নাই। কাল সুশীলের বিচারের দিন, এ সংবাদ তার জন্য নিযুক্ত উকীল-ব্যারিষ্টারের কাছে সরকার জানিয়া আসিয়াছে।

একখানা ভাড়াটে থার্ডক্লাশ গাড়ী আসিয়া থামিলে গাড়ীর মধ্য হইতে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ক্লিষ্টভাবে নামিয়া আসিল বিনতা। বিনতার সেই সগর্ব্বোন্নত চলনের ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট উন্নত দেহ অনেকখানিই নমিত হইয়াছে, পায়ে তার জুতা নাই, কেশ রুক্ষ, বেশভূষা অসংবৃত, মুখ অস্বাভাবিক পাংশু বর্ণ, চক্ষু অসাধারণ উজ্জ্বল। এই ভয়াবহ নারীমূর্ত্তি দেখিয়া সে বাড়ীর সকলেই যেন সন্ত্রস্তভাবে সরিয়া সরিয়া তাকে পথ ছাড়িয়া দিল। সম্ভাষণের কোন ভাষা সে-দিন কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না—কেহ কেহ বরং বিদ্বিষ্টভাবেই মুখ ফিরাইল। বিনতাও কোন দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সোজা তার বাপের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তার দৃঢ় পাদক্ষেপ ও কাঠিন্য-কঠোর মুখভাব যে দেখিল, সেই মনে মনে আসন্ন আর একটা কোন বিপৎপাতের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল, গর্জ্জনোন্মুখ বজ্র যেন সেই মেঘব্যাপ্ত মুখখানায় ক্ষণে ক্ষণে চকিত চপলার মত উদ্যত হইয়া রহিয়াছে ভাইয়ের জন্য শোক নহে, পিতার প্রতি সহানুভূতিও নহে, এ সকলের

সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক্কৃত অপর আরও কোন একটা নূতন জিনিষ, তাহা যে কোন দর্শকই বুঝিল।

বিনতা ঘরে ঢুকিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিল, "বাবা!"

ভুবন বাবুর অসাড় আচ্ছন্ন মনের ভিতর সে ধ্বনি একটুখানি স্পন্দন মাত্র তুলিল। এই 'বাবা' ডাক যেন কোথা হইতে, কোন্ সুদূর হইতে আজ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—এ যেন তাঁর বহু—বহু দিন অশ্রুত! চমকিত—উচ্চকিত হইয়া তিনি লোভাকুল প্রত্যাশায় দ্বারের দিকে চোখ ফিরাইতে অনুজ্জ্বল সন্ধ্যালোকে অস্পষ্টপ্রায় নারী-মূর্ত্তি তাঁর উদ্বেগ-ব্যাকুল চক্ষে পড়িল। অমনই গভীর হতাশার হাহাকারে সমস্ত মনপ্রাণ যেন আবার কোন্ পাথারে তলাইয়া যাইবার উপক্রম করিল। কৈ, কোথায়? কার অলীক প্রত্যাশায় স্বপ্ন দেখা!

আবার পরিচিত সুস্পষ্ট কণ্ঠের আহ্বান আসিল—"বাবা!"

"কে?" বলিয়া ভুবন বাবু বিস্মিত স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মাথার ভিতরটা যেন কি এক রকম গোলমাল হইয়া গিয়াছিল, তাই এ যে তাঁর কোন দিনের পরিচিত কিছুতেই এ কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে' ?"

অভিমানিনী বিনতার বুকে বারেকের জন্য অভিমানের উৎস উথলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বারেকমাত্র। শান্ত দৃঢ়পদে পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালাইল এবং হঠাৎ এই তীব্র আলোকরশ্মি প্রতিহত হইয়া পিতাকে সচমকে চোখ ঢাকিতে দেখিয়াও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়াই সম্বোধন করিল, "চেয়ে দেখ, বাবা! এই সইটা কি তোমার নিজের হাতের?"

ভুবন বাবুকে কে' যেন বুকের উপর বোমা ছুড়িয়া মারিয়াছে,

এমনই ভয়ার্ত্ত মুখে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "আবার এ' কি খেলা তোমাদের !—আবার আমাকে কেন এমন ক'রে মারতে এলে তুমি !··· এর মানে কি ?"

বিনতা বাপের চোখের সামনে একখানা বড় ফুলস্কেপ কাগজ অকম্পিত হস্তে প্রসারিত করিয়া প্রথম সইটার উপর তেমনই অকম্পিত অঙ্গুলী রাখিয়া বাপকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল। সেই ভাবেই অস্বাভাবিক ধীর কণ্ঠে সে বাপের ঐ কাতর আবেদনের জবাবে উত্তর করিল, "মানে আমি তোমায় এখনই সব বুঝিয়ে দিচ্চি বাবা ! তুমি শুধু ঠিক ক'রে দেখে বল, এ সই তোমার কি না ? কৈ, তোমার চশমা ? এই যে—বেশ ক'রে দেখ।"

ভুবন বাবু যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মতই চির-স্বল্পভাষিণী ও দৃঢ় প্রকৃতি মেয়ের অলঙ্ঘ্য আদেশ নিঃশব্দেই প্রতিপালন করিলেন, অনেকক্ষণ পরে কাগজের লেখা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া প্রায় অস্ফুট ও একান্ত ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "এ ত আমারই।"

বিনতার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে এতটুকু একটু সংকল্প-কঠোর তীক্ষ্ণ হাস্য উদ্‌ভাসিত হইয়াই পর-মুহূর্ত্তে তার মেঘাচ্ছন্নবৎ মুখের মধ্যে নিঃশেষে বিলয় হইয়া গেল। সেই হাসিটুকু দেখিয়া মনে হইল, যেন একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঝলকিয়া উঠিয়াছিল মাত্র !

কাগজের উপরে লেখা দ্বিতীয় সইটার উপর পুনশ্চ নিজের অঙ্গুলী স্থাপন পূর্ব্বক প্রশ্ন করিল—"এটা ?"

বারেকমাত্র বিস্মিত নেত্রের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ করিয়াই এবার ভুবন বাবু মাথা নাড়িলেন, "না—আমার নয়।"

এইটুকু শ্রম করিতে হওয়াতেই তাঁকে অবসন্ন দেখাইল। তিনি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে লাগিলেন। বিনতা তও নিবৃত্ত

হইল না, সে ইহার পর পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাতটা ঐরূপ সইএর উপর আঙ্গুল বুলাইয়া বাপকে ক্রমাগত ঐ একই প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল—"এইটে ?—এইটে ?"

নাম সব কয়টাতেই ভুবন বাবুরই বটে, কিন্তু লেখার ছাঁদ ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে সব শেষটা হুবহু মিলিয়া যায়—ঠিক পাশাপাশি কাটিয়া আঁটিয়া দেওয়া সেই প্রথম সইটার সঙ্গে। দুটো সইএর উপর চোখ পড়িতেই ভুবন বাবু শরীর মনের সকল দুর্ব্বলতাকে পরাস্ত করিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন—বিনতা যে সইটা এবার দেখাইল, সেটা তাঁর ছোট জামাই শুভেন্দুর। এই লেখকের লেখার ছাঁদ যে ক্রমে বিশেষ চেষ্টা যত্নে ভুবন বাবুর লেখার ছাঁদে মিলাইয়া আসিয়াছে, তাহা সব কয়টা সই পর পর দেখিলে সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়।

ভুবন বাবুর সহসা বোধ হইল, তাঁহার বুকের উপর হইতে যেন ঠিক বিশ মণ ওজনের দুঃসহ ভারি পাথরের ভার হঠাৎ কে টানিয়া লইয়াছে! বহুকালের শ্বাস-কৃচ্ছ্রকর, অসহনীয় রোগযন্ত্রণা অকস্মাৎ কোন দৈবী শক্তিতে যেন একটি মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইয়া গেল! কিন্তু এই অতর্কিততার অপরিসীম বিস্ময়ে কথা বলা দূরে থাক, শ্বাস-প্রশ্বাসও লইতে যেন সামর্থ রহিল না।

বিনতা স্থির চক্ষে বাপের মুখ ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার তীক্ষ্ণভেদ্য অপলক দৃষ্টি তেমনই করিয়াই মেলিয়া রাখিয়া অকম্পিত স্বরে ডাকিল—"বাবা!"

ভুবন বাবুর স্বপ্ন-বিভোর চিত্ত যথার্থ সত্যের মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই আবার প্রবল শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। তাঁর সুশীল নিরপরাধ, এর বেশী বড় কথা আর কিছুই নাই, কিন্তু সেই নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা তাঁর পক্ষে যে প্রায় সমানই কঠিন রহিয়া গেল! প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ডিত

করিতে হইলে, সে দণ্ড—এই নির্দ্দোষ বালিকার কি দশা ঘটাইবে? তবে কি,—বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি মহৎ, কত উচ্চ, কত অসাধারণ চিত্ত তাঁর ছেলে সুনীলের! পরের জন্য কত বড় ত্যাগ তার! আর সেই কি না এ জগতে চির-কলঙ্কিত নাম লইয়া, অসহনীয় লাঞ্ছিত জীবন বহন করিয়াই শেষ করিবে? এ কি অপ্রতিবিধেয় অবস্থা! এর কি কোন উপায় নাই? এ'কি প্রাণ বিনিময়েও ফিরানো যায় না? কোন মহাপাতকের এ অমোঘ প্রায়শ্চিত্ত!

বিনতা বাপের মনের লেখা তার কালো চোখের আলো দিয়া সুস্পষ্টাক্ষরেই পাঠ করিতেছিল, সে তাঁকে বাক্য-বিমুখ ও বিমনা দেখিয়া তাঁর মানসিক অবস্থাও অনুভব করিয়াছিল। হাতের কাগজখানা ভাঁজ করিতে করিতে অকুণ্ঠিত মুখে কহিল—"দাদার উকিলকে ডেকে পাঠাতে বলবো, না আমি নিজেই কাগজখানা তাঁকে পাঠিয়ে দেব?"

এই নির্জ্জন ঘরের একাকীত্বের মধ্যে নিজের মেয়ের মুখের এই কয়েকটি সহজ কথায় অত বড় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, প্রবীণ ও বিচক্ষণ লোকটা এমনই বিস্ময়াতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন যে, মনে হইল, ঐ কথাগুলো যেন তাঁর মেয়ের মুখের নয়—তার রূপ ধরিয়া যেন কোন ছদ্মবেশী নিশাচরী রাক্ষসী আসিয়া এই দুষ্ট প্রলোভনের জাল তাঁর মনের উপর পাতিতে বসিয়াছে! তাঁর যন্ত্রণা ভারাতুর চিত্ত এ সব যেন আর সহিতে পারিতেছিল না, দারুণ অসহিষ্ণুতার বিরক্তিতে মন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আকস্মিক উথলিত অসহায় ক্রোধে মনের মধ্যে যেন আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া গেল—সেই গভীর উত্তেজনা তাঁর দুর্ব্বল দেহে অকস্মাৎ প্রচণ্ড বল আনিয়া দিল! তিনি সোজা হইয়া বসিয়া উচ্চ তীব্র কণ্ঠে, কঠোর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "তুই কি' বল্‌ছিস্, তুই কি বুঝতে পারছিস্? তোর ভাইকে বাঁচাতে গেলে তোকে স্বামী-ঘাতিনী হ'তে

হবে, তা' কি ভেবে দেখেছিস্! তুই না হিন্দুর মেয়ে, সতীর মেয়ে, তোর গর্ভে না তোর স্বামীর সন্তান ?"

যে পিতা কখন কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটী রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, যে পিতা সন্তানের সকল আব্দারকে অন্যায় জানিয়াও সহিয়া গিয়াছেন, বিবাহের অত বড় মতভেদেও যাঁকে একটি রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই, তাঁর মুখে আজ এমন কঠিন তিরস্কার বাহির হইল! বিনতা তিরস্কৃতা হইয়া একবারের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল, এই পিতৃস্নেহকেও সে তার এই কু-বিবাহের পর হইতে স্বামীর কথায় কতবার সন্দিগ্ধ চক্ষে দেখিয়াছে! এই পিতৃবক্ষেও সে কি লজ্জার আঘাতই না প্রদান করিয়াছে! আর আজ এই যে সর্ব্বনাশের চিতা—সেই-ই ত নিজে হাতে তাঁর বুকে সাজাইয়া দিয়াছে—তবু সেই তারই মুখ চাহিয়া তাঁর এত বড় ত্যাগ!—ওরে—বাপ রে! না, না, সে উহা সহিতে পারিবে না—এত বড় ত্যাগ—এত বড় সহিষ্ণুতা—এত বড় নির্ম্মম কর্ত্তব্যপরায়ণতা—তার মধ্যে নাই।—ওঃ!—অসম্ভব!—অসম্ভব! সুলেখার পত্র সে পিতার নিকট হইতে দেখিয়াছে, তার শ্বশুর তার দাদাকে যূথভ্রষ্ট করীর মতই ভ্রষ্ট-শ্রী ও লাঞ্ছনা কশাহত যত দূর যা' করিবার করিয়াছিল—আবার কি না, বাকীটুকু তারই স্বামী শোধ করিয়া দিল। —না, না—এত বড় আত্মবিসর্জ্জন, এমন ভাবে আত্মহত্যা কখনই সে তাকে করিতে দিবে না—দিতে পারিবে না—নিজে মরিবে, তবু না।

বাপের মুখে অপলক নেত্র স্থির রাখিয়া প্রতিজ্ঞা-দৃঢ় কণ্ঠে তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া জবাব দিল—"আমি হিন্দুর মেয়ে—আমি সতী-কন্যা ও সতী-স্ত্রীও, সেই জন্যেই আমার স্বামীকে তাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে চাই—আমারই এতে অধিকার আছে! তুমি না পারো—আমি পারবো।"

ভাঁজকরা কাগজ আঁচলে বাঁধিয়া দৃঢ়পদে গমনোদ্যতা হইল। কি নির্ম্মম, কি দার্ঢ্যতাপূর্ণ অবিচল কণ্ঠ!

—"বিনা!"

—"বাবা!"

"কি করছিস্ মা? সে যে তোরই জন্য এত বড় কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল, আমি তোর বাপ হয়ে—"

বিনতা ফিরিয়া আসিয়া বাপের পায়ের ধূলা মাথায় লইল, প্রণাম করিয়া উঠিয়া শান্ত মধুর স্বরে বলিল—"হ্যাঁ বাবা! তুমি আমার বাপ ব'লেই ত আমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মে সহায়তা করবে। সেবারও তাই করেছিলে, অন্যায় জেনেও তো আমার সতীধর্ম্ম বজায় রাখতে শুধু এ বিয়েতে বাধা দাও নি। এবারও আমার ধর্ম্ম আমায় রাখতে হবে। —সে ছেলেমানুষ, কোন্‌টা বড়, দেখতে পায় নি, কিন্তু তুমি ত তা নও, কেমন ক'রে নির্দ্দোষীকে এমন করে মরতে দেবে? মনে কর—সে তোমার ছেলে নয়—একটা মানুষ। একটা মানুষের জন্য তুমি আর একটা মানুষের ক্ষতি করতে তো পারো না।"

বিনতা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়াই ক্ষিপ্র চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া সোজা চলিয়া গেল।

কাছের বাদামগাছে একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশ অশুভ কণ্ঠে শব্দ করিয়া উঠিল, শ্যামল গভীর পত্রান্তরাল মধ্যে বিকট স্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতে লাগিল, আকাশের গায়ে গম্ভীরভাবে ছিটানো, কোথাও এলোমেলো ঢালিয়া রাখা, কোথাও সুশৃঙ্খলভাবে সুসজ্জিত আলোর বিন্দুগুলা নিজেদের অনন্ত রহস্যময় প্রকৃতির মধ্যে মানব-ভাগ্যলিপির অজ্ঞেয়ত্ব দর্শন করিয়াই যেন তাদের সান্ত্বনা দিতে স্ফুলিঙ্গ রূপে কয়েকবার অধোমুখে ঝরিয়া পড়িল। সেই নির্জ্জন কক্ষের গাঢ় নিস্তব্ধতা ভেদ

করিয়া ভগ্নচিত্তে পিতার ক্ষোভ-দুর্ব্বল কণ্ঠের সমুদয় দুর্ব্বলতা পরিহার পূর্ব্বক বারেক মাত্র ভাসিয়া উঠিল—"চারুশশি! তোমার সন্তানদের মহত্বে আমি আজ ধন্য হয়েছি! তুমিও তাদের গর্ভে ধারণ করে জন্ম সার্থক করলে! সুশীল! বিনা! আমার সকল দুর্ব্বলতাকে তোরা ক্ষমা করিস্! ভগবান্—তুমিও—।"

স্তব্ধ নিশীথিনীর অব্যাহত শান্তিধারার মধ্যে আর কোন সাড়া নাই—সব শান্ত, সব স্তব্ধ, সব স্থির!!

# দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

এখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীর শেষ আলোক রশ্মিটুকু সম্পূর্ণ মুছিতে পারে নাই। তখনও পশ্চিম গগনের অর্দ্ধ মুক্ত দ্বার পথে সূর্য্যাস্তের ঈষৎ রক্তিমা পৃথিবীর দিকে উঁকি দিয়া চাহিতেছিল। পাখীগুলা রাত্রির মত নীরব হইবার পূর্ব্বক্ষণে এক বার তাদের শেষ তান ধরিয়া আসন্ন সুপ্তির পূর্ব্বে সান্ধ্য প্রকৃতিকে শব্দময়ী করিয়া তুলিতেছিল। রাজপথের জনতরঙ্গে টান ধরে নাই, কর্ম্মক্লান্ত জনসমূহের গৃহাভিমুখী চিত্ত সকল শ্রান্তি বিস্মৃত হইয়া শ্লথগতিকে আগ্রহ চপল করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মোটরকারের ভেঁা ভেঁা, বাইকের টুং টাং, ট্রামের ঘর্ঘর এবং তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া রিক্সা গাড়ীর টুং টুং—সমস্ত মিলিয়া একটা ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাহিরে দিনের আলো থাকিতেই বিদ্যুতের তীব্র আলো অনাগত রজনীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার নাশ হেতু তখনই জ্বলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন হইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে।

সেই রহস্যময় ছায়া বিজড়িত অপরিচ্ছন্ন গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া সুনীল সুগভীর চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া গিয়াছিল। বহু—বহু দিন পরে আজ আবার মৃত্যু-অন্ধকারময় গভীর যবনিকা তার জীবনের উপর হইতে খসিয়া পড়িয়া আলোকের ক্ষীণ রেখাটুকু দেখা দিয়াছে। মাথার উপর যে নিকষ কালো মেঘের স্তর জমাট বাঁধিয়াছে, একটুখানি ঐ দমকা হাওয়ার ঝাপটায় তাহারই মধ্য হইতে নির্ম্মল আকাশের একটা প্রান্ত দেখা যাইতেছে। তার সন্ধ্যাতারাও দুই একটা বুঝি ইতস্ততঃ ছিটানো! সুনীলের অপরিতৃপ্ত তরুণ জীবনের অকাল বিরাগে বৈরাগী-চিত্ত এতটুকুকেই অবলম্বন করিয়া যেন আবার একটু আশার বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। সুলেখার চিত্ত হইতে সন্দেহ অপসারিত হইয়াছে—এত বড় বিপদের মধ্যেও সে দেখা দিতে আসিয়াছিল—দেখিতে আসিয়াছিল—ক্ষমা করিয়া ক্ষমা লইয়া গিয়াছে। আঃ!—এত বড় দুর্দ্দশার ভিতরে আজ এই কি কম কথা!

সুনীলের বক্ষভার লঘু করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস উত্থিত ও নির্গত হইয়া গেল। সুলেখার ক্ষমা সে একান্ত ভাবেই চাহিতেছিল, পাইয়াছে। আর কিছু সে পাইল বা না-ই পাইল! আর যদি কেহ তাহাকে ক্ষমা না-ই করেন, সে জন্য দুঃখ করিবার কি আছে? করেন নাই, হয় ত ভালই হইয়াছে। করিলে হয় ত বাঁচিবার, ফিরিবার, সুনাম সুযশ অকলঙ্কিত রাখিবার লোভ তীব্র হইয়াই হয় ত বা দেখা দিত। এমন করিয়া পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা, বলা যায় না—হয় ত সম্ভব হইত না। আর তার ফলে? একই কলঙ্কে তার পিতৃগৃহ—কলঙ্কে, অপমানে, বিষাদে ভরিয়াই উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে মরিতে হইত অভাগিনী বিনতাকে। এ শুধু অপরাধী চরিত্রহীন সুনীলই না হয় সবার সব কলঙ্ক একত্র করিয়া লইয়া একাই মরিল। অনেক দিনই ত তাঁদের

চোখে তার মৃত্যু ঘটিয়াছে! তবে আর তার মরণে বেশী কি ক্ষতি করিবে? যাহা অনাগত, তাহাই অসহনীয়, যা আসিয়া গিয়াছে, তা গৃহীতও হইয়াছে।

সুশীলের লঘু বক্ষ আবার একটা অরুন্তুদ অভিমানের ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া গৃহভিত্তির উপর মস্তক রক্ষাপূর্ব্বক কতক্ষণই সে স্তব্ধ, স্থির মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া রহিল। এই অভিমানের হাত ছাড়াইবার জন্যই সে যে নিজেকে নিঃশেষে শেষ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু ইহার ত শেষ নাই! এ যে হৃদয়ের প্রত্যেক শোণিত বিন্দুটিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বিষের বাতি দিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। রাবণের চিতার মত এ অনির্ব্বাণ অভিমানাগ্নি বুকের ভিতরটাকে ছারখার করিয়া দিল, তথাপি এতটুকু তেজ কমিল না! —অথবা ইন্ধন পাইলে অগ্নির তেজ বর্দ্ধিতই হয়, কমিবে কেন? তার পিতা তাকে ক্ষমা করিলেন না! অন্ততঃ সুলেখার মুখে শুনিয়া প্রথম অপরাধের জন্যও তো,—না, এই দ্বিতীয়টাই যে তার প্রধান অপরাধ! কেমন করিয়া ক্ষমা করিবেন?

কারাদ্বারের অর্গল মোচন শব্দ শ্রুত হইল, হয় ত কেহ দেখা করিতে আসিতেছে। সুশীল মুখ হইতে করাবরণ মোচন করিল না। মনে মনে বিরক্তি বোধ করিল। হয় ত আবার সেই সুলেখাই। সে কি তার সুনামকে ডরায় না? তার বাপ মা নিশ্চয়ই এ কথা জানেন না। জানিয়া শুনিয়া কে কার বয়স্থা অনূঢ়া কন্যাকে জেলখানার ভিতর ভীষণ অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর সাহচর্য্যে পাঠাইয়া দেয়? বিশেষতঃ হিন্দুঘরের পর্দ্দানশীন মেয়েকে। সুলেখার অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়! মরণের উপকূলে দাঁড়াইয়াও কি উহারা তাহাকে এতটুকু শান্তির মুখ দেখিতে দিবে না? কা'ল তার বিচার, বিচারফলে যা

ঘটিবে, সে ত সবাই জানে। চিরকলঙ্কে দেশ, ভূমি, বংশ, নাম সব ডুবাইয়া বৎসরের পর বৎসরের জন্য পৃথিবীর আলোক হইতে অপসরণ। তার পর—তাহার পর আর কি? এই আনন্দময়ী, উৎসবময়ী পৃথিবীর মধ্যে তার এই অনপনেয় কলঙ্কের কালিমা-লিপ্ত মুখ সে দেখাইবে? নিশ্চয়ই না! তবে আবার এ চিরবিদায়ের দিনে শুধু আর একটি নারীর সুনামকে কলঙ্কিত করিয়া যাইতে বাধ্য হয় কেন? সংসারাভিজ্ঞ যতিগণ যে নারীকে এড়াইয়া চলিতে আদেশ দিয়াছেন, সে ভালই করিয়াছেন! সুশীলের জীবনে নারীর দৃষ্টি শনির দৃষ্টির মত তার সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্য, সমুদয় আনন্দ-গৌরব ও ভবিষ্যৎকে গণেশের মুণ্ডের ন্যায় নিঃশেষে শেষ করিয়া দিল! আজ এ পৃথিবীর সকল বন্ধনই যখন কাটিয়া আসিয়াছে, এখনও দুগ্র্হ রূপিণী নারী তাহাকে অনুসরণ করিতে ছাড়িবে না?

যে আসিয়াছিল, সে ভিতর হইতে কক্ষদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া আসিয়া প্রণামচ্ছলে তার পায়ের তলায় নিজেকে লুটাইয়া দিল। সুশীল তখন সবিস্ময়ে অনুভব করিল, সে সুলেখা নয়—একরাশি চাঁপাফুলের অঞ্জলির মত তার পায়ের তলায় লুটাইতেছে নীলিমা!

দেখিয়া সুশীলের চিত্তে এক দিকে অনেকখানি নিশ্চিন্ততা বোধের সঙ্গে বোধ করি, একটা গোপন উল্লাস তার অবসাদ-খিন্ন চিত্তকে ঈষৎ পুলকিত করিয়া তুলিল। নীলিমাকে সে দূরে ফেলিয়া আসিলেও এবং নীলিমা তাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও ভাগ্যের বিধানে পরস্পরকে তারা আর নিজেদের জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। সুশীল বিস্মিত হইলেও বিরক্ত হইল না।

নীলিমাকে উঠাইয়া স্নেহভরে বলিল—"তোমায় একবার দেখে যাবার সাধ ছিল।"

নীলিমা সুশীলের কাছে, একটু সরিয়া আসিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—"তুমি সে দিন আমায় যা দিতে চেয়েছিলে, আজ আমি সেই দাবী নিয়ে এসেছি, আমার প্রাপ্য না দিয়ে তো যেতে পাবে না।" —এই বলিয়া সে সিন্দুর কৌটা বাহির করিয়া হাস্যস্মিত মুখে অথচ প্রায় আদেশের স্বরে কহিল, "এই থেকে একটু সিঁদুর আমার সিঁথেয় পরিয়ে দাও।"

"নীলিমা! এ'ত ছেলেখেলা! এর কিছু দরকার আছে?"

নীলিমা তেমনই প্রফুল্ল স্মিতমুখে সুশীলের মুখের উপর উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল, "তোমার না থাক্, এই হবে আমার সারা জীবনের রক্ষাকবচ! আমি নিজের পথ স্থির ক'রে নিয়েছি। ভারত সেবাশ্রমে শুদ্ধি নিয়ে তাঁদের অধীনে প্রচারিকা সঙ্ঘ স্থাপন কর্ব্বো, দেশ-বিদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার আমার জীবন-ব্রত ভুক্তভোগী হবে। আমি জানি এর কত প্রয়োজন। তাঁরা আমার সহায় হবেন। বাড়ী চাপা প'ড়ে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বাড়ী আর টাকা তিনি আমায় দানপত্র করে দিয়ে গেছেন, হিন্দুর মেয়েদের ধর্ম্ম শিক্ষা দে'বার জন্য আমি প্রাণপাত করবো। যা'রা আমার মত অবস্থাচক্রে পড়ে সমাজ থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের ফির্‌বার পথ দে'বার জন্য একটা স্থান তো চাই। এই পথে পা দেবার আগে সেইজন্য তোমার কাছে এসেছি—"ভিক্ষা চাইতে"—

সুশীল মন্ত্রমুগ্ধের মত নীলিমার কথা শুনিতেছিল। সবিস্ময়ে উচ্চারণ করিল—"ভিখারীর অধম যে, সে তোমায় কি ভিক্ষা দেবে নীলিমা?"

নীলিমা অকুণ্ঠিত মৃদু হাস্যে উত্তরে কহিল, "আমি যা চাই সে দেবার সামর্থ্য তোমার আছে, না হ'লে চাইব কেন? আমি যে কাজ নিচ্ছি,

তা'তে লোকসঙ্গ করতেই হ'বে। বিয়ে আমার হয়ে গেছে সেই রাত্রে, প্রচার রাখতে চাই। শুধু সিঁদুর পরার অধিকার আমায় দাও—স্বামীর পরিচয় কেউ জানবে না, জানবে আমি সধবা।"

"আমি ত তোমায় সম্পূর্ণ অধিকার দিতেই চেয়েছিলুম, নীলিমা!"

সিন্দুর-কৌটার ঢাক্‌নি খুলিয়া নীলিমা কহিল, "না, না, সে হয় না, তোমার আমার মধ্যে শাস্ত্রাচারের ব্যবধানটুকু চিরবাধা হ'য়ে থাক, অন্তরে জানবো আমি তোমার স্ত্রী, আর তাই আমাকে চলার পথে শক্তি দেবে।"

সুশীল ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তার পর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কৌটা হইতে অঙ্গুলীতে সিন্দুর লইয়া নীলিমার সুপ্রচুর তরঙ্গায়িত কেশরাশির মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম রজতসূত্রবৎ সীমন্ততটে দীর্ঘ অরুণরেখা অঙ্কিত করিয়া দিল—চন্দ্রার্দ্ধবৎ ললাটে সিন্দুর বিন্দু অঙ্কিত করিল। তারপর নীলিমা প্রণাম করিয়া উঠিতেই আবেগমথিত বক্ষে দুই হাতে তার মুখ-খানি কাছে টানিয়া গভীর স্নেহে প্রগাঢ় চুম্বন প্রদান করিল। গাঢ় স্বরে কহিল, "তোমার ব্রত সফল হোক্। এই প্রার্থনা নিয়তই আমি করে যাব।"

নীলিমার নবসাজ সজ্জিত সুন্দর মুখ আভ্যন্তরিক হর্ষোচ্ছ্বাসে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে গভীর বলে সংযত করিয়া সে পুলককম্পিত মৃদুকণ্ঠে কহিল—"তাই ক'রো—সেই বলেই সকল বাধা অতিক্রম করে যাবো—তোমার সঙ্গে দেখা আমার এ জন্মে হয়ত আর হবে না, না হলেই ভাল। একলব্য গুরুকে কাছে না পেলেও কি তার ক্ষতি হয়েছিল? আমারও হবে না—যাই তবে? আমি যাই—"

সবিস্ময়ে সুশীল দেখিল বিনিদ্র রাত্রির মধ্যকালেও সে একাগ্রচিত্তে নীলিমার কথাই ভাবিতেছিল। কি অদ্ভুত চরিত্র এই নীলিমার! কি উন্নত—কি মহৎ আর কি অপরিসীম ত্যাগ তার! অথচ কা'র মেয়ে, কার বোন সে! অমনি সুশীলের মনে পড়িল স্বর্ণলতাকে।

"সুশীল! ওঠো, ওঠো, এক্ষণি যেতে হবে।"

"সকাল হয়ে গেছে?"

ভুবন বাবুর বন্ধু ও কারবারের বাঁধা উকিল মহানন্দ বাবু সহজভাবেই কথা কহিবার চেষ্টা করিলেও চেষ্টা তাঁর সফল হইল না। গাঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমার খালাসের হুকুম এনেছি সুশীল। তোমার বাবা তোমায় নির্দ্দোষী জেনে গেছেন। তুমি এখন—"

সুশীল চমকাইয়া উঠিল, "জেনে গেছেন? কি বলছেন?"

"শোন সুশীল! মনকে কঠিন করো, বহু দুঃসংবাদ তোমায় দে'বার আছে। হ্যাঁ, ভুবন তোমার নির্দ্দোষীতার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে অতিরিক্ত আনন্দেই হাটফেল করেছে। শরীরেও তার কিছুই ছিল না! শুধু ছিল অসীম ধৈর্য্য!"

"বাবা! বাবা! আমার বাবা নেই! আমিই তাঁকে মেরে ফেল্লুম।"

অশ্রু বাষ্প বিজড়িত কণ্ঠে সুশীলের স্কন্ধে হাত রাখিয়া প্রবীণ সুহৃদ কহিলেন, "ভুবনের ছেলে তুমি ধৈর্য্য হারিও না! আরও দুঃসংবাদ আছে সুশীল! যত কঠিনই হোক, আমাকেও তা দিতে হবে, আর তোমারও না সয়ে উপায় কি!—বিনতা নেই!"

সুশীল ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি বলছেন এ সব?"

মহানন্দ বাবু রুমালে অশ্রু মুছিয়া উত্তর দিলেন, "বিনতা নেই! সব সময় তোমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পত্র নিজে এনে আমার দিলে। ব ফিরতেই দুজনে ঝগড়া হয়। শুভেন্দু জানতেই পেরেছিল, তৈরিই ি তাকে গুলি করে নিজেও মরেছে। বিনা কি বলে গ্যাছে জা সুনীল! বলেছে 'বাবাকে বলো—যে বিষের বাতি আমি আমার পিতৃব জ্বেলেছিলুম, তা' যে নিবিয়ে যাচ্চি, এই আমার সান্ত্বনা।' কি ছেলে মেয়ে এরা! অঁ্যা! ভুবনেরই আদর্শ সব! এদের পূজো কর হয়! পূজো করতে হয়!"

**সমাপ্ত**

